বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহীদল

ও

তাঁদের পৃষ্ঠপোষক

শ্রীঅশোককুমার সরকার

মহাশয়কে

যাত্রার আগে হাওড়া স্টেশনে শ্রীঅশোককুমার সরকার নেতা সুকুমারের হাতে জাতীয় পতাকা-শোভিত তুষার-গাঁইতি তুলে দিচ্ছেন

ফটো : আনন্দবাজার

হাওড়া স্টেশনে নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদের কয়েকজন

ফটো : আনন্দবাজার

এমন কিছু রাত হয় নি। তবু পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। (এ পাড়াটার দস্তুরই এই। অফিস-টাইমে লোক গমগম। কিন্তু অন্য সময়, একেবারে ফাঁকা। একটু রাত হলেই গা ছমছম করে।) সাড়াশব্দ কমে এসেছে, নেই বললেই হয়।

ওদের মুখেও কথা ছিল না। তিনজনে মুখোমুখি বসে ছিল। সিগারেট টানছিল নিঃশব্দে। ছোট্ট অপরিসর ঘর। ছাপাখানা। প্রিণ্টিং মেসিনগুলো বন্ধ। কম্পোজিটররাও চলে গেছে। অন্যদিন এতক্ষণে, এর ঢের আগেই, এ প্রেসে তালা পড়ে যায়। আজ ওরা আছে তাই ঘর খোলা।

মার্চের কলকাতা। ঘুপসি ঘর। ভিতরে বড্ড গুমোট। পাখাটা ঘুরছে। তাতে সান্ত্বনা নেই। তার উপর ছাপাখানার কালির গন্ধে অস্বস্তি উৎকট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এতে ওরা খুব পীড়িত বোধ করছিল না। ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে।

ধ্রুব—ধ্রুবরঞ্জন মজুমদার, নড়েচড়ে বসল। পোড়া সিগারেটটা ফেলে একটা নতুন সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, (ওর ফিনফিনে চেহারার অনুপাতে কণ্ঠস্বর একটু ভারি) "ওরা তা হলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, কী বলেন?"

"হ্যাঁ", বিশ্বদেব বিশ্বাস জবাব দিল, "বেশ হতাশ হয়েছে। সত্যি বলতে কী, আমিও কিছুটা হতাশ হয়েছি।"

সুকুমার রায় বলল, "কেন?"

বিশ্বদেব সিগারেটে একটা টান মেরে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল। বলল, "কিছু মনে করবেন না, নামটা হিমালয়ান ইনস্টিটিউট দেওয়া হল বটে, কিন্তু উদ্বোধনী সভার ভাষণ শুনে মনে হল, এটা একটা তীর্থযাত্রী সংঘ ছাড়া আর-কিছু নয়।"

আবার সবাই চুপ।

একটু পরে সুকুমার খুব ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কী ভেবেছিলেন?"

"ভেবেছিলাম হিমালয়ান ইনস্টিটিউট যখন, তখন নিশ্চয়ই একটা মাউণ্টেনীয়ারিং ক্লাব-ট্যাব হবে। দেখুন না সেই ৫৬ সালে ট্রেনিং নিয়ে এসেছি দার্জিলিঙের ইনস্টিটিউট থেকে, আর তারপর থেকে বসে আছি চুপচাপ। মাঝে মাঝে নিমাইদা, দিলীপ, ভটচাজ, ওদের সংগে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, গালগল্প করি, এক্স্পিডিশনের স্বপ্ন দেখি, তারপরে সব ভোঁ-ভাঁ। তাই যেদিন উমাপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে আপনাদের কথা শুনলাম, সেদিন খুব উৎসাহ বোধ করেছিলাম। যেদিন আপনাদের কাছ থেকে এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে খবর পেলাম, সেদিন খুবই আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। ওদের কাছে যখন খবরটা পেণছে দিলাম, ওরাও লাফিয়ে উঠেছিল। কিন্তু আপনাদের মাউণ্টেনীয়ারিং সম্পর্কে উৎসাহ নেই দেখে একটু হতাশ হয়েছি।"

"উৎসাহ আমাদের নেই কে বললে!" ধ্রুব বিশ্বদেবকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করল, "আসলে এটা হল হিমালয়-প্রেমিকদের একটা আড্ডা। যে তীর্থভ্রমণে যাবে তারও এখানে যেমন অধিকার, যে পর্বতচূড়ায় উঠতে চায় তার অধিকারও তেমনই। কেমন কিনা সুকুমার?"

সুকুমার ধীরভাবে সায় দিল, "নিশ্চয়ই।"

ধ্রুব আরও একধাপ এগোল। বলল, "আপনি ওদের একদিন ডাকুন, আসুন

কোথাও বসি, আলাপ করি। কেমন কিনা? যদি লোকবল যোগাড় করা যায়, লাগিয়ে দেব এক অভিযান।"

সেই অশান্ত পিপাসা আবার জেগে উঠল ধ্রুবর মনে। হিমালয়ের বন্ধুর পথ তাকে হাতছানি দিতে লাগল। এই ঘুপসি ছাপাখানা, অসহ্য গুমোটের কুণ্ড, জনাকীর্ণ কলকাতা শহর, শুধু দিনযাপনের গ্লানিমাখা অলস জীবন, মিলিয়ে যেতে লাগল। স্থানকাল পরিবর্তিত হয়ে গেল। ধ্রুব আর যেন এ ঘরে নেই, তার সামনে বসে নেই সুকুমার, নেই বিশ্বদেব। এ শহরেই নেই সে। মুহূর্তের মধ্যে সে চলে গেল গার্বিয়াঙ। কৈলাস-মানসসরোবরের পথে শেষ ভারতীয় গ্রাম। ছবির পর ছবি ভেসে উঠতে লাগল তার চোখে।

...কৈলাস থেকে ফিরে আসছে ধ্রুব। সঙ্গে বন্ধু নীলমণি হাজরা আর নিতান্ত ছা-পোষা কলকাতার এক কেরানী—তারাপদদা। আর আছে গাইড্ কিচ্‌খাম্পা। অবিস্মরণীয় এক চরিত্র। কিচ্‌খাম্পা দুর্ধর্ষ, কিচ্‌খাম্পা পাঁড় মাতাল, কিচ্‌খাম্পা অতিশয় সুদক্ষ গাইড্, কিচ্‌খাম্পা মনেপ্রাণে একটি শিশু। নিজের দজ্জাল মেয়ের কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে কিচ্‌খাম্পা। এ-রকম বিচিত্রচরিত্র আর দেখে নি ধ্রুব। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে আবার গার্বিয়াঙ ফিরে এল ধ্রুব। ওরা যখন কৈলাস যাত্রা করে, সেটা সিজিনের একেবারে শুরু। কোন তীর্থযাত্রীই তখন গার্বিয়াঙে এসে পৌঁছয় নি। ওরাই ছিল কজন।

ফিরে এসে দেখল সেই নির্জন গার্বিয়াঙ গ্রামখানা ভরে গেছে যাত্রীদের ভিড়ে। আর সেই নানাজাতির ভিড়ের মধ্যেও কজন বাঙালীর মুখ—চিনতে ভুল হয় না একটুও। পরিচয় হল। আমি প্রবোধ সান্যাল। আমি অমিতাভ দাশগুপ্ত। আর একটি নাম শুনল ধ্রুব, লাজুক দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে ঃ আমি সুকুমার রায়। শুনল, আমরা যাচ্ছি কৈলাস-মানসসরোবরে। আপনারা তো ফিরলেন। বলুন, পথঘাট এখন কেমন?

পথের বিবরণ ধ্রুবই দিয়েছিল, না অন্য কেউ, তা এই ১৯৬০ সনে, তিন বছর পরে, এই প্রেসের ঘুপসি ঘরে বসে সঠিক মনে পড়ল না তার। তবে এটা মনে পড়ল, সুকুমারের সঙ্গে পট্টি ছিল না। পট্টির কোন মূল্য কলকাতায় নেই। কিন্তু গার্বিয়াঙে সেই পট্টির মূল্য ছিল অসাধারণ। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পথে শীতের দাঁতে একেবারে করাতের ধার। তাই পট্টি হচ্ছে পদযুগলের অন্যতম রক্ষক। —এ কী পট্টি আনেন নি?

—পট্টি, না তো?

—তবে তো বিপদে পড়বেন। পট্টি ছাড়া চলবেন কী করে?

সুকুমার বিব্রত বোধ করেছিল। ধ্রুব বলেছিল, তবে আমার পট্টি-জোড়াই নিন।

—আর আপনার? আপনার কী হবে?

—আমরা তো নেমে যাচ্ছি। এখন আর দরকার হবে না।

সুকুমার কৃতজ্ঞতার ঋণ ধন্যবাদ জানিয়ে শোধ করতে চেয়েছিল। আর নীলমণি বলেছিল, কলকাতায় ফিরে পট্টিগুলো ফেরত দেবেন মশাই।

তারপর কলকাতায় ফিরে এসেছিল ধ্রুব। মাস গেল, বছর গেল। দৈনন্দিন কাজের ক্লান্তিকর রুটিন-অনুসারে জীবন চলল ঢিমে তালে। ওরই মধ্যে খানিকটা মুক্তির স্বাদ মেলে হিমালয়ের স্মৃতির জাবর কাটলে। মাঝে মাঝে মনে এক পিপাসা জাগে। রক্ত এক প্রবল আহ্বানে মাতাল হয়ে ওঠে। হাত-পা চঞ্চল হয়। হিমালয় কাছে আসে। কাছে টানতে চায়। আবার ঝিমিয়ে পড়ে সব চঞ্চলতা। স্বাদ গন্ধ বর্ণহীন নাগরিক জীবনের ছক-বাঁধা আবর্তনে হিমালয় দূরে সরে যায়। মনেও পড়ে না

ধ্রুবর কৈলাসের পথে একদিন সুকুমার [illegible] তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে তার অকিঞ্চিৎকর এক জোড়া পট্টি ধার নিয়েছিল, ফেরত দেবে বলেছিল, দেয় নি।

কিন্তু এ জীবন আর ভাল লাগে না। হিমালয়ের পিপাসা আবার তীব্রতর হয়। এবারে ধ্রুব আবার বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে আদি এবং অকৃত্রিম পথের সাথী সেই সবেধন নীলমণি। এবারে ওদের লক্ষ্য মুক্তিনাথ। নেপাল-হিমালয়ের এক প্রখ্যাত তীর্থ মুক্তিনাথ। কিন্তু লক্ষ্যে পেঁছিতে পারে নি ধ্রুব। পা মচকে মাঝপথ থেকে ফিরে এল কলকাতায়। পায়ের ব্যথা সারতে সময় লাগে নি ধ্রুবর। কিন্তু মনের ব্যথা আর সারে না। মনে তার দারুণ হতাশা।

এমন সময় নীলমণি এসে ধ্রুবকে খবর দিল, সেই সুকুমারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুকুমার নাকি মুক্তিনাথ ঘুরে এসেছে এবার।

নীলমণি বলল, দুঃখু করিস নি ধ্রুব। তুই মুক্তিনাথ যেতে না পারলেও তোর পট্টিজোড়া যে মুক্তিনাথ পেঁচেছে সে বিষয়ে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি। আর সুকুমারের যে পরিচিত লোকটির কাছ থেকে এ খবর পেয়েছি, তাকে এমন মেডিসিন দিয়েছি যে, এর পর সুকুমার তোর পট্টি ফেরত দিতে পথ পাবে না।

ধ্রুব চঞ্চল হয়ে উঠল এ খবর শুনে। সুকুমারকে তার চাই-ই চাই। পট্টির জন্য নয়, মুক্তিনাথের খবর শোনবার জন্য। ধ্রুব যা পারে নি, সুকুমার তা হাসিল করে এসেছে! সেই সুকুমার! আশ্চর্য! সেই লাজুক বিনীত লোকটার মধ্যে শক্তি তো নেহাত কম নেই! একটু যেন সমীহ হল তার প্রতি। একটু ঈর্ষাও যেন বোধ করল ধ্রুব।

এর পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। নীলমণির সঙ্গে যেদিন এসে সুকুমার দেখা করল ধ্রুবর সঙ্গে, সেদিন থেকেই দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আর তারপর থেকে যখনই দেখা হয়, তখনই হিমালয়-স্মৃতির রোমন্থন শুরু হয়। খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, কোথায় কোন্ হিমালয়-প্রেমিক আছে কলকাতায়, তার। জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় এক হিমালয়-প্রেমিক সঙ্ঘ গঠন করার। প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে আবার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অমিতাভ আবার এসে জোটে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় উমাপ্রসাদ মুখুজ্জের সঙ্গে। সঙ্ঘও শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। হিমালয়ান ইনস্টিটিউট। সেই সূত্রে আরও নানা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। সেই সূত্র ধরেই বিশ্বদেব বিশ্বাস আসে।

প্রথমটা বিশ্বদেবকে খানিকটা স্তোক দেবার জন্যই কথাটা বলেছিল ধ্রুব।

"আসলে এটা হবে হিমালয়-প্রেমিকদের একটা আড্ডা। যে তীর্থভ্রমণে যাবে তারও এখানে যেমন অধিকার, যে পর্বতচূড়ায় উঠতে চায় তার অধিকারও তেমনিই। কেমন কিনা?"

কথাটা বলবার আগে সে তেমন করে ভেবেও দেখে নি হয়তো। কিন্তু নিজের কানে নিজের কথা শোনামাত্র উৎসাহের একটা তরঙ্গ যেন তার শরীরের ভিতর তীব্রবেগে ছুটে গেল।

"যদি লোকবল যোগাড় করা যায়, লাগিয়ে দেব এক অভিযান।" কথাটা সে যেন বলল না, ধ্রুবর মনে হল, তাকে দিয়ে কেউ যেন বলিয়ে নিল। অভিযান! এক্স্পিডিশন! কোনদিনের তরেও তো এ কথা তার চিন্তায় আসে নি।

বিশ্বদেবের দিকে চাইল ধ্রুব। দেখল তার চোখে একটা দীপ্তি যেন উঁকিঝুঁকি মারল। সুকুমারের দিকে চাইল ধ্রুব। সুকুমার তেমনই শান্ত, তেমনই লাজুক,

তেমনই বিনীত। এবার সব শেষে নিজের দিকে চাইল ধ্রুব। নিজের অন্তরে ডুব মারল। একটা নতুন উত্তেজনা জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। সেই পুরনো পিপাসাটা ঠেলে ঠেলে উঠছে। সে বুঝতে পারল, মনের আরও গভীরে, আরও গোপনে একটা ইচ্ছা জন্ম নিচ্ছে। বড় অশান্ত, অতি অসম্ভব সেই ইচ্ছা। তার চেহারাটা এখনও স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না ধ্রুব। তার আকৃতিটাও পরিমাপ করতে পারছে না। কিন্তু তার অস্তিত্ব সে টের পাচ্ছে। এ এক অস্থির অস্তিত্ব।

ধ্রুব আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল, "শুধু শুধু বাক্যব্যয় করার কোন মানে হয় না। চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি পর্বতে। তা সে অভিযানেই হোক আর তীর্থস্থানেই হোক। পয় পরিষ্কার কথা।"

সুকুমার আর বিশ্বদেব কথা বলল না। তাদের স্তব্ধতা দিয়েই তারা ধ্রুবর প্রস্তাব যেন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করল।

॥ দুই ॥

ধ্রুব যা বলল, তা কি শুধুই কথার পিঠে কথা? ফাঁকা আওয়াজ? সুকুমারের মনে হঠাৎ-হঠাৎ লাফ মেরে ওঠে প্রশ্নগুলো। না কি ও সত্যিই সিরিয়াস?

যে আকাঙ্ক্ষা সুকুমারের মনে, মনের অতি সঙ্গোপনে লালিত হয়ে আসছিল এতদিন, সেটা কেমন করে পরিষ্কার একটা ইচ্ছার রূপ নিয়ে বেরিয়ে এল ধ্রুবর মুখ দিয়ে! সেদিন, সেই প্রেসঘরে বসে, ধ্রুবর প্রস্তাবটা শোনামাত্র সুকুমারের বুকটা ধক করে উঠেছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল সে। ধ্রুব কি অন্তর্যামী?

পর্বত-অভিযানে হাত দিতে চায় ওরা! শাবাশ! সুকুমারের মনে উৎসাহের এক দোলা লাগে। কিন্তু...কিন্তু...সাবধানী মনে দারুণ সংশয়। কিন্তু এ কি সম্ভব? আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

কেন নয়? মধ্যবিত্ত সংশয়কে ধাক্কা মেরে হিমালয়ের-পথে-পথে-ঘোরা, পোড়-খাওয়া মন প্রশ্ন তোলে। সুকুমার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, পর্বত-অভিযান অন্যান্য জাতের পক্ষে যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের পক্ষেই বা সম্ভব হবে না কেন? এই হিমালয় মহান ঔদার্যে শায়িত রয়েছে আমাদের উত্তরে। অজস্র শীর্ষ উন্নত করে। আমরা ভীত ত্রস্ত হয়ে শুধু দূর থেকে দেখে যাব চিরকাল? আর প্রতি বছর সাগরপারের লোকেরা দলে দলে আসবে, চিররহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, প্রাণের মূল্যে কীর্তির অক্ষয় সৌধ নির্মাণ করে যাবে একের পর এক। আর আমরা? নিশ্চিন্ত শয্যায় শয়ন করে তাদের লেখা চমকপ্রদ সব বিবরণ পড়ে শিউরে শিউরে উঠব এবং উদ্বেলিত হৃৎপিণ্ড গুরু শ্রমে যাতে আর বেশী কাতর না হয়ে পড়ে তার জন্য বলবর্ধক টনিক খাব, এই কি আমাদের বিধিলিপি?

অভিযান! তিক্ত হাসির সরু একটা ফালি সুকুমারের স্বভাব-গম্ভীর ঠোঁটে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়। নাঃ, দিবাস্বপ্ন দেখে লাভ নেই। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে। লেট হলেই উপরওলার রক্তচক্ষুর সামনে দাঁড়াতে হবে। তার চেয়ে সময়মত চান করে, বরাদ্দ অন্নে উদরপূর্তি করে, পৌরপ্রতিষ্ঠানের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পানে রওনা হওয়া যাক। খিদিরপুর থেকে বৌবাজারের শশিভূষণ দে স্ট্রীট—দূরত্ব নেহাত কম নয়। সেখানে অপেক্ষা করছে করদাতাদের বিষণ্ণমুখ রক্তহীন বংশধরগণ, বশংবদ কেরানীতে পরিণত হওয়াই যাদের ভবিতব্য। উদ্যমহীন শিক্ষকরা এদের অবৈতনিক শিক্ষা বিতরণ করবে। উৎসাহহীন এরা পুঁথির বিদ্যা অপরিণত মস্তিষ্কে

বহন করে গুরুভারে শ্রান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফিরবে। বড় হবে। বেকার হবে। ক্ষুব্ধ আক্রোশের মিছিলে যোগ দেবে। বড় জোর দু-একজন ছিটকে বেরিয়ে সাফল্যের সিঁড়ি টপকাবে। এদের কারোরই নির্জীব জীবন হিমালয়ের আকর্ষণে কেন্দ্রচ্যুত হবে না। এদের ছক-বাঁধা স্তিমিত গার্হস্থ্যে হিমালয় কখনই উপদ্রব সৃষ্টি করবে না। কী আশ্চর্য নিয়তি সুকুমারের! উদরান্নের জন্য এদের সঙ্গেই নিত্য তাকে ওঠাবসা করতে হবে। অপব্যয় করতে হবে ভবঘুরে জীবনের নিতান্ত মূল্যবান এক বড় অংশ। অভিযান! নিতান্তই পাগলামি।

প্রবল অস্বস্তিতে কদিন ভুগতে লাগল সুকুমার। ওর আপাত শান্ত বাইরের চেহারাটা দেখে কারও বুঝার উপায় নেই, কী অশান্ত আলোড়ন ওর মনের ভিতরে চলছে। চলছে ফিরছে, কাজকর্ম সবই করছে। কিন্তু মন নেই কোন কিছুতে। মন কলকাতাতেই নেই। আবার বেরিয়ে পড়েছে হিমালয়ে। এ এক কর্মনাশা সংক্রমণ। এ নিদারুণ নেশা।

হিমালয়-ভ্রমণের নেশায় যাকে একবার ধরেছে তার নিস্তার নেই আর। নিস্তার কি সুকুমারেরই আছে?

সে তখন স্কুলের ছেলে, বয়স আর কত হবে, বড় জোর এগারোই হোক, পড়ত খিদিরপুর অ্যাকাডেমিতে। বয়েজ স্কাউট ছিল সুকুমার। একবার বয়েজ স্কাউটদের শিবির হল দার্জিলিঙে। বোধ হয় ১৯৪৫ সনে। সুকুমার সেই শিবিরে যোগ দিয়েছিল। সেই প্রথম হিমালয়ের সান্নিধ্যে এল সে। সেদিন সেই অপরিণতবয়স্ক বালকটির মনে হিমালয় কী ভাবের উদ্রেক করেছিল, তা এখন এই ১৯৬০ সনের মার্চের কলকাতায়, খিদিরপুর-এসপ্ল্যানেডের দ্রুতগামী-ট্রামে-চড়া-অস্থিরতায় পীড়িত যুবক সুকুমার মনে করতে পারল না। তবে এটা তার মনে পড়ল, একবারই দেখ আর বার বারই দেখ, ওই বিশাল, ওই বিরাট, ওই মহান উদার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করামাত্র বিস্ময়ে তুমি হতবাক হয়ে পড়বেই। হিমালয়ের বিস্ময় পুরনো হয় না। কখনও না। হিমালয় যেন অনন্ত এক শিলাময় মহাকাব্য। কাহিনীর পুনরাবৃত্তি নেই। তাই একঘেয়েমি নেই। তাই তার আকর্ষণ এত দুর্বার।

সেদিনের সেই স্কুলের বালকটিকে যেভাবে সম্মোহিত করেছিল হিমালয়, সুকুমার ভেবে দেখল, আজকের এই এতবার-হিমালয়ে-যাওয়া ইস্কুল-মাস্টারটিকেও সেই একই সম্মোহনে সে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেবার বয়েজ স্কাউট শিবির থেকে ফিরে আসার পরও যেমন অতৃপ্ত পিপাসা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত সুকুমার, এখন দেখল, সে তৃষ্ণা এখনও তেমনই অক্ষয়, একই রকম প্রবল। বরং দিনে দিনে আগ্রহ আরও বেড়েই গেছে।

আর তার জন্যে ভুগতে কি কম হয়েছে? কত বাধা! মধ্যবিত্ত ক্ষীণজীবী বাঙালী-পরিবার ছেলেদের বাঙালী করেই রাখতে জানে, মানুষ হবার সুযোগ দেয় না। সুকুমারের মনে পড়ল ১৯৫৩ সনের একটা ঘটনা। সে তখন অস্থির হয়ে উঠেছে হিমালয়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। তখনও সে নাবালক। অভিভাবকের অনুমতি চাই। অনুমতি আর মেলে না। অথচ কেদারবদরি যাওয়া স্থির হয়ে গেছে। কী কষ্টে যে সে সেবার সম্মতি পেয়েছিল, তা অন্তর্যামীই জানেন। সেই বলতে গেলে, তার প্রথম সত্যিকারের হিমালয়-ভ্রমণ। হিমালয় তাকে দিওয়ানা করে ছেড়েছে। ক্রমে ক্রমে গাড়োয়াল, কুমায়ুন আর পাঞ্জাব-হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় গড়ে উঠেছে তার। তিব্বতে কৈলাস-মানসসরোবর দর্শন করে এসেছে। সব শেষে ঘুরে এসেছে নেপালের মুক্তিনাথ তীর্থ থেকে। যত দুর্গম, তত মনোরম।

আপাতত সে বেকার। ধ্রুবকে পেয়েছিল, তাই আলাপে আলোচনায় এখনও

তাদের মনে সজীব আছে হিমালয়। এখনও তারা স্বপ্ন দেখে, প্ল্যান ছকে। হিমালয়ে যাবে বলে উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সুকুমারের তন্ময়তা কেটে যায়। ট্রাম পৌঁছে গেছে এসপ্ল্যানেডের টার্মিনাসে। সে ট্রাম বদলায়। ইস্কুলে পৌঁছায়। ক্লাস নেয়। ছুটির পর পা চালায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটের সেই ঘুপসি ছাপাখানার দিকে। ধ্রুবরই মেজদার ছাপাখানা।

সুকুমারের ভাবুক দৃষ্টি ঘরখানার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। যন্ত্রপাতি কাগজপত্রে একেবারে ঠাসা। কোথাও অবকাশ নেই এতটুকু। মনে হয় এই ঘরখানা কত কৃপণ। এই ঘরে বসেই তারা কল্পনার জাল বোনে। মুহূর্তে মুহূর্তে গিয়ে তারা হাজির হয় হিমালয়ের অবাধ প্রসন্ন উন্মুক্ত উদারতায়। এক আদি-অন্তহীন অমল মহিমার পূর্ণ সরোবরে অবগাহন করে সন্তাপ থেকে মুক্তি পায়।

কী আছে হিমালয়ে?—কত লোকের কাছ থেকে কতবার এই প্রশ্ন শুনতে হয়েছে সুকুমারের। মাঝে মাঝে তার জবাব দিতে ইচ্ছে হয়। বলতে ইচ্ছে হয় : কেন, হিমালয়। সুকুমার জানে প্রশ্নকর্তা এ জবাবে খুশী হবে না কারণ সে এর মর্ম বুঝবে না। ভাববে হেঁয়ালি।

—কী পাও সেখানে?

—হিমালয়কে।

—কী দেয় সে?

—মুক্তির আস্বাদ। এক অনির্বচনীয় আনন্দ।

না, এসবও বুঝবে না ওরা। কারণ হিমালয় ওদের টানে না। তাই চুপ করে থাকাই ভাল। তাই সুকুমার এসব ক্ষেত্রে চুপ করেই থাকে। প্রশ্নকর্তারা একটু করুণার চোখে তাকে দেখে। কখনও-সখনও উপদেশও পায় : ও-সব বাজে কাজ ছাড় সুকুমার। শুধু-শুধু পয়সা নষ্ট, সময় নষ্ট। বৃথাই গতরকে কষ্ট দেওয়া। এবারে বরং পয়সাকড়ি রোজগারে মন দাও। সুকুমার এর পরও চুপ করে থাকে এবং হিতৈষীরা আরও ভাল কোনও উপদেশ খুঁজে না পেয়ে এক সময় প্রস্থান করেন।

"এইসব বাজে কাজ আর ভাল লাগে না, বুঝলে সুকুমার। এবার একটা কাজের কাজে হাত দিতে হবে।"

ধ্রুবর কথায় সুকুমার উৎসাহ পায়।

ধ্রুব বিরক্তির হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, "চল, বেরিয়ে পড়ি।"

সুকুমার ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করে, "কোথায়?"

ধ্রুব অসহিষ্ণু হয়ে বলে, "পর্বতে।"

সুকুমার ম্লান হেসে বলে, "এক্স্পিডিশনে?"

"চেষ্টা করলে দোষ কী?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধ্রুব সুকুমারের নিরুত্তাপ মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

সুকুমার জবাব দিল না। একটা সিগারেট ধরাল। ধীরে সুস্থে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল। ধ্রুবর দৃষ্টিতে বড় তাত। বরফের উপর চড়া রোদ পড়লে শরীরে যে রকম অস্বস্তি হয়, ধ্রুবর দৃষ্টিতে সেই অস্বস্তিই যেন বোধ করছে সুকুমার।

সুকুমার হঠাৎ বলল, "বেশ ফিল্মটা তুলেছে এভারেস্টের, না ধ্রুব!"

ধ্রুব বলল, "চমৎকার।"

ছবিটি দেখানো হয়েছিল আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে। ১২ই মার্চ, ১৯৬০। তারিখটা ওদের দুজনের কাছেই বড় মূল্যবান। সেদিন ছিল হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। ওদের দুজনের বহুদিনের স্বপ্ন সেদিন সার্থক হয়ে

উঠেছিল। সভার শেষে দেখানো হয়েছিল এভারেস্ট অভিযানের অবিস্মরণীয় ছবিখানা।

"বিশ্বদেবদের পাহাড়ে ওঠার আগ্রহ, ওই ছবিটাই বাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমার ধারণা। নয় কি?"

"বিশ্বদেব কি এসেছিল আর?"

"না", ধ্রুব জবাব দিল, "তবে দু-একদিনের মধ্যেই আসবে বলেছে।"

হঠাৎ ওদের কথা ফুরিয়ে যায়। দুজনে চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। সিগারেট খায়। একটা অস্বস্তি সারাক্ষণ সিরসির করে শরীরে ফুটতে থাকে। কেন কে জানে, ওরা একটু অসহায় বোধ করতে থাকে। দাঁত ওঠবার আগে একটা শুলুনি হয় যেমন, তেমনি একটা শুলুনি ওরা বোধ করতে লাগল। এটা ওদের মনের শুলুনি।

ওরা উঠে পড়ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট ছেড়ে, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট পার হয়ে সুটারকিন স্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। অন্যমনস্ক ভাবে একবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-ভবনের দিকে চাইল। সুকুমারের একবার মনে পড়ল, এইখানেই কয়েকমাস আগে একবার তার দেখা হয়েছিল ধ্রুবর সঙ্গে। ধ্রুবর বন্ধু নীলমণিই তাকে সঙ্গে করে এনেছিল। সুকুমার ধ্রুবর পট্টিজোড়া এনেছিল ফেরত দেবার জন্য। সুকুমার মনে মনে হাসল একটু। বাবা! এই পট্টির জন্য কম কথা শুনতে হয়েছে তাকে! অথচ তার বিশেষ দোষও ছিল না। ধ্রুবর কলকাতার ঠিকানা হারিয়ে ফেলাতেই এই বিপত্তি। তবু সে ধ্রুবকে খুঁজতে কম চেষ্টা করে নি। অবশেষে এইখানেই, এই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-ভবনের দোরগোড়াতেই ধ্রুবর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। জায়গাটার উপর এবার একটু মনোযোগ দিয়ে চোখ বুলাল সুকুমার। ফুটপাথের উপর কালো-মাথা-লাল-দেহ এক ডাকবাক্স। এক পাশে কয়েকখানা গাড়ি—অ্যাম্বাসাডার, ফিয়াট, জিপ, স্টেশন ওয়াগন চুপচাপ খাড়া। একটা ভ্যান সদর-ফটকটি জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটা লোক তার পেটে কাগজের বাণ্ডিল ভরছে।

ওরা এগিয়ে গিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে পড়ল।

হঠাৎ সুকুমার বলল, "আচ্ছা ধ্রুব, আমাকে একজন রূপকুণ্ডের কথা বলছিলেন। তিনি হয়তো যেতে পারেন। রূপকুণ্ড গেলে কেমন হয়?"

ধ্রুবর চোখ ঝিলিক মেরে উঠল। উৎসাহে ফাট-ফাট হয়ে সে বলে উঠল, "খুবই ভাল হয়। রূপকুণ্ডের উপরে হোমকুণ্ড। সেটাতেও অ্যাটেম্পট করা যেতে পারে। স্বামী প্রণবানন্দ এ বিষয় একজন অথরিটি।"

"স্বামী প্রণবানন্দ, হ্যাঁ হ্যাঁ", সুকুমার বলে উঠল, "আমাকে একজন বলেছেন, রূপকুণ্ডের উপর স্বামীজীর একটা প্রবন্ধ মাস কয়েক আগে, 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'তে বেরিয়েছে। কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কাগজটা কোথায় পাই বল তো?"

"কত তারিখে বেরিয়েছিল জান?"

সুকুমার বলল, "না।"

"তা হলে এক কাজ কর," ধ্রুব বলল, "ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাও। ওখানে পুরনো ফাইল হাতড়ে দেখ। পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন চলি।"

"আচ্ছা।"

"'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'র কথাটা ভুলো না কিন্তু।"

"না, না।"

"খুব জরুরি কিন্তু। স্বামীজীর প্রবন্ধ হলে ওর মধ্যে অনেক মূল্যবান তথ্য থাকবে। আচ্ছা।"

"আচ্ছা।"

॥ তিন ॥

স্বামীজীর প্রবন্ধটা সুন্দর। রূপকুণ্ড সম্পর্কে অনেক গালগল্প চালানো হয়েছে, রচিত হয়েছে অনেক থিওরি। স্বামীজী সে সব উড়িয়ে দিয়ে এবার রূপকুণ্ডের রহস্যে নতুন আলোকপাত করেছেন।

টেবিলের উপর 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'খানা বিছিয়ে দুজনে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল তার দিকে। স্বামীজীর প্রবন্ধটার সঙ্গেই একটা ছবি ছাপা হয়েছে। ওরা সেই ছবিখানাই দেখছিল।

ধ্রুব বলল, "দেখছিস তো সুকুমার?"

ছবিখানার উপর ধ্রুব আঙুল বুলাতে লাগল।

বলল, "এই রূপকুণ্ড, তার উপরে এই দেখ্ হোমকুণ্ড। আর তারও উপরে এই দেখ্ একটা পিক, নন্দাঘুণ্টির চূড়া। একেবারে আইডিয়েল, বুঝলি?"

সুকুমার বলল, "হাইটটাও খারাপ নয়। ছবির নীচে দেওয়া আছে ২০৭০০ ফুট।"

ধ্রুব বলল, "একেবারে আইডিয়েল। কাল রাতে আমি অনেক ভেবেছি, বুঝলি সুকুমার। দেখলাম, নন্দাঘুণ্টি উইল বি দি বেস্ট চয়েস্। আমরা প্রথম রূপকুণ্ড যাব, সেখান থেকে হোমকুণ্ড. সেখান থেকে নন্দাঘুণ্টি পিক্। ছবিটা দেখে যা আন্দাজ হয়, ইট উইল নট বি ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট। রূপকুণ্ডে বেসক্যাম্প করলে, আমার মনে হয়, পাঁচ-ছ দিন লাগতে পারে।"

ধ্রুব যেন উৎসাহে ফেটে পড়ছে। চোখের সামনে আবার শুরু হয়েছে সেই ছায়াবাজির খেলা, যেটা ঘুমে বা জাগরণে অস্থির করে মারছে ধ্রুবকে। সেই ছায়া-বাজি আবার ভেসে উঠল। ধ্রুব দেখতে পেল, ওরা চলেছে রূপকুণ্ড থেকে নন্দাঘুণ্টির দিকে। ও আছে, সুকুমার আছে, অমিতাভ বিশ্বদেব দিলীপ নিমাই আছে। চট করে ছবিটা মিলিয়ে গেল। এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ!

ধ্রুব বলল, "দেখ্ সুকুমার, আমি অনেক কিছু ভেবেছি। ম্যাসনের বইতে পড়েছি, শরৎ-হেমন্তেই গাড়োয়াল হিমালয়ের আবহাওয়া সব থেকে ভাল থাকে। তাই আমার মনে হয়, এবারের পুজোর ছুটিটায় বেরিয়ে পড়লেই আমরা কাজ শেষ করে ফিরে আসতে পারব। রূপকুণ্ডে যদি একটা বেশ ভাল তীর্থযাত্রীর দল নিয়ে যেতে পারি, তা হলে কিছুটা খরচ ওদের ওপর দিয়ে তুলে নেব। বাকীটা যার যার পকেট থেকে। খরচের একটা রাফ্ এস্টিমেটও করেছি। কৈলাস-মানসসরোবর থেকে বেশী খরচ পড়বে বলে মনে হয় না।"

সুকুমার উৎসাহ পেল। ছবিটার দিকে আবার চাইল। রূপকুণ্ড থেকে মাত্র কয়েক ধাপ উপরে হোমকুণ্ড, আবার তারই একটু উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তুষারাবৃত নন্দাঘুণ্টি। ২০৭০০ ফুট উঁচু। ছবিটা পরিষ্কার, ধ্রুবর প্রস্তাব আরও পরিষ্কার। এরই মধ্যে সব দিক চিন্তা করে বসে আছে ধ্রুব! সুকুমারের মনে হল, ধ্রুবর প্রস্তাবে ফাঁক নেই কোথাও। কাজটা হাসিল করাও এমন কিছু অসম্ভব মনে হল না।

"তোমার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই ধ্রুব।" সুকুমার বলল. "তবে ওরা বলছিল, পাঁচচুলির কথা।"

"ওদের কথা ছাড়", ধ্রুব অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল। "ওরা তো নন্দাঘুণ্টির কথা জানে না। নামই শোনে নি হয়তো।"

সুকুমার বলল. "আমিও এ-পাহাড়টার নাম প্রথম শুনলাম।"

"ইন ফ্যাক্ট, আমিও।" ধ্রুব হাসল। "নামটা ছাড়া এখনও পর্যন্ত আর কিছুই জানি নে এ-পাহাড়টা সম্পর্কে। খোঁজখবর করছি। দেখি ম্যাসনের বইতে যদি কিছু উল্লেখ পাই।"

"মারের স্কটিশ হিমালয়ান এক্স্পিডিশন বইখানাও দেখতে পার," সুকুমার বলল, "ওরা তো এইদিকেই ঘুরেছিল।"

ধ্রুব বলল, "আমার ধারণা, হিমালয়ান জার্নাল ঘাঁটলেই বিশদ বৃত্তান্ত জানা যাবে। তুমি এবার বরং ওদের খবর দাও। এস, বসি একদিন।"

এর ক'দিন পরেই, একদিন সন্ধ্যায় ওদের দেখা গেল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ আর বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মোড়ে, আশুতোষের স্ট্যাচুর নীচে। ওরা কজন গভীর আলোচনায় মগ্ন। মারের বইখানা এখনও পাওয়া যায় নি। হিমালয়ান জার্নাল এখনও দেখা হয়ে ওঠে নি। তবে নন্দাঘুণ্টি সম্পর্কে কিছু খুচরো খবর পাওয়া গেছে।

কুমায়ুন-হিমালয়ে সব থেকে উঁচু পর্বত নন্দাদেবী। এই নন্দাদেবীই (২৫৬৪৫ ফুট) ভারতের সর্বোচ্চ শিখর। তুষারমৌলি নন্দাদেবী সম্রাজ্ঞীর মহিমায় উন্নত শিরে বিরাজমান। আর তার চারদিকে সদাজাগ্রত প্রহরারত অনেক কিঙ্কর-কিঙ্করী। দক্ষিণ দ্বার যারা রক্ষা করছে, তাদের মধ্যে আছে মাইকতোলি (২২৩২০), মৃগথুনি (২২৪৯০), ত্রিশূল (২৩৩৬০)। আর আছে নন্দাঘুণ্টি (২০৭০০)।

"নাড়ী-নক্ষত্রের খবর যোগাড় করা এমন কিছু কঠিন হবে না। তার আগে জানা দরকার, এই পর্বতটাতে যাওয়া আমরা স্থির করছি কি না?"

ধ্রুব বিশ্বদেবের মুখের দিকে চাইল। সুকুমার এখনও এসে পৌঁছল না। ধ্রুব মনে মনে তার উপর চটে উঠল। আচ্ছা লোক! সবাইকে ডেকে-ডুকে এখন নিজেরই পাত্তা নেই।

"দেখুন," বিশ্বদেব জবাব দিল, "একটা ভাল এক্স্পিডিশনে যেতে চাই। পর্বত সম্পর্কে খুব বাছবিচার আমার নেই। আপনারা সকলেই যদি এই পর্বতটাই ঠিক করে থাকেন তো চলুন, এটাতেই যাই।"

ধ্রুব খুব খুশী হল কথাটা শুনে।

"এই যে সুকুমার এসে গেছে। সুকুমার, বিশ্বদেব রাজী হয়েছেন নন্দাঘুণ্টি যেতে। এবার আমার মনে হয়, তোড়জোড় শুরু করা যাক।"

সুকুমার বসে পড়ল ঘাসের উপর। সকলের মুখের দিকে চাইল। দেখল মুখে মুখে উৎসাহের জোয়ার খেলছে। একবার ভাবল, কথাটা সবার সামনে বলবে কি না!

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল সে, "ধ্রুব, আমি দার্জিলিঙ যাচ্ছি। ট্রেনিং নিতে। মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে সিলেকশন করে চিঠি দিয়েছে।"

সুকুমার দার্জিলিঙ যাচ্ছে। মুহূর্তে ধ্রুবর উৎসাহ যেন দপ্ করে নিবে গেল। সুকুমারের ঘোষণা এত আকস্মিক যে, এ কথার মানেটাও ভাল করে ধরতে পারে নি সে।

সুকুমার যেন কৈফিয়ত দিল, "ভারত স্কাউটস্ অ্যান্ড গাইডসের পক্ষ থেকেই আমার নামটা সুপারিশ করে পাঠানো হয়েছিল। এ চান্স্ পাব কখনও ভাবি নি।"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধ্রুবর উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে ফিরে এল। মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিং নিতে যাচ্ছে সুকুমার! বাঃ, এ তো ভালই হল। ধ্রুব ওকে অভিনন্দন জানাল।

"কনগ্র্যাচুলেশন, কনগ্র্যাচুলেশন!" হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

"কবে যেতে হবে সুকুমার?"

"২১শে এপ্রিল।"

"কবে ফিরবে সুকুমার?"

"জুন মাসের গোড়ার দিকেই ফিরে আসব। বেসিক-কোর্সের ট্রেনিং। কদিন আর লাগবে? চার-পাঁচ সপ্তাহই লাগুক।"

২১শে এপ্রিল সুকুমার দার্জিলিঙ রওনা হল। বিশ্বদেবও গেল। বেড়াতে। কলকাতায় ধ্রুবদের দিন কাটতে লাগল কিছুটা মন্থরগতিতে। যে প্রচণ্ড উদ্দীপনার উত্তাল ঢেউ ধ্রুবকে, বিশ্বদেবকে প্রতিদিন আছড়ে-আছড়ে ফেলতে শুরু করেছিল, সুকুমার চলে যাওয়ার পর তার বেগ কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এল। বিশ্বদেবও ফিরে এসেছে। কিন্তু কচিৎ আসে। ধ্রুব তথ্য সংগ্রহে মন দিল।

কেনেথ ম্যাসন তাঁর 'অ্যাবোড অফ স্নো' বইখানিতে হিমালয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ধ্রুবর বিশ্বাস ছিল, ওই বইখানাতেই নন্দাঘুণ্টি সম্পর্কে যা জানবার, তা জানা যাবে। বইখানা পড়ে, সত্য বলতে কী, ধ্রুব একটু ঘাবড়েই গেল। অত বড় বইখানার মাত্র তিন জায়গায় নন্দাঘুণ্টি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। একটিমাত্র অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। তাতে জানা গেল, তিনবার এই পর্বতে অভিযান হয়েছে। ১৯৪৪ সনে প্রথম, ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় আর তৃতীয় অভিযান হয়েছিল ১৯৪৭ সনে। ম্যাসন লিখছেন, ১৯৪৭ সনে একটা সুইস দল নন্দাঘুণ্টি-শিখরে অভিযান করেন। ওই দলের আঁদ্রে রখ্ চূড়ায় পৌঁছান। বাস্, আর বিশেষ কিছু তথ্য ম্যাসনের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। স্মাইথ আর শিপটন গাড়োয়াল-হিমালয়ে অনেক ঘুরেছেন। ওঁরা কি কোন হদিস দিতে পারেন না? ধ্রুব সংগ্রহ করতে লাগল ওঁদের বই। পড়তে লাগল। না, নন্দাঘুণ্টি সম্পর্কে কিছু পাওয়া গেল না। ধ্রুব হতাশ হল। কিন্তু দমে গেল না।

এ কখনও হতে পারে? তিন-তিনটে অভিযান হয়েছে এই পর্বতে, আর তার কোন বিবরণ নেই. এ কি সম্ভব? ধ্রুবর মন বলল, আছে, নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও এর বিবরণ লেখা হয়েছে। কোথাও না কোথাও ছাপা রয়েছে। কিন্তু কোথায়? কোন্ কেতাবে? কোন্‌খানে? ধ্রুবর জেদ চাপল, সেটা ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। এক আবিষ্কারের নেশা চেপে বসল ওর ঘাড়ে।

বইয়ের দোকানে হানা মারতে লাগল ধ্রুব। কলেজ স্ট্রীট, চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীটের নতুন বইয়ের দোকানগুলো চষে ফেলল।

—"মাউণ্টেনীয়ারিং-এর বই আছে?"

—"না।" কলেজ স্ট্রীট সাফ জবাব দিল।

—"দূর মশাই, ওসব বোগাস বইয়ের খোঁজ কে রাখে? ন-মাসে ছ-মাসে যদি কেউ খোঁজ নিল তো ঢের। হ্যাঁ। ওহে, দুখানা সিওর সাকসেস দাও তো।"

চৌরঙ্গীতে এল ধ্রুব। সাজানো, ফ্যাশন-দুরস্ত ঘর। তাকে-তাকে থরে-থরে সাজানো বই।

—"মাউণ্টেনীয়ারিং-এর বই আছে?"

—"আছে। প্লেণ্টি। এভারেস্ট চাই? কাঞ্চনজঙ্ঘা? কে-টু? নাঙ্গা পর্বত?"

—"ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার আছে, স্মাইথের?"

—"না।"

—"টিলম্যানের নন্দাদেবী?"

—"না। ওসব আউট অব ফ্যাশন। আউট অফ্ স্টক।"

ধ্রুব ফিরল চৌরঙ্গী থেকে। পার্ক স্ট্রীট থেকেও ফিরল, ওই একই ব্যর্থতা নিয়ে। পুরনো বইয়ের দোকান হাতড়েও সফল হল না। তা হলে উপায়? একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সন্ধান পেল। তিনি বই হাতছাড়া করতে রাজী নন। তা হলে?

চল ন্যাশনাল লাইব্রেরি। সেখানেও বইগুলো পাওয়া গেল না। ইস্যু হয়ে গেছে।

এখন কী করবে ধ্রুব? হাল ছেড়ে দেবে? নন্দাঘুণ্টির এই যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে মগজ থেকে? মন থেকে মুছে ফেলবে? বিরক্ত মন আর শ্রান্ত দেহটাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরির বিরাট কম্পাউণ্ডের ভিতর থেকে কোনমতে টেনে বাস-স্ট্যাণ্ডে এনে ফেলল ধ্রুব। মে মাসের বিকেল। গরমে রাস্তা তেতে উঠেছে। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্ সপ্ করছে। বাসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে এল। অকস্মাৎ তার মনে হল, এসব পণ্ডশ্রম। বহু সময় সে অপব্যয় করেছে এই নন্দাঘুণ্টির পিছনে। কাজে ফাঁকি দিয়েছে। মালিককে অসন্তুষ্ট করেছে। মনের শান্তি নষ্ট হয়েছে তার। চুলোয় যাক নন্দাঘুণ্টি। আর সে ছুটোছুটি করবে না এর পিছনে।

বাস আসতেই উঠে পড়ল। যা ভিড়, ওঠা কি সহজ কথা! গুঁতোগুঁতি করে খানিকটা উঠতেই বাসটা চলতে শুরু করল। একটা গুঁতো খেল ধ্রুব। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল, আরে তাই তো! আসল জিনিসেরই তো খোঁজ নেওয়া হয় নি! কী বোকা সে! কী বোকা!

"এই রোখ্‌কে, বাঁধ্‌কে, বাঁধ্‌কে।"

হন্তদন্ত হয়ে, গুঁতোগুঁতি করে, এক লাফে চলন্ত বাস থেকে নেমে পড়ল ধ্রুব। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল লাইব্রেরিতে।

ধ্রুব জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনাদের এখানে হিমালয়ান জার্নাল নেই?"

সন্তোষজনক জবাব পেল না, হদিশ পেল না, হতাশ হল ধ্রুব। বিরক্ত হল। আবার এতটা পথ বাসের ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে ফিরতে হবে, সেই কথা মনে হতেই তার বিরক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল।

কিসের জন্য এত ছুটোছুটি? সেই মুহূর্তে, সেই হতাশা-মাখা সন্ধ্যায় ধ্রুবর মনে হল, তাই তো কিসের জন্য ছুটে মরছে সে? কার পিছনে? একটা অলীক কল্পনা, যাকে কখনও ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা যাবে না, তার জন্য এই পণ্ডশ্রমের কোন মানে হয়? অনর্থক সে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলছে। না, আর নয়। আর নয়। আর বুনো হাঁসের পিছে ধাওয়া করবে না সে। সংকল্পটা মনে গেঁথে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল ধ্রুব। যেতে যেতে ভাবল, তার চেয়ে যা পারব তারই চেষ্টা দেখি, আর একবার হিমালয়-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টাই বরং করি। কেউ কোথাও যাচ্ছে কি না এ বছর, তার পাত্তাই লাগাই।

॥ চার ॥

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহেই সুকুমার ফিরে এল কলকাতায়। বেসিক ট্রেনিং সমাপ্ত হয়েছে তার। আস্বাদ পেয়েছে পর্বতারোহণের। সুকুমার ফিরে এল মহা অতৃপ্তি নিয়ে। প্রবল তৃষ্ণা জেগে উঠেছে তার বুকে। এক গণ্ডূষ জলে সে তৃষ্ণা মিটবে কেন? পর্বতারোহণের বেসিক ট্রেনিং এক গণ্ডূষ জলের বেশী কিছু নয়। আর-একটা ইচ্ছা জেগে উঠেছিল সুকুমারের। অ্যাডভান্স কোর্সের ট্রেনিংটাও যদি নিতে পারত!

মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট দার্জিলিঙে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর পরিচালন-ব্যয়ের একটা বড় অংশ বহন করেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সন্তান অ্যাডভান্স কোর্সে ট্রেনিং নেবার কোন সুযোগ পায় না। বেসিক কোর্সেও-বা কটা বাঙালীর ছেলেকে

নেওয়া হয়? সুকুমারের ব্যাচে তো সুকুমার নিজে আর একটা বাঙালীর ছেলে। বাস্। অথচ সে শুনেছে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেকগুলো আসন বরাদ্দ। আর সব আসনই ভর্তি। কাদের দিয়ে এসব আসন ভর্তি করা হল, জানতে বড় কৌতূহল হয়েছিল তার। কিন্তু কী হবে তা জেনে। নিজ দেশে পরবাসী হওয়া বাঙালীর বিধিলিপি। হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তাই সে যখন দেখল, অ্যাডভান্স কোর্সে তার স্থান না হওয়া অবধারিত, তখন সে অবাক হয় নি। দুঃখ পেয়েছিল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তি হল না বলে।

আর সে দুঃখ পেয়েছে তেনজিং-এর ব্যবহারে। তেনজিং, এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং! গুরুজ্ঞানে যাকে পুজো করে এসেছে সুকুমার, সেই তেনজিং! উদার, মহৎ, এক বীরের মূর্তি সাত বছর আগে তার মনে গড়ে রেখেছিল সুকুমার। প্রতিদিন সে মূর্তির আরাধনা সে করে এসেছে। দার্জিলিঙ পেঁছে সে যখন শুনল, ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং তাঁদের নেতৃত্ব করতে পারবেন না, তিনি এভারেস্ট নিয়ে ব্যস্ত, এবারের নেতা তেনজিং, তখন সুকুমার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, কী সৌভাগ্য তার! কিন্তু তেনজিংয়ের সান্নিধ্যে এসে তার স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সে যখন দেখল, তার আরাধ্য প্রতিমার বিসর্জন হয়ে গেছে, শুধু খড় আর মাটির কাঠামোটাই পড়ে আছে, তখন আফসোসের আর অন্ত রইল না তার। শিষ্যের অনুগত মন নিয়ে সুকুমার যতবার এগিয়ে গেছে তেনজিংয়ের কাছে, পাঠ নিতে গেছে, কৌতূহল নিরসন করতে গেছে অসংখ্য প্রশ্নের ডালি নিয়ে, ততবারই সুকুমার ফিরে এসেছে একটা কঠিন, হিমশীতল অবহেলার পাষাণে আঘাত খেয়ে খেয়ে।

সুকুমার এও দেখেছে, তার অধিকাংশ সতীর্থ, বেশীর ভাগই মিলিটারী অফিসার, এসেছেন শুধুমাত্র সার্টিফিকেট সংগ্রহের আশায়। হিমালয়ে তাঁদের আগ্রহ নেই, তাঁরা ব্যগ্র চাকুরির উন্নতিতে। এ ছবি দেখার জন্য তার মন তৈরি ছিল না। হিমালয় এঁদের কাছে সিদ্ধি নয়, সিদ্ধিলাভের উপায় মাত্র।

ট্রেনিংয়ের বিয়াল্লিশটে দিন সুকুমার চরম অশান্তি ভোগ করেছে। হিমালয়ের সান্নিধ্যে এসে আর কখনও সে এত যন্ত্রণা ভোগ করে নি। একদল লোক নিতান্ত এক স্থূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিমালয়ে এসেছে, হুল্লোড় করছে, মদ খাচ্ছে, ফুরসত পেলে মালবাহী সরল শেরপানীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। হিমালয়ের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করছে। সুকুমার যে এদেরই সহযাত্রী, এই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠেছিল।

সে বার বার প্রতিজ্ঞা করল, এর প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতে হবে। হিমালয়ে সে এমন এক অভিযানের সঙ্গে আসবে এর পরে, যার উদ্দেশ্যই হবে তীর্থযাত্রা।

সুকুমার জানে কলকাতায় তার এমন বন্ধু দুজন অন্তত আছে—ধ্রুব আর বিশ্বদেব—যারাও এই একই চিন্তা লালন করছে তাদের অন্তরে। এই ট্রেনিংয়ে এসে সুকুমার আবিষ্কার করল, এই সব দরিদ্র অশিক্ষিত শেরপা, এদের মধ্যেই হিমালয় সম্পর্কে যথার্থ প্রেম আছে। আরও দেখল, এদের দিয়েই যাবতীয় গাধার খাটুনি খাটিয়ে নেওয়া হয়। অথচ সম্মান দেওয়া হয় না একটি ফোঁটাও।

সুকুমার ফিরে এল কলকাতায়। পাহাড়ে চড়ার প্রবল তৃষ্ণা বুকে নিয়ে। রূপকুণ্ড যাবার একটা ইচ্ছা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সে দেখে গিয়েছিল। শুধু রূপকুণ্ড নয়, রূপকুণ্ড থেকে হোমকুণ্ড, হোমকুণ্ড অতিক্রম করে নন্দাঘুণ্টি পর্বতের শিখর-শীর্ষ পর্যন্ত। নন্দাঘুণ্টির কথা ভুলতে পারে নি সুকুমার। দিনে দিনে অস্পষ্ট বাসনাটা স্বচ্ছ-আকার ধারণ করেছে, তাগিদ তীব্র হয়ে উঠেছে. ট্রেনিংয়ের সময় নানা উপেক্ষায়, অবহেলায় ক্রমশ সেটা দানা বেঁধেছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার রূপে।

কলকাতায় ফিরে বিশ্বদেবের সঙ্গে দেখা হল সুকুমারের। বিশ্বদেব হতাশ হয়ে

হাল ছেড়ে দিয়েছে। তার উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছে।

"দূর মশাই", বিশ্বদেব বলল, "চার বছর হল ট্রেনিং নিয়ে বসে আছি। চার বছর ধরে শুধু প্ল্যানই হচ্ছে। আর কিছুই না। আমাদের দ্বারা কিছু হবে না।"

ধ্রুবর সঙ্গে দেখা করল সুকুমার। ধ্রুব বলল, বড় বড় প্ল্যান মাথা থেকে বের করে দিয়েছে সে। তা ছাড়া সে এখন গোমুখ-বদ্রীনাথ যাবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে, আপাতত সেখানেই যেতে চায়। ওখান থেকে ফিরে আসার পর অন্য ভাবনা ভাববে। যে দলের সঙ্গে যাবে ধ্রুব, সে দলটা ১৯শে জুন কলকাতা ছাড়বে। কাজেই হাতে তার সময়ও নেই।

সেদিন বাড়িতে কেমনভাবে ফিরে এসেছিল সুকুমার, সেটা তার স্পষ্ট মনে আছে। বাড়িতে এসে কী কী করেছিল, তাও। সেদিনের সব কাজ, সব ভাবনা তার মনে ফসিল হয়ে আছে। কারণ নিদারুণ হতাশায় তার মনটা জমে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

১৯শে জুন সকালেই ধ্রুব সুকুমারের বাড়িতে গিয়ে হাজির।

"সুকুমার, আমার যাওয়া হল না", ধ্রুবর গাঢ় স্বর বিষাদে আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। মুখটা প্রবল আক্ষেপে মলিন।

বলল, "দাদাকে ওর আপিস আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার এখন কলকাতা ছাড়লে চলবে না।"

ওরা দুজন, তারপর চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে ধ্রুব বিড়বিড় করে বলল, "সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা ছাড়বই। যেখানে হয় যাব।"

সুকুমার শান্তভাবে বলল, "তা হলে নন্দাঘুণ্টিতেই যেতে পারি—রূপকুণ্ড হয়ে।"

ধ্রুব ওর মুখের দিকে চাইল।

"না, রূপকুণ্ড হয়ে যেতে পারবে না।"

"কেন?"

"রূপকুণ্ড হয়ে নন্দাঘুণ্টি যাওয়া যায় না। রুট্ নেই। আমি দেখেছি।"

সুকুমার বলল, "রুট্ কোনও দিকে আছে কি?"

ধ্রুব জবাব দিল, "নিশ্চয়ই আছে। না হলে তিনটে অ্যাটেম্‌প্‌ট্ হল কী করে?"

"অ্যাটেম্‌প্‌ট্ হয়েছে নাকি নন্দাঘুণ্টিতে?"

"হয়েছে বইকি। ম্যাসনের বইতে উল্লেখ আছে, কিন্তু ডিটেল্‌স্ নেই। আমি অনেক খুঁজেছি। পাই নি। একমাত্র ভরসা হিমালয়ান জার্নাল। যোগাড় করতে পার?"

"হিমালয়ান জার্নাল?" চিন্তিত হল সুকুমার। "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি।"

অবশেষে তা পাওয়া গেল, যা ওরা চাইছিল। সুকুমারই যোগাড় করে আনল হিমালয়ান জার্নালের দুষ্প্রাপ্য কপিগুলো। ধ্রুব আর বিশ্বদেব টাইপ-কপি করে ফেলল নন্দাঘুণ্টি অভিযানের অতীত বিবরণগুলো।

ওরা জানল, আজকাল যাকে নন্দাঘুণ্টি বলা হয় কিছুকাল আগে সেই পাহাড়-টার নাম ছিল নন্দকান্ত। শিপটন লিখেছেন, রানীক্ষেত থেকে দেখলে, সব চাইতে দক্ষিণের উঁচু যে চূড়াটা নজরে পড়ে, তার নাম নন্দকান্তর বদলে নন্দাঘুণ্টিই এখন

সাধারণভাবে চালু হয়ে গেছে। মেনেও নেওয়া হয়েছে। আর ওরই কাছে, পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত ছোট যে চূড়াটা তার নাম এখন হয়েছে রণ্টি। আগে এটাকেই নন্দাঘুণ্টি বলা হত।

ওরা পাতা উল্টে উল্টে বের করল পূর্ববর্তী তিনটে অভিযানের বিবরণ। প্রথম অভিযানটি চালানো হয়েছিল ১৯৪৪ সনে। দলে লোক ছিলেন পাঁচজন। তিনজন সাহেব—বেসিল গুড্‌ফেলো, জন বুজার্ড, ইনেস্ ট্রেমলেট্; আর দুজন শেরপা—পাসাং দাওয়া আর নুরি।

এই দলটা বৈজনাথের দিক থেকে যাত্রা করেছিল। সুতোল পেঁছাতে পাঁচ দিন, সেখান থেকে ১৫০০০ ফুট উঁচু বেসক্যাম্পে পেঁছাতে তিন দিন, বেসক্যাম্পে স্থিতি তিন দিন, তারপর ধীরে সুস্থে বৈজনাথে প্রত্যাবর্তনে আট দিন—এই অভিযানে সময় লেগেছিল মোট উনিশ দিন।

আকৃতিতে এবং চারিত্র্যে গাড়োয়ালের এই পর্বতশিখরটিকে সহজগম্য বলে মনে হয়েছিল, তাই এঁরা এই শিখরটিকেই বেছে নিয়েছিলেন।

> We chose Nanda Ghunti as the most readily accessible peak of its size and character. . . .

গুড্‌ফেলোর এই মন্তব্য খুব ভাল লাগল সুকুমারের। ধ্রুবর মনে হল, কথাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অভয় আছে।

> —the most readily accessible peak. . . .

সব সংশয়, সব আশঙ্কার অবসান ঘটায়, ওঠা যায়, এই পর্বতশিখরে ওঠা যায়...

ছোট্ট এই শব্দ দুটো ওদের মনে অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে।

accessible . . . . accessible . . . . accessible . . . . accessible. . . .

ধ্রুব টাইপ-করা কাগজের শীটগুলো বিবর্ণ ঘাসের উপর ফেলে দিল। দেখল সুকুমারের পিছনে আশুতোষের বিরাট ব্রোঞ্জের মূর্তিটা তেজস্বিতায় ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্বদেবের পিছনে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে জনস্রোত, গাড়ির স্রোত সাবলীল গতিতে চলেছে।

ধ্রুব একবার বিশ্বদেবের মুখের দিকে চাইল, একবার সুকুমারের মুখের দিকে। আশুতোষের ছায়া পড়েছে সুকুমারের উপর।

ধ্রুব বলল, "আমরাও নন্দাঘুণ্টিকে বেছে নিলাম। কেমন কিনা বিশ্বাস?"

বিশ্বদেব মাথা নেড়ে সায় দিল।

ধ্রুব বলল, "আর এ চয়েস ফাইন্যাল। কেমন সুকুমার?"

সুকুমার মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

"আর-একটা কথা", ধ্রুব উৎসাহে যেন ফুটছে, "এবারে আমাদের একজন লীডার চাই। কেমন কিনা?"

সুকুমার আর বিশ্বদেব একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল।

"হু উইল বি আওয়ার লীডার? কাকে লীডার করা হবে?"

সুকুমার চুপ করে থাকল।

বিশ্বদেব বলল, "সুকুমার, সুকুমারই লীডার হোক। হিমালয়ের বহু জায়গা ও ঘুরেছে। ওর অভিজ্ঞতা প্রচুর। ও মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিংও নিয়েছে।"

সুকুমার চুপ করে রইল। ধ্রুব খুশী হল।

বলল, "আর ডেপুটি লীডার হোক বিশ্বাস?"

সুকুমার চুপ করে রইল।

বিশ্বদেব বলল, “আর তুমি ধ্রুব? তুমি?”

ধ্রুব বলল, “আমি ফলোয়ার। কিছু ফলোয়ারও তো চাই। কেমন কিনা?”

ধ্রুবর কথার ধরনে বিশ্বদেব হেসে ফেলল। সুকুমার চুপ, গম্ভীর, ভাবিত।

“এইবার”, ধ্রুব যেন নীলাম ডাকছে, “টীমের কথা বল। কাদের নেওয়া হবে দলে?”

“আমরা তিন জন”, বিশ্বাস বলল, “নিমাইদা আর দিলীপকেও পাওয়া যাবে। আর—”

বিশ্বাস থামল। আর কারও নাম চট করে তার মনে পড়ল না।

ধ্রুব বলল, “পাঁচ জন। আর?”

এতক্ষণে সুকুমার মুখ খুলল। বলল, “আর সুরানাকেও নেওয়া যেতে পারে। ওরও ট্রেনিং নেওয়া আছে।”

বিশ্বদেব বলল, “ঠিক। আর সুরানা। ছ জন হল।”

ধ্রুব জিজ্ঞাসা করল, “সুরানা কে?”

বিশ্বদেব বলল, “বোলপুরে থাকে। আমাদের ইনস্টিটিউট সম্পর্কে খুবই উৎসাহী। তাই না সুকুমার?”

সুকুমার বলল, “হ্যাঁ। আমি যখন দার্জিলিঙে যাই বোলপুর স্টেশনে দেখা করেছিল আমার সঙ্গে।”

দৃশ্যটা মনে পড়ল সুকুমারের। বিশ্বদেবও সুকুমারের সঙ্গে দার্জিলিঙ যাচ্ছিল। বেড়াতে। বিশ্বদেবই সুকুমারকে বলেছিল, একটা ছেলে ওদের সঙ্গে দেখা করবে বোলপুর স্টেশনে। তাকে দেখে নি বিশ্বদেব। চিঠির মারফত পরিচয়। সুকুমার যেন প্ল্যাটফর্মে লক্ষ্য রাখে। বাঃ! সুকুমারও তো কখনও দেখে নি তাকে। কী করে চিনবে? তার হাতে একখানা বই থাকবে। বিশ্বদেব বলেছিল। মাউন্টেনীয়ারিংয়ের বই। সত্যিই তাই। সুরানার হাতের বইখানা দেখেই ওরা সেদিন ওকে আবিষ্কার করেছিল বোলপুর স্টেশনে। খুব মজা লেগেছিল সুকুমারের। যেন একটা গোয়েন্দা-কাহিনীর ব্যাপার। লম্বাটে, একহারা গড়ন, এই ছেলেটিকে দেখে, ওর কথাবার্তা শুনে, ভাল লেগেছিল ওদের।

“বেশ, ছ জন হল।” ধ্রুব বলল, “আমার মনে হয়, ভালই হল, ছ জন খুব বেশীও না, খুব কমও না। এবার একটা পাবলিসিটি দিয়ে দেওয়া যাক। কাগজে খবরটা ছেপে দিই। কেমন?”

“পাগল নাকি তুমি!” সুকুমার আঁতকে উঠল প্রায়। কোথায় কী তার ঠিক নেই, এখন থেকেই পাবলিসিটি! সুকুমার মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেল।

ধ্রুব বলল, “পাগলামির কী দেখলে?”

“ধর, শেষ পর্যন্ত যদি যাওয়া না হয়! লোকে বলবে কী?”

ধ্রুব এবার ক্ষেপে গেল।

“যাওয়া হবে না মানে! এতসব করা হল কি তবে ইয়ার্কি করতে! যাওয়া আমাদের হবেই সুকুমার, এই আমি বলে রাখলাম। সামনের পুজোর ছুটিতে এক্স্পিডিশন হবেই হবে।”

॥ ছয় ॥

ধ্রুব পড়ছিল—

> বি আর গুড্‌ফেলো আর জে বুজার্ড ১৯৪৪ সনের অক্টোবর মাসে, দক্ষিণ মুখ দিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা দেখলেন এ পথে শিখরে ওঠা যায় না। ওঁরা আমাদের উত্তর থেকে অভিযান চালাতে পরামর্শ দিলেন। এক মাসের ছুটিতে খুব বেশী সময় হাতে থাকে কিনা সন্দেহ।

ধ্রুব থামল। ওদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "এ বিবরণ উড্‌ সাহেব দিয়েছেন। মিঃ পি এল উড্‌। ইনি এসেছিলেন ১৯৪৫ সনে।"

ধ্রুব আবার থামল। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। কাপে দু-এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। রেস্তোঁরাটায় এখন বেশ ভিড়। ওরা পাঁচ জন—ধ্রুব, সুকুমার, বিশ্বদেব, নিমাই আর দিলীপ—একটা ছোট টেবিলের চারধারে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে। ধ্রুব টাইপ-করা কাগজ থেকে উড্‌ সাহেবের বিবরণ পড়তে শুরু করেছে কিছুক্ষণ আগে।

এর মধ্যে ওদের প্রস্তাবিত পর্বত-অভিযানের খবর কয়েকটা কাগজে খুব ছোট্ট করে বেরিয়ে গেছে। সম্ভবত কারোর নজরই পড়ে নি। সময়টা বাংলার পক্ষে বড় দুঃসময়। বেরুবাড়ি পাকিস্তানকে হস্তান্তর করার কথা চলছে। আসামে বাঙালী-বিতাড়নের কলঙ্কময় ইতিহাসের সূচনা দেখা গিয়েছে। কলকাতার বাতাস উদ্বাস্তু আর বেকার বাঙালীর দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী-দের ধর্মঘট পাকিয়ে উঠছে। কাগজ গরম খবরে ভর্তি। এর মধ্যে ছোট্ট এক টুকরো খবর—কয়েকটা বাঙালী তরুণ পাহাড়ে চড়বার বাসনা করেছে—কে কেয়ার করে?

না করুক, তাতে এদের আফসোস নেই। কাগজে এদের অভিযানের সংবাদ বেরিয়েছে। তার মানে এরা দেশবাসীর কাছে কথা দিয়েছে, অভিযানে যাবে, নন্দা-ঘুণ্টিতে যাবে। এখন সে-কথা রাখতেই হবে, এই এদের পণ।

এখন, তাই, এরা এসে বসেছে চৌরঙ্গী এলাকার একটা রেস্তোঁরায়। অনেক করণীয় তাদের সামনে। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের একটা রুট্‌ ঠিক করতে হবে। সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে। টাকা যোগাড় করতে হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায়, নানা লোক, নানা প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি লিখতে শুরু করেছে ধ্রুব। সাহায্য চাই। আমরা নন্দাঘুণ্টি অভিযানে যাব, নেতা শ্রীসুকুমার রায়, দলের সদস্য ছ জন, আপনার সাহায্যের আশা রাখি। জিনিস চাই, টাকা চাই। বহু জায়গার থেকেই জবাব আসে নি ধ্রুবর চিঠির। কয়েক জায়গা থেকে মাত্র প্রাপ্তিস্বীকার এসেছে।

তাতেও এরা দমে যায় নি। পরিকল্পনা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। পরামর্শ বৈঠক দিনে দিনে জমে উঠছে। হৃত উৎসাহ ফিরে এসেছে। ওদের বন্ধুত্ব একই উদ্দেশ্যের নিবিড় বন্ধনে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে।

ধ্রুব পড়ছিল—

> দিনটি পরিষ্কার থাকলে রানীক্ষেত থেকে ত্রিশূলের বাঁ দিকে, ৫২ মাইল দূরে, নন্দাঘুণ্টিকে স্পষ্ট দেখা যায়।

শুধু রানীক্ষেত থেকে কেন, ওরা যেন এখান থেকেই, এই রেস্তোঁরার ভিড়ে বসেই স্পষ্ট দেখতে পায় দূর হিমালয়ের কোনও নিভৃত স্থানে কুয়াশার মায়াজাল ছিন্ন করে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে এক পর্বত। আচ্ছন্ন করে ফেলেছে

এই কটা তরুণের দিনের চিন্তা, রাত্রির স্বপ্ন। এদের সমগ্র চেতনায় একটিমাত্র অস্তিত্ব—নন্দাঘুণ্টি।

ধ্রুব পড়ছে। ধ্রুবর গলায় উডের বর্ণনা যেন মন্ত্রের মত শোনাচ্ছে।

সুদীর্ঘ গিরিশিরা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত, সমুন্নত শীর্ষ তুষারমণ্ডিত যেন এক গীর্জা...পড়তে পড়তে ধ্রুবর চোখে এই ছবিটাই ভেসে উঠল। ভেসে উঠল শ্রোতাদের চোখেও।

> . . . . and looks rather like a cathedral with its long ridge running east and west and its 'tower' at the western end. . . .

...আর একেবারে পশ্চিমে রয়েছে ওর গম্বুজটা।...

"উডের বর্ণনা কত বিশদ, দেখেছ? সব যেন দেখা যায়।" ধ্রুব একবার মুখ তুলে মন্তব্য করল, তারপর আবার পড়ায় মন দিল।

উডের দলে ছিলেন উড্ নিজে, ওর ভাই জেরেমি আর আর এইচ্ স্যাম্স্। আর ছিল তিনজন ধোটিয়াল (নেপালী) গাইড্—ঘুণ্টুরিয়া, কলবা আর জাদগীর। এরা অভিজ্ঞ লোক। গুড্‌ফেলোর দলে ছিল। জি ডবলিউ এফ নয়েসের সঙ্গেও এ অঞ্চলে ঘুরেছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৫) উড্ সাহেবের দল রানীক্ষেত থেকে রওনা হন। গড়ুড় পর্যন্ত, রানীক্ষেত থেকে ৬০ মাইল, লঝ্‌ঝড় এক লরিতে। তারপর পায়দলে। গড়ুড় থেকে সুতোল ৫০ মাইল। ওঁরা পাঁচ দিনে পেঁছুলেন।

পরদিন সকালেই ওরা সুতোল ছাড়লেন। সঙ্গে ছিল তেইশ জন ধোটিয়াল, নয় জন সুতোলের মালবাহক, ওয়ান থেকে আনা দুটো ছোকরা আর প্রেম সিং গাইড। প্রেম সিং অনেককে নন্দাকিনী নদীর গিরিখাত পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। বোঝার ওজন ৪০ পাউন্ড করে নেওয়া হল। তারপর শুরু হল যাত্রা। এ যাত্রা খুব সুখকর ছিল না। ঘন বাঁশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ। বাঁশঝাড় কেটে কেটে পথ করতে হচ্ছে। প্রায় সারাক্ষণই বৃষ্টি পড়ছে। পথ পিছল হয়ে উঠেছে। তারপর আবার অজস্র চড়াই উৎরাই। কষ্টকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এইভাবে ওঁরা প্রায় ১১০০০ ফুট পর্যন্ত পেঁছুতে পারলেন। সিলিসমুদার হিমবাহের কাছে এসে রাতের মত আশ্রয় নিলেন। পরদিন রোদ উঠল। গাছ পাথর দিয়ে পুল বানিয়ে ওঁরা নন্দাকিনী নদী পার হলেন। নদীর খাত ক্রমশই খাড়া হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। ক্রমশই অপরিসর হচ্ছে।

৩রা অক্টোবর ওঁরা ১২০০০ ফুট উপরে উঠলেন। এ সময় এ অঞ্চলে বর্ষা শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। ওঁরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বৃষ্টি হতে থাকলে বরফ শক্ত হতে পারে না। নরম বরফে পথ চলা প্রাণান্ত পরিশ্রম।

"নন্দাকিনী নদী সমকোণে বেঁকে গেছে। আমরা সেই বাঁক ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। একেবারে উত্তরে। খুব কাছ থেকে এই প্রথম নন্দাঘুণ্টির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল।"

নন্দাঘুণ্টির ডান দিকে ১৭০০০ ফুটের এক 'কল'। ওঁদের প্রথম গন্তব্য এই 'কল'। ১৪০০০ ফুট উপরে ওঁরা বেস্‌ক্যাম্প স্থাপন করলেন। প্রথম ক্যাম্পটি স্থাপিত হল ১৫৫০০ ফুট উপরে। দ্বিতীয় ক্যাম্প হল 'কলে'র ৩০০ ফুট নিচে, একটা ফাটলের গর্তে।

উড্ লিখেছেন :

> ভেবেছিলাম 'কল'টা পার হয়ে যেতে পারব। কিন্তু একে নরম বরফ, তায়

তার উপর সূর্যের প্রখর দীপ্তি। আমরা কাহিল হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে অবশ্য খুব তাড়াতাড়িই 'কলে' পৌঁছে গেলাম। ওধারে চেয়ে যে সব দৃশ্য দেখতে পেলাম তাতে মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। বেতারথলি হিমালের পশ্চিম মুখটা রণ্টি হিমবাহের উপর ঝুঁকে পড়েছে। দুটোর ব্যবধান ৫০০০ ফুট হবে কিনা সন্দেহ। আমাদের নিচে একটা প্রশস্ত তুষার-বেসিন। রণ্টি হিমবাহের দিকে এগিয়ে গেছে। রণ্টি হিমবাহ উত্তর দিকে ক্রমশই একটা সরু গিরিখাতের ভিতর ঢুকে গেছে। মাইল চারেক পর আর তাকে দেখা যায় না। রণ্টি হিমবাহের উপরের অংশ দেখতে পাই নি আমরা। তবে দুনাগিরিকে দেখতে পেলাম। বেতারথলির পিছনে, উত্তরে, দেখলাম তার চূড়াটা উঁকিঝুঁকি মারছে।

এর পরে ওঁরা আরও ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। পঞ্চম ক্যাম্পটা ১৭০০০ ফুটে। মালবাহকরা অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্যামও অসুস্থ হল। ৯ই অক্টোবর, নন্দাঘুণ্টি আরোহণ অসাধ্য জেনে উড্ ঠিক করলেন জেরেমি আর জাদগীরকে নিয়ে রণ্টির চূড়ায় উঠবেন। 'কলে' ১৮৭০০ ফুট পর্যন্ত উঠে গেলেন। আর বেশীদূর এগনো গেল না। জেরেমিও ভেঙে পড়ল গুরুতর পরিশ্রমে। ওঁরা ফিরে গেলেন ব্যর্থ হয়ে। নন্দাঘুণ্টি দুটো আক্রমণ প্রতিরোধ করল অমিত বিক্রমে।

উড্ লিখেছেন :

নন্দাকিনীর পথ ধরে রণ্টি হিমবাহের তুষার-বেসিনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। পথ খারাপ, বাঁশের জঙ্গলে ভর্তি, কষ্টসাধ্য, মাল ৪০ পাউণ্ডের বেশী বইতে পারা যায় না। ১৭০০০ ফুট 'কল'টি পার হয়ে বেসিনে নামতে অন্তত ছয় দিন লাগে।

ধ্রুব পড়ে চলল—

তার চেয়ে কুয়ারি ধুরা হয়ে তপোবন, ধৌলিগঙ্গা, ঋষিগঙ্গা, রণ্টিগড় ধরে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভাল হবে বলেই আমার বিশ্বাস। অবশ্য জানতে হবে, ধৌলি আর ঋষির সঙ্গমে যে গ্রামটা আছে (৬১৭০ ফুট) সেখানে কুলি আর আটা মিলবে কি না? রণ্টি নদীর ধারে বাঁশের জঙ্গল যদি কম থাকে তাহলে ও-পথটা এদিকের চেয়ে শুকনো, সহজ এবং সুখপ্রদ হবে। ও-পথের আর-একটা বড় সুবিধে হচ্ছে এই যে, কাছের গ্রামটা থেকে রণ্টি হিমবাহের বেসিনের মধ্যে ১৭০০০ ফুট 'কল'টা নেই।

পড়া শেষ করে ধ্রুব যখন ওদের দিকে চাইল, তখন রেস্তোরাঁ একেবারে খালি হয়ে গেছে। বসে আছে ওরাই। মাত্র পাঁচজন।

বিশ্বদেব উস্‌খুস্ করছিল।

"অনেক রাত হল।" ও বলল, "এবার উঠলে হয় না?"

বিনাবাক্যে সবাই উঠে পড়ল। রাস্তায় নামল। নাঃ, রাত হয়েছে বটে।

"আচ্ছা ধ্রুব", বিশ্বদেব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "এত যে চিঠি ছাড়া হল, নানা জায়গায়, তা কোনওখান থেকে জবাব আসেনি?"

ধ্রুবর মনে এতক্ষণ উডের কথাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

. . . . this route would I think be easier, drier and pleasanter. . . . This longer route via The Kuari pass, Tapoban, Dhauliganga, Rishi Ganga and Ranti God. . . .

বিশ্বদেবের প্রশ্নে ধ্রুব ধাতস্থ হল।

বলল, "হ্যাঁ, এসেছে, আজই এসেছে, উপরাষ্ট্রপতির কাছ থেকে।"

উপরাষ্ট্রপতির কাছ থেকে! এক ঝাঁক উৎসাহ ওদের মনে যেন ডানা মেলে দিল।

"কী লিখেছেন? কী লিখেছেন তিনি?"
"লিখেছেন" ধ্রুব শান্ত কণ্ঠে বলল, "ট্যুরিস্ট অফিসের সঙ্গে দেখা কর।"
ওরা শূন্য থেকে ধপ্ করে মাটির উপর পড়ল।
"ট্যুরিস্ট অফিস! এর মানে?"
ধ্রুব বললে, "উনিই জানেন। আচ্ছা, কাল দেখা হবে। এখন চলি।"

॥ সাত ॥

"রথ সাহেবের বিবরণও পড়লাম সুকুমার।"

ধ্রুব কথাটা বলেই থামল। টেবিল থেকে চায়ের কাপটা তুলে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগল।

নিমাই জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ বিবরণ?"

"১৯৪৭-এর নন্দাঘুণ্টি অভিযানের। আন্দ্রে রথই ওটা লীড্ করেছিলেন।" ধ্রুব জবাব দিল।

মধ্য-জুলাইয়ের কলকাতা। আকাশ প্রবল আক্রোশে আগুন ঢালছে। সন্ধ্যা-বেলাতেও বিন্দুমাত্র আরাম পাওয়া যায় না। রেস্তোরাঁর পাখাগুলো বৃথাই ঘুরে মরছে। আবার সেই চৌরঙ্গীপাড়ার রেস্তোরাঁয় ওদের দেখা গেল। সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। ভিড়ে ভর্তি ঘর। সেই ছোট্ট একটি টেবিলের চারপাশে ঠাসাঠাসি বসা। সেই ধ্রুব আর সুকুমার আর বিশ্বদেব আর নিমাই বসু আর দিলীপ ব্যানার্জি। আর ওদের চারপাশে নানা টেবিল। হরেক কিসিমের মানুষ। নানান তর্ক। নানা আলোচনা। আসামের হাঙ্গামা। সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ধর্মঘট। পি এস পি। কম্যুনিস্ট চীন। রাশিয়া। আমেরিকা। মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল। জওহরলাল। উত্তমকুমার। সুচিত্রা সেন। চুনী গোস্বামী। অন্যান্য টেবিলগুলোয় পৃথিবীর তাবৎ সমস্যা হানা মারছে। শুধু একটি টেবিলে, ওদের টেবিলটাতে এসব কোন সমস্যাই দাঁত ফোটাতে পারে নি। সেখানে একটি শুধু অস্তিত্ব—নন্দাঘুণ্টি। একটিমাত্র ধ্যান—নন্দাঘুণ্টি। একটিই আলোচনা—নন্দাঘুণ্টি।

"শুধু নন্দাঘুণ্টিতেই নয়", ধ্রুব বলল, "১৯৪৭ সালে যে সুইস্ দলটা এসেছিল, আন্দ্রে রথও সেই দলের একজন, সে-দলটা গাড়োয়ালের চার-পাঁচটা পাহাড়ের চূড়া জয় করেছিল। কেদারনাথ, সতোপন্থ, বালবালা, কালিন্দী—এই কটা নামই মনে আছে আমার। জানি নে আরও কোনও পাহাড়ে চড়েছিলেন কি না! সেইবারই ওঁরা নন্দাঘুণ্টিতে অভিযান চালান।"

বিশ্বদেবের বিস্মিত মন্তব্য শোনা গেল, "তাজ্জব ব্যাপার!"

নিমাই বলল, "হ্যাঁ, পাহাড়ের ইজ্জত পাংক্চার্ড্ করে দিয়ে গেছে।"

ধ্রুব বলল, "আরে এরেই কয় মাউণ্টেনীয়ার। এসেওছিলেন সব বাঘা বাঘা লোক। আলফ্রেড্ সুটার, রেনে ডিটার্ট। ডিটার্ট ১৯৫২ সালে সুইস দলের সঙ্গে এভারেস্টেও এসেছিলেন। আলেক্স গ্র্যাভেন। আর ছিলেন এক মহিলা, মিসেস লোহ্নার।"

"মহিলা!" নিমাই সুঁই করে একটা চাপা শিস দিয়ে উঠল।

"আরে হ মহিলাই।" ধ্রুবর মুখ দিয়ে এতক্ষণে পরিষ্কার মাতৃভাষা বেরিয়ে এল। "এই মহিলা আমাগো শ্রীমতী লিভিং লাগেজ না। পুরুষের বাবা। পর্বত-

বেড়ানী মাইয়া।"

মাথা ঝুঁকিয়ে বিলিতী কায়দায় নড্ করল নিমাই। তৎসহ সমর্থনসূচক লম্বা একটি অনুচ্চ সিটি। সূ-উ-ই।

"এই দলে তেনজিংও ছিলেন।" ইতিহাসবেত্তার অথরিটি নিয়ে ধ্রুব বলল। "শুধু তাই নয়, তেনজিংয়ের জীবনের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও এর সঙ্গে জড়িত। একটা দুর্ঘটনাই তেনজিংয়ের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।"

"কী রকম, কী রকম!" সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে জানতে চাইল।

"বলছি," ধ্রুবর ব্যবসাবুদ্ধি হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল। "তার আগে চা চাই। এক পেয়ালা গরম চা।"

চা এল আবার। ধ্রুব গলাটা ভিজিয়ে নিল। সিগারেট ধরাল।

তারপর শুরু করল, "এই বছরই কেদারনাথ অভিযানে তেনজিংয়ের হঠাৎ কপাল খুলে যায়। এইবারই তিনি প্রথম পর্বতচূড়ায় ওঠেন। এইবারই ঘটনাচক্রে সব শেরপার যা কাম্য, শেরপা-জীবনের যা চূড়ান্ত সম্মান, সেই সর্দারের পদ তিনি পেয়ে যান। কেদারনাথের চূড়াতে (২২০০০ ফুট) ওঠাই তেনজিংয়ের জীবনে প্রথম চূড়ায় ওঠা। এর আগে তেনজিং অভিযানে গিয়েছেন অনেক। কিন্তু সামিট্-পার্টিতে ওঁকে কখনোই নেওয়া হয় নি। এবারও কেদারনাথের চূড়ায় ওঠবার জন্য যে সামিট্-পার্টি নির্বাচিত হল, তাতে তেনজিংয়ের নাম ছিল না। মিসেস্ লোহ্নারকেও বাদ দেওয়া হয়েছিল। তেনজিংয়ের ডিউটি পড়ল মিসেস্ লোহ্নারের খবরদারি করা। ওঁরা সব থেকে উঁচু শিবির পর্যন্ত উঠেছিলেন, কিন্তু সেখানেই স্থিতি।"

"সামিট-পার্টি ভোরবেলায় রওনা হল। তেনজিং, মিসেস্ লোহ্নার ওঁদের ঘটা করে বিদায় জানালেন। তারপর ওঁরা ফিরেও এলেন। ফিরল না শুধু একজন। ওয়াংদি নরবু। তেনজিংদের দলের সর্দার। ওঁরা যখন চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছিলেন, সরু একটি গিরিশিরার উপর দিয়ে, সেই সময় হঠাৎ সুটার আর ওয়াংদি আছাড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ে যান। ওয়াংদি সর্দার আর সুটার সাহেব একই দড়িতে বাঁধা ছিলেন। ওঁরা প্রায় হাজার ফুট গড়িয়ে পড়েন। সাথীরা অনেক পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত যখন ওঁদের কাছে পৌঁছালেন দেখলেন, সুটার সাহেবের মারাত্মক কোন চোট লাগে নি। দেহের নানা জায়গা ছড়ে গেছে, কয়েক জায়গায় কেটেও গেছে, কিন্তু চলবার শক্তি রহিত হয় নি। মারাত্মক চোট খেয়েছে ওয়াংদি। ওর একটা পা ভেঙে গেছে। সুটার সাহেবের ক্র্যাম্পনের আঘাতে ওর আর-একটা পা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। চলচ্ছক্তি তো নেই-ই তার, ওঠবার ক্ষমতাও নেই। সারাদিনের অপরিসীম পরিশ্রমের পর সবাই এমন এলিয়ে পড়েছেন যে ওয়াংদিকে বয়ে নিয়ে যাবেন, এমন ক্ষমতা কারও নেই। ওঁরা তাই সেখানে কোনমতে একটা তাঁবু খাটিয়ে, ওয়াংদিকে তার মধ্যে রেখে সেদিন চলে এলেন। পরদিন ভোর হতে-না-হতেই ত্রাণকারী দলকে ওয়াংদির কাছে পাঠানো হল।

"ওঁরা গিয়ে দেখলেন ওয়াংদি রক্তে ভাসছে। ওঁরা বেজায় ঘাবড়ে গেলেন। সবাই যখন আগের দিন ওয়াংদিকে ফেলে চলে গেলেন তখন ওয়াংদির প্রাণ ভয়ে উড়ে গিয়েছিল। সে ধরে নিয়েছিল, তাকে জন্মের মত নির্জন পাহাড়ে ফেলে রেখে সবাই বুঝি চলে গেছে। আতঙ্কে ভয়ে ওয়াংদি বুঝি পাগলই হয়ে গিয়েছিল। তাই তিল তিল করে মরার হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে নিজের গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল। ওয়াংদিকে কোনক্রমে ওখান থেকে [illegible] করে এনে চিকিৎসার জন্য মুসৌরী পাঠিয়ে দেওয়া হল।
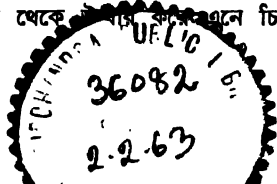
"এই দুর্ঘটনাই তেনজিংয়ের কপাল ফিরিয়ে দিল।"

ধ্রুব আর-একটা সিগারেট ধরাল।

তারপর বলল, "শেরপা তেনজিং এই প্রথম তেনজিং সর্দারে রূপান্তরিত হলেন।"

॥ আট ॥

"অবিশ্যি" একটু থেমে ধ্রুব বলল, "নন্দাঘুণ্টিতে তেনজিং সর্দার আসেন নি। পুরো দলটা আসেনি এখানে। এসেছিলেন শুধু রখ আর ডিটার্ট। সঙ্গে ছিল তিনজন শেরপা—আঙ তেনজিং (এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং সর্দার নন), আঙ নরবু আর পেনুরি। ওঁরা সুতোল থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর নন্দাঘুণ্টি অভিযানে যাত্রা করেন।"

নন্দাকিনীর খাতে পৌঁছাতে ওঁদেরও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ঘন বাঁশের ঝাড় কেটে পথ করতে হয়েছে। কাজেই চলার গতি মন্থর হয়ে এসেছিল খুবই। আর ছিল বিছুটি গাছের জঙ্গল। মাইলের পর মাইল। গাছগুলো হাঁটু সমান উঁচু, কোথাও বা কোমর ছুঁই-ছুঁই। এত ঘন যে পথ দেখা যায় না। কতবার যে ওঁদের হোঁচট খেতে হয়েছে, পাতা-ঢাকা গর্তে পা ঢুকে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছেন ওঁরা, তার আর ইয়ত্তা নেই। বাঁশঝাড় যদি বা পার হওয়া গেল, আগাছার জঙ্গল পাতলা হয়ে এল, তবু নিস্তার নেই। এবার এল রোডোডেনড্রনের বাধা। সামনে পড়ল ছ্যাৎলাধরা শ্যাওলা-জমা পাথুরে পাহাড়। ভয়ানক পিছল। পা রাখা যায় না। ছোট ছোট ঝোপের গোড়া চেপে ধরে অতি সাবধানে পা ফেলতে হয়। পোশাক ছিঁড়ে গেল ঝোপের কাঁটার খোঁচা লেগে। হাত-পা ছড়ে গেল। ওঁদের মেজাজ একেবারে তিরিক্ষি হয়ে উঠল।

যাই হোক, অভিযাত্রীরা অতিকষ্টে নন্দাকিনীর স্রোত পার হয়ে ওপারে গিয়ে পৌঁছলেন। এপারে পাথর। পাথরে পা দিয়ে ওঁরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কুয়াশায় ঢাকা ছিল এতক্ষণ, অভিযাত্রীরা তাই ত্রিশূলের (২৩৩৬৫ ফুট) পশ্চিম মুখটা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কুয়াশার আবরণ সরে যেতেই বিশালকায় ত্রিশূল ভেসে উঠল। পূবদিকের উপত্যকার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশূল। ওঁদের মাথার উপর আরও ১৪ হাজার ফুট সোজা উঠে গেছে। একটা পাথর-ছিটানো হিমবাহ ওর গা বেয়ে নেমে এসেছে। আর-একটা উপত্যকা উত্তর থেকে নেমে এসেছে ওর বাঁ দিকে। আর সেই উপত্যকারই শীর্ষদেশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাঘুণ্টি।

নন্দাঘুণ্টির পূব আর দক্ষিণে দুটো গিরিশিরা এসে মিশেছে। অভিযাত্রীদের মনে হল, পূর্বদিকের গিরিশিরাটা দক্ষিণ গিরিশিরার চাইতে অনেক বেশী লম্বা, তবু ওটাতে ওঠাই অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। রখ সাহেব স্থির করলেন ওঁরা পূব রিজ্ (গিরিশিরা) দিয়েই উঠবেন আর হুকুমগালা কলে (১৮০০০ ফুট) একটা শিবির স্থাপন করবেন। ডিটার্টের মত ছিল, দক্ষিণ রিজ্ দিয়ে ওঠা।

আবহাওয়া ওঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে নি। কুয়াশায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। বৃষ্টি দিয়েছে পথ-চলার কষ্ট বাড়িয়ে। এত সব প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ওঁদের একটু একটু করে এগোতে হয়েছে। ওঁরা সঙ্কল্প করেছিলেন পূব দিকের রিজ ধরে এগিয়ে যাবেন। যতটা উঁচুতে সম্ভব শিবির স্থাপন করবেন। ওঁরা দেখেছিলেন পূব দিকে রিজ্টা অনেকটা উঠে গিয়ে একটা উঁচু জায়গার সঙ্গে মিশেছে। মাউন্টেনীয়ারিংয়ের ভাষায় যাকে বলে—'সোলডার' বা কাঁধ। এই কাঁধ

থেকে আর-একটি সরু গিরিশিরা উঠে গিয়ে নন্দাঘুণ্টির চূড়াতে পেঁচেছে। অভিযাত্রীরা পূব রিজের শিলাময় তলদেশের মারাত্মক প্রতিরোধ এড়িয়ে কাঁধ পর্যন্ত পেঁাছে যদি যেতে পারেন তবে তার উপরের অংশটাতে উঠতে খুব বেশী বেগ তাঁদের পেতে হবে না।

ধ্রুব বলল, রখ লিখেছেন—

পরদিন সকালেও মেঘ কাটল না। কুয়াশার একটা ঘন আবরণ রিজ্‌টাকে ঢেকে রাখল। আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবু আমরা ঠিক করলাম, আমরা উঠে যাব। পূব রিজের উপর যতটা পারি, ততটাই উঠব। যেখানে ঠেকে যাব, শিবির করব সেইখানেই।"

ধ্রুব বলল, "ডিটারমিনেশনটা দেখেছ ওঁদের! এর নাম মাউণ্টেনীয়ার। কত সাহস! কী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!"

ধ্রুবর মন্তব্যে কেউ কোন কথা বলল না। ওদের মনে মনে একটি কথাই খেলে বেড়াতে লাগল. আমরাও পারি। সুযোগ পেলে আমরাও পারব, পিছিয়ে যাব না। কিন্তু এমন সুযোগ কি পাব? পাব কি? সত্যিই কি যেতে পারব পর্বতারোহণে? না কি এই রেস্তোরাঁর পরিসরে যে ইচ্ছা জন্ম নিয়েছে, এই পরিসরেই তা বিনষ্ট হবে? সুকুমার, বিশ্বদেব, নিমাই, দিলীপ, ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন জবাবটা ওখান থেকেই মিলবে। ধ্রুব চেয়ে আছে সুকুমার, বিশ্বদেব, নিমাই, দিলীপের মুখের দিকে। বুঝি ওদের দিক থেকে জবাবটা আসবে।

"তারপর?" স্তব্ধতা ভাঙ্গল বিশ্বদেব। "থামলে কেন ধ্রুব? তারপর?"

"তারপর", ধ্রুব শুরু করল, "অতি কষ্টে অভিযাত্রীরা গিরিশিরাটায় উঠলেন।"

একে চড়াইটা ছিল বেশ খাড়া, প্রতি পদক্ষেপে দম বেরিয়ে যায়। তার উপর আবার পাথুরে প্রোজেকশন। ওঠবার পথে অনেক পাথর ঝুলে ঝুলে রয়েছে। এই বেরিয়ে-আসা পাথর পেরিয়ে অবশেষে ওঁরা পেঁাছে গেলেন ১৮ হাজার ফুট উপরে। এখানে একটা খুব খাড়া চড়াই পড়ল। চড়াইটা বরফের চাঙড়ে ভর্তি। বরফের চাঙড়গুলো একটার গায়ের ওপর আর-একটা এমনভাবে সাজানো রয়েছে এখানে, দেখলে মাছের আঁশের কথা মনে পড়ে যায়। ডিটার্ট দড়ি বেঁধে উঠতে চেষ্টা করলেন। রখ তাঁকে 'বিলে' (নিচে দাঁড়িয়ে দড়ি ছেড়ে ছেড়ে উপরের লোকের ভারসাম্য রক্ষা) করতে লাগলেন। তা সত্ত্বেও ডিটার্টের পা বারে বারে পিছলে যেতে লাগল। এই অংশটাতে উঠতে গেলে ওঁরা দেখলেন, অসংখ্য 'পিটন' (গজাল) লাগবে। তাই তাঁরা অন্য আর-একটা রাস্তা বের করার চেষ্টা দেখতে লাগলেন। ওঁদের বাঁ দিকে একটা 'প্রিসিপিস্‌', বরফের চাদরে মোড়া। সেদিকে যাবার চেষ্টা না করে ওঁরা ডান দিকে এগোলেন। ক্ষয়ধরা পাথরের 'কুলয়র' ধরে কিছুটা নেমে এসে ওঁরা গোটা কতক পাথরের তাক পেলেন। এই তাকগুলো ধরে একটু এগিয়ে গেলেই আবার সেই মাছের আঁশের মত ভিজে চাঙড়গুলোয় পেঁাছনো যায়। ওখান থেকে দু শো ফুট উঠলেই আবার রিজের উপর ওঠা যায়। ওঁরা এই পথে ঘুরে এসেই আবার রিজ্‌টাতে পেঁাছে গেলেন। আরও এক শো ফুট উপর থেকে বরফ শুরু হয়ে গেছে। সেদিন ওঁরা আর উঠতে চাইলেন না। এই পথটুকু উঠতেই ওঁদের হাঁফ ধরে গিয়েছে। ওখানেই সেদিন তাঁবু খাটালেন। তখন বেলা মাত্র দুটো। কিন্তু আবহাওয়ার উন্নতি হল না। ওঁরা একটু দমে গেলেন। রাত্রে যদি বরফ পড়ে তা হলে চূড়ায় যাওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিতেই হবে। ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যেতে হবে।

রাত দুটোয় রখ সাহেব উঠে পড়লেন। তাঁবুর বাইরে মাথা বের করে আকাশের দিকে চাইলেন। গোটা কতক তারা জ্বল-জ্বল করছে। খুশিতে রখ সাহেবের মন

ভরে গেল।

—তেনজিং! তেনজিং! আঙ তেনজিংকে ডাক দিলেন।

—ওঠো, ওঠো। স্টোভ ধরাও। ফুড্ বানাও।

আধ ঘণ্টা পরে ডিটার্ট সাহেব মুখ বের করে আকাশ পানে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। আকাশ আবার কালো হয়ে আসছে। মেঘ জমছে। সব তারা মুখ লুকিয়ে ফেলল। শুধু একটা মাত্র তারা জ্বলতে লাগল। মেঘ তাকে ঢাকতে পারল না, কুয়াশাও না। রখ সাহেবের যে আশা মন থেকে ক্রমশ অন্তর্হিত হতে শুরু করেছিল তা এই একটি তারার আলোকের প্রশ্রয় পেয়েই যেন কোনক্রমে টিঁকে থাকল। আঙ তেনজিং উঠে পড়েছিল। রখ জিজ্ঞাসা করলেন, তেনজিং, ওয়েদার কেমন? আঙ তেনজিং জবাব দিল না, সাহেবদের দিকে একটা পাথর ছুঁড়ে দিল। মোমবাতির আলোয় পাথরটা ধরতেই ওটা চিকচিক করে উঠল। সর্বনাশ! সাহেবদের বুক কেঁপে উঠল। বরফ পড়েছে।

তবু ওঁরা ঠিক করলেন, ওঁরা চূড়ার দিকে যাত্রা করবেন। ঠিক করলেন ক্র্যাম্পন লাগিয়েই ওঁরা কঠিন শিলা অতিক্রম করবেন।

রাতের অন্ধকার থাকতেই, প্রায় পৌনে চারটার সময় ওঁরা রওনা দিলেন। লণ্ঠন জেলে পথের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করলেন। কী অসহ্য শীত। ডিটার্ট আগে আগে চললেন, তারপর রখ। তেনজিং সবার পিছনে। নরবুকে তাঁবুতে রেখে আসা হল। সেই রাত্রে তুষার-ঢাকা শিলার চাঙড়গুলো পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগল। রিজের উপর উঠতেই বরফ পাওয়া গেল। বেশ সুন্দর বরফ। এক এক লাথিতেই এক-একটা ধাপ তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। এবার ওঁরা দ্রুত উঠতে লাগলেন। চড়াইটা অসম্ভব খাড়া, তবু ওঁদের গতি ব্যাহত হল না। ডিটার্ট আগে আগে টকটক করে উঠে যাচ্ছেন। রখের পক্ষে তাঁর নাগাল ধরা মুশকিল হয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারে ডিটার্টকে দেখাচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা কালো বাদুড়—নরক থেকে উঠে এসে আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

দিনের আলো ফুটে উঠল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে প্রায়। আশেপাশের দৃশ্যগুলো পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ক্রমে। উত্তরে, ওই যে, রণ্টি হিমবাহের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবীর শৃঙ্গ দুটোকে। বাঁ দিকে কে যেন অজস্র পর্বতের মণিমুক্তা দিয়ে গাঁথা একটা মালা ছড়িয়ে রেখেছে। তার মধ্য থেকে উঁকি মারছে দুনাগিরির চোখা মুখখানি। আর ওই যে চাঙাবাঙ, ওই যে কলঙ্কর শিখর। পিছনে ত্রিশূলের পশ্চিম হিমবাহ।

রিজটা উপরের দিকে ক্রমশঃই বেশ আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে উঠে আসছিল। শেষাশেষি এসে হঠাৎ দিয়েছে আকাশমুখো এক প্রচণ্ড লাফ। রিজের মুখটা একেবারে সরু হয়ে গেছে এখানে। আর চারপাশে ঝুলছে অজস্র কার্নিশ। এখানে চড়াইটা এতই খাড়া যে প্রতিপদে অভিযাত্রীদের ধাপ কাটতে হচ্ছিল। ভাগ্য ভাল যে এখানকার বরফ বেশ শক্ত। ডিটার্টের শরীরও বেশ ভালই ছিল। মোটামুটি বেশ দ্রুতগতিতেই চড়াইটা ওঁরা অতিক্রম করলেন। উপরে উঠে দেখলেন, রিজটা এধারে বেশ লেভেল হয়ে এসেছে। কিন্তু ওটা এত সরু, যেন ক্ষুরস্য ধারা, যে, দেখলেই হৃৎকম্প লাগে। ডিটার্ট ধীরে ধীরে ধাপ কাটতে লাগলেন। অতি মন্থর গতিতে এগিয়ে 'কাঁধ'টার উপরে পেঁাছালেন। রিজটা এখান থেকে আরও সরু হয়ে নন্দাঘুণ্টির চূড়া পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। চূড়ার দূরত্ব প্রায় আধ মাইল হবে আর উচ্চতা খুব বেশীও যদি হয়, তবে এক হাজার ফুট। মনে হল, আরোহণ-সাধ্য।

রখ লিখেছেন—

অতিমাত্রায় সাবধান হয়ে আমরা একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। দড়ির প্রান্তে পেঁছনো মাত্রই বিলে করা হচ্ছিল। এক জায়গায় একটা কার্নিশ এমন তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে যেন ওটা একটা ঈগলেরই ঠোঁট। তেমনই হিংস্র। তেমনই ধারালো।

অবশেষে এই বিপজ্জনক স্কন্ধ ওঁরা পার হয়ে গেলেন। বেলা তখন নয়টা। এই পথটুকু অতিক্রম করতে ওঁদের পাঁচটি ঘণ্টার অমানুষিক মেহনত লেগেছে। আকাশে মেঘ জমতে লাগল। এগিয়ে যাবার পথেও নানা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। দূর থেকে পথটাকে যতটা সহজগম্য বলে বোধ হয়েছিল, কাছে এসে ততটাই আয়াসসাধ্য বলে জানা গেল। এই বিপজ্জনক রিজটা ধরে এগিয়ে যাওয়া হবে, নাকি রিজ থেকে নেমে বরফের ঢালু দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাওয়া হবে, এই সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল। ওঁরা তবু এগিয়েই চললেন। এবার আগে আগে চলেছে আঙ তেনজিং। পিছনে ওঁরা দুজন। একবার অল্পক্ষণের জন্য কুয়াশা সরে যেতে ওঁরা দেখলেন, চূড়া যেন খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। আবার কুয়াশার ঘন আবরণ ওঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওঁরা থামলেন না। প্রাণ বিপন্ন করে উঠতেই লাগলেন। অবশেষে চরাচরঢাকা সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে তাঁরা একটা জায়গা পর্যন্ত উঠেই ভাবলেন, এইটেই নিশ্চয় চূড়া। নিজেদেরকে শান্তভাবে অভিনন্দিত করে আনন্দে ফিরে চললেন নিচের দিকে।

ধ্রুব বলল, "এই হল রখের বিবরণ।"

একটু থামল। তারপর বলল, "এই বিবরণের সব থেকে মজার জায়গা হচ্ছে এইটে, রখ লিখছেন,

. . . . And finally, at midday, we reach what we thought must be the summit for, although visibility was practically nil. . . .

......অবশেষে মধ্যাহ্ন সময়ে, আমরা যেখানে পেঁছিলাম, মনে করিলাম নিশ্চয়ই উহাই চূড়া হইবেক, যদিও, প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যতা শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল......বঙ্গানুবাদে তো এই দাঁড়ায়। কেমন কি না?"

"আর সাদা কথায় দাঁড়ায়" নিমাই বলল, "ওঁরা শেষ পর্যন্ত চূড়ায় উঠতে পেরেছিলেন কি না, সে সম্পর্কে ওঁরাও নিশ্চয় করে কিছু বলেন নি। কেমন কি না?"

॥ নয় ॥

এবারে এগিয়ে এল নিমাই। এতদিনের ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে এই প্রথম সে মুখ খুলল।

বলল, "সেই তপোবনেই যদি যেতে হয়, তবে আর কুয়ারি গিরিপথ ডিঙিয়ে কেন?"

এতদিনের আলোচনায় ও বিশেষ যোগ দেয় নি। ধ্রুব, সুকুমার, বিশ্বদেব আলোচনায় মেতেছে, তর্ক করেছে। নিমাই একপাশে বসে চুপচাপ শুনে গেছে ওদের কথা। কাপের পর কাপ চা খেয়েছে। আর মনে মনে শিস্ দিয়ে সুর ভেজেছে, "লে লো সুরমা লে লো, ট্রালা লালা লা লা, ট্রালা লালা লা লা।......" অথবা "এক পলকে একটু দেখা, আরেকটু বেশী হলে ক্ষতি কি......"

আসলে নিমাই প্রথম দিকে এই জল্পনা-কল্পনাকে খুব বেশী আমল দেয় নি। কলকাতার প্রেস-ঘরের ঘুপসিতে বসে বসে"কী পার্কে চানাচুর চিবিয়ে কিংবা রেস্তোরাঁয় দিনের পর দিন চা উড়িয়ে যদি পাহাড় চড়া যেত, তা হলে আর ভাবনা ছিল না কোনও। কলকাতার গলিতে গলিতে লক্ষ লক্ষ মাউণ্টেনীয়ার তা হলে এতদিনে গজিয়ে যেত। গেঁজিয়ে গেঁজিয়ে পাহাড় চড়া যায় না। বেশ তো, তাই যদি, তবে নিমাই-ই বা আসে কেন। আসে কেন? হয়তো ও ভাবে..."যদি কাটে প্রহর পাশে বসে মনের দুটো কথা বলে ক্ষতি কি...ডারা রা রা আ......" তাই ওরা যখন গভীরভাবে আলোচনায় ডুবে যেত, নিমাই তখন ওদের গ্রাম্ভারী পোজ, আর পশ্চার দেখে মনে মনে হাসত। না হেসে পারত না। সুর ভাজত নীরবে। না-ভেজে পারত না।

"লে লো সুরমা লে লো......", সিনেমার নায়ক কিশোরকুমারের অনুকরণ করত মনে মনে।

এমনি সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই নিমাই এন সি সি'র শ্রমসাধ্য ট্রেনিং শেষ করেছে। ওদের ব্যাচে নিমাই ছিল মূর্তিমান এক উৎপাত। শীতের ভোরে প্যারেড করতে যাবার সময় কোন ক্যাডেট্ জুতোয় পা ঢুকিয়েই হয়তো "আঃ" করে চমকে উঠেছে, তাড়াতাড়ি পা বের করে এনেছে। বুটের ভিতর আস্ত একটা পুডিং। না পারে ফেলতে না পারে গিলতে, বেচারী ক্যাডেটের তখন এমনই অবস্থা। কারণ আর সময় নেই। এই মুহূর্তে প্যারেডে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে কঠিন সাজা পেতে হবে। অগ্নিদৃষ্টিতে সে নিমাইয়ের দিকে চাইল। মুচকি হেসে নিমাই সুরটাকে একটু উচ্চগ্রামে তুলে দিল..."লে লো সুরমা লে লো..." আর তাকে মনের আগুন মনে চেপে সেই পুডিং-প্যাঁচপেচে বুটের ভিতরই পা ঢোকাতে হল। প্যারেড শেষ করতে হল। তারপর দলপতির কাছে নালিশ রুজু হল।

—সার, এ নিমাইয়ের কাজ।

—প্রমাণ?

—প্রমাণ কিছু নেই। তবে—

—তবে যাও। এখন বিরক্ত করো না।

দলপতির আফিস থেকে বেরবার মুখেই নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। ক্যাডেটটি নিষ্ফল রাগে কটমট করে ওর দিকে চাইল। নিমাই বিলাতী ছবির নায়কের কায়দায় ওকে একটি নড্ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটি ঢেউ-খেলানো শিস্—সু-উ-ই।...... "লে লো সুরমা লে লো......"

আবার নিমাইয়ের নামে নালিশ। এবারে অন্য ক্যাডেট।

—সার্, নিমাই আমারে গালি দিছে।

—কী বলেছে।

—অসইভ্য কথা।

—কী কথা!

—সার্, নিমাই আমারে বুকা কয়।

—বোকা বলেছে!

—হ্যাঁ সার্।

—এর মধ্যে আবার অসভ্য কথা এল কোত্থেকে?

—না সার্, অ্যার মইদ্যে অসইভ্যতা নাই। অ্যার চাইতেও খারাপ গালি নিজেরে দিছে সার্, অসইভ্যতা তার ভিতরেই আছে।

এবার দলপতির অবাক হবার পালা।

—তার মানে?

—মানে বড় খারাপ সার্।

—তা সে যদি নিজেকে খারাপ গালি দেয়, তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কিসের?

—আমার ব্যথা অইন্যখানে সার্। আমারে যে বুকা কয়। আর নিজেরে যা কয়, তা বলা যায় না।

—যাও, যাও। বিরক্ত করো না।

বেচারী মনের কথা বলতে না পেরে, মনের ব্যথা নামাতে না পেরে মুখ চুন করে বেরিয়ে যায়। ..."লে লো সুরমা লে লো..." দূর থেকে ভেসে আসে নিমাইয়ের বিজয়-সঙ্গীত।

এমনি করেই নিমাই এন সি সি'র ট্রেনিং শেষ করেছে। এমনি করেই সে মনোনয়ন পেয়েছে মাউণ্টেনীয়ারিং শিক্ষার বেসিক কোর্সে। সে শিক্ষাও সমাপ্ত করেছে এমনি "সুরমা ফিরি" করে-করেই। পর্বতারোহণের গুরুতর পরিশ্রমে অনেক রথী-মহারথীও যখন ঘায়েল হয়ে পড়েছে, কোনক্রমে শিবিরে পৌঁছে তাগড়াই তাগড়াই সব জর্নেল-কর্ণেলরা যখন বিছানার কোলে নেতিয়ে পড়েছে, তখনও নিমাইয়ের মুখ থেকে গান খসে পড়ে নি। তাকে দেখা গেছে খাবার তাঁবুতে, নয়তো শেরপাদের ডেরায়, তুষার-গাঁইতিটাকে ব্যাঞ্জোর মত করে বগলে চেপে ধরে অন্যান্য সহযাত্রীদের সঙ্গে কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচের হুল্লোড়ে মেতেছে। মুখে তার কখনও শিস্, কখনও গানের কলি......"লে লো সুরমা লে লো, লে লো সুরমা... ডারা ডারা ডারা...ডিরি ডিরি ডিরি..." এমনি গান মুখে করেই নিমাই তারপর একদিন পিণ্ডারি হিমবাহে বেড়াতে গেছে। এমনি গান গাইতে গাইতেই সে ফিরে এসেছে। মাউণ্টেনীয়ারিং নিমাইয়ের কাছে যেন চেঞ্জে যাওয়া। তার বেশী কিছু নয়।

নিমাই যে ব্যাচে মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছে, সেই ব্যাচেই ছিল বিশ্বদেব, দিলীপ। আর ছিল ভট্চায্ বলে একটি ছেলে। হ্যাঁ, আর-একটা ছেলেও ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ। মদন। মদন মণ্ডল।

এই বিশ্বদেবই হঠাৎ একদিন তার আফিসে, মধ্যশিক্ষা-বোর্ডের দপ্তরে এসে হাজির হল। নিমাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আবার কোনও প্ল্যানের জন্ম হয়েছে নির্ঘাত। নইলে বিশ্বদেবের আগমন হবে কেন? এই কয় বছরে প্ল্যান কম করে নি বিশ্বদেব। এখানে যাব, সেখানে যাব। এ-পাহাড়ে চড়ব, ও-পাহাড়ের চূড়ায় উঠব। ওর মাথায় কোন প্ল্যান গজালেই ও ছুটে ছুটে নিমাইয়ের কাছে আসে। এই দিন বিশ্বদেব তাকে জানাল সুকুমার আর ধ্রুবর কথা। হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট গঠনের প্রস্তাবের কথা। এ-ও সে জানাল, এবার, এদের সহযোগিতা মিললে পর্বত অভিযান একটা সংগঠন করা যেতে পারে। সু-ই। নিমাই শিস্ দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিল সেদিন।

তারপর নিমাই ধীরে ধীরে ভিড়ে গেল দলে। দিনের পর দিন ওদের বৈঠকে যোগ দিল। সে জানত, শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না। শুধু আলোচনাই সার। প্রথমাবধি সে অনাগ্রহের এক আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখেছিল। সে ছিল শ্রোতা। সে আসত, যেত, চুপচাপ বসে ওদের লেকচার শুনত, চা খেত, সুর ভাঁজত।

ধীরে ধীরে, তার আপাত-উদাসীন চোখের উপর দিয়ে, সে দেখল, এতদিন পরে সত্যিই একটা অভিযানের ইচ্ছার জন্ম নিয়েছে। এটাকে আর অলীক বলে ভাবতে পারছে না, বাজে বলে উড়িয়ে দিতেও না। নিমাই দেখল নন্দাঘুণ্টি কেমন চুপিসারে, একটু একটু করে তার চেতনাতেও প্রবেশ করেছে। এ যেন অবিকল আরব্য রজনীর সেই দৈত্যের গল্প। বোতলের ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া বের হতে

লাগল। তারপর সেই অগোছাল ধোঁয়া ধীরে ধীরে আকার নিতে নিতে অবশেষে এক বিশাল দৈত্যে পরিণত হয়ে গেল। নিমাইয়ের কাছে নন্দাঘুণ্টির আবির্ভাবও হয়েছে ঠিক যেন এমনিভাবে। এখন এই নন্দাঘুণ্টি এক দৈত্যের মতই তার ঘাড়ে চেপে বসেছে।

নিমাইয়ের বাবা নাম-করা মানচিত্র-প্রস্তুতকারক। খুব সুন্দর ম্যাপ আর চার্ট বানাতে পারেন তিনি। নিমাইয়ের দাদাও তাই। এ বিষয়ে নিমাইয়েরও একটা সহজাত দক্ষতা আছে। তাই ধ্রুব যখন একটার পর একটা নন্দাঘুণ্টি অভিযানের পূর্ব ইতিহাস পড়ে গেল, পথঘাটের বিবরণ শুনতে লাগল নিমাই, তখন শুনেই সে কিন্তু ক্ষান্ত হল না। বাড়ি গিয়ে মানচিত্র ঘাটতে শুরু করল।

গুড্‌ফেলো ১৯৪৪ সনে কোন্ পথে অভিযান চালিয়েছিলেন, কোন্ পথে ১৯৪৫ সনে উড্, কোথা থেকেই বা তাঁকে ফিরতে হয়েছিল, ১৯৪৭ সনে রথের রুট্‌টাই বা কী ছিল, সব বার করল নিমাই। সুর ভাঁজতেও কামাই দিল না সে।

তারপর ধ্রুব সকলের বিবরণ শেষ করে যখন বলল, "আমি তো মনে করি, আমাদের সামনে রুট্ আছে দুটো," তখন নিমাই আর আগের মত উদাসীন থাকতে পারল না। এবারে আলোচনা তাদের বাড়ির আঙিনা দিয়ে যেতে শুরু করেছে। নিমাই নড়ে-চড়ে বসল।

ধ্রুব বলল, "একটা পুরনো রুট্। নন্দাঘুণ্টির দক্ষিণ থেকে। যে পথে এর আগের অভিযানগুলো গিয়েছে, সেই রুট্। আর-একটা রুট্ একেবারে নতুন। এখনও পর্যন্ত কেউ যায় নি। উড্ সাহেব যে পথে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। ও-রুট্‌টা নন্দাঘুণ্টির উত্তর থেকে।"

ধ্রুব একটু থামল। তারপর বলল, "উড্ বলেছেন, কুয়ারি গিরিপথ ডিঙিয়ে তপোবন। তারপর তপোবন থেকে ধৌলির ধারা ধরে ধরে ঋষিগঙ্গা, তারপর ঋষি-গঙ্গার ধারা ধরে রণ্টি নদী। এই রণ্টি নদী ধরে এগিয়ে গেলেই রণ্টি হিমবাহে পৌঁছনো যাবে। আমি তো মনে করি, আমাদের এই পথেই ট্রাই নেওয়া উচিত।"

বিশ্বদেব বলল, "তা হলে, একটা নতুন রুটে যাবার ক্রেডিট্ আমাদের থাকবে।"

এবারে নিমাই এগিয়ে এল। সকলের মুখের দিকে ওর সদা-পরিহাস-দীপ্ত মুখখানা একবার বুলিয়ে নিল। তারপর দক্ষ ভৌগোলিকের সতর্কতা নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

"সেই তপোবনেই যদি যেতে হয়, তবে আর কুয়ারি গিরিপথ পার হয়ে কেন? ও-পথে বুগিয়ালকোটি পাহাড়ের যে শাখা-প্রশাখা আছে সেগুলো পার হতেই তো দম বেরিয়ে যাবে। আমি ম্যাপ দেখেছি। ওদিকের কনটুয়র লাইন বড় বিশ্রী। তপোবন যাবার সব থেকে সহজ পথ হচ্ছে যোশীমঠ দিয়ে যাওয়া।"

সুকুমার আর ধ্রুব একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরাও এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম।"

এ পথ ওদের দুজনেরই চেনা। দুজনেই বদ্রীনারায়ণ-ফেরত।

সুকুমার বলল, "এখন এ পথে পিপুলকোটি পর্যন্ত বাস যাচ্ছে, শুনেছি। কাজেই পথের কষ্ট অনেক কমে যাবে।"

"তা যাবে।" ধ্রুব বলল, "পিপুলকোটি থেকে যোশীমঠ হাঁটাপথে দু দিন আর যোশীমঠ থেকে তপোবন এক দিন।"

"তপোবন কি বদ্রীনাথের পথেই?" বিশ্বদেব জিজ্ঞাসা করল।

সুকুমার বলল, "না। বদ্রীনাথ যেতে গেলে যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ হয়ে যেতে হয়। এই রাস্তাটাই মানা গিরিপথ হয়ে তিব্বতে ঢুকে পড়েছে। তপোবন

অন্যাদিকে।"

"যে রাস্তা নীতি গিরিপথ ডিঙিয়ে তিব্বতে ঢুকেছে, তপোবন সেই রাস্তারই ওপরে।" বাকীটা নিমাই জুড়ে দিল।

ধ্রুব বলল, "তা হলে দেখ্ না, এই তো হচ্ছে হিসেব। কলকাতা টু হরিদ্বার দু দিন, ট্রেনে। হরিদ্বার টু পিপুলকোটি ?"

"বাসে বড়জোর তিন দিন।"

"বেশ, তিন দিন। তিন আর দুইয়ে পাঁচ। আর পিপুলকোটি টু তপোবন তিন দিন। তাহলে হল আট দিন। কেমন কি না ? তারপর শুরু হবে আসল যাত্রা।"

ধ্রুব থামতে-না-থামতেই বিশ্বদেব একটু নাটুকে গলায় বলে উঠল, "মহাপ্রস্থানের পথে ?"

"প্রস্থান কি অবস্থান কি পাকিস্তান, তা জানি নে রে বাপু।"

ধ্রুবর কথার ধরনে সবাই একচোট হেসে নিল।

নিমাই বলল, "দেখ্ ধ্রুব, আমাদের জাম্পিং গ্রাউণ্ড, আমার মনে হয়, তপোবন নয়। আরও উপরে। আমাদের বাড়িতে যে ম্যাপটা আছে, সেটা বড় ছোট, এক ইঞ্চিতে দুই মাইল। তাতেই আমি দেখেছি, তপোবন ছেড়ে আরও খানিকটা উপরে উঠলে ধৌলী আর ঋষিগঙ্গার সঙ্গম পাওয়া যাবে। আসল যাত্রা শুরু হবে এই সঙ্গম থেকেই।"

ধ্রুব বলল, "আমি তোমার সঙ্গে একমত। উড্ সাহেবও এই জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন।"

"কিন্তু ওখানে গ্রাম-ট্রাম আছে কি ?"

নিমাই বলল, "থাকাই তো সম্ভব। ম্যাপে তো দেখছি, জায়গাটা নীতি গিরিপথ যাবার রাস্তার ওপরে। এই রাস্তা খুব ইম্পরট্যাণ্ট রাস্তা। ট্রাডিশনাল বিজিনেস রুট্। আবহমান কাল ধরে এই পথ দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেন-দেন চলছে। কাজেই, বহুলোকের চলাচল আছে এই পথে। সেইজন্যেই আমার মনে হচ্ছে, এখানে গ্রাম থাকা সম্ভব।"

"আছে, আছে।" ধ্রুব বলল, "উড্ সাহেবের বিবরণে স্পষ্ট করে বলাই আছে, ধৌলী আর ঋষিগঙ্গার সঙ্গমে একটা গ্রাম আছে। তিনি কি আর না-জেনে বলেছেন ? আর ম্যাপ ছাড়া জানবেনই বা কী করে ?"

"ওই ম্যাপ একখানা চাই, বুঝলে ধ্রুব। তা হলেই আমি এই অঞ্চলটার খুঁটিনাটি এ'কে ফেলতে পারব।" একটু থেমে নিমাই জিজ্ঞাসা করল, "ওই রকম একখানা ম্যাপ যোগাড় করতে পার ?"

॥ দশ ॥

অবশেষে ম্যাপ একখানা পাওয়া গেল। উমাপ্রসাদবাবুর সংগ্রহ থেকে। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপ থেকে সুইসরা এই ম্যাপখানা তৈরি করেছিলেন। গাড়োয়াল হিমালয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় এই ম্যাপখানায় পাওয়া যাবে। সাত-আট দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে নিমাই ওই ম্যাপ থেকে ওদের প্রয়োজনীয় রুটটা এ'কে ফেলল। শুধু তাই-ই নয়, ওর বাবার ফার্মের সাহায্যে মূল মানচিত্রখানার দরকারী অংশটুকুর ফটোস্ট্যাট কপিও করে রেখে দিল নিমাই।

মানচিত্রের হিজিবিজি আঁচড়গুলো সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। এক প্রহেলিকা।

কিন্তু নিমাই এ-ভাষা কিছুটা জানে। মানচিত্রের অস্ফুট ভাষার অর্থোদ্ধারে সে মন দিল। রাতের পর রাত সে পার করে দিল তাদের ভাবী অভিযানের পথের হদিস বার করার জন্যে।

রাত গভীর হয়ে এসেছে। কলকাতা নিস্তব্ধ। ছোট ঘরখানায় নিমাই তখনও জেগে। বিজলী বাতির নিচে মানচিত্র খুলে হিসেব কষছে নিমাই। কনট্যুর লাইনের জটিলতা কোথায় বেশী, কোথায় কম। পাহাড়ী নদী কোথায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে, কোথায় নয়। পাহাড়ের খাড়াই কোথায় ভয়াবহ, অগম্য, কোন্‌খানে গমন সাধ্য। হিসেব কষে কষে নিমাই নোট নিতে থাকে। এক সময় বুক-পিঠ টনটন করে ওঠে। চোখ করকর করে। কনট্যুর লাইনগুলো এলোমেলো হয়ে উঠতে থাকে। নিমাই চোখ দুটো ডলে। সিগারেট ধরায়। চোখ বুজে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নেয়। মৃদু শিসে সুর ভাঁজতে থাকে..."লে লো সুরমা লে লো......"

এই তো ধৌলি। নিমাই আবার মানচিত্রের উপর চোখ রাখে। ......"ডারা রারা রা রা"... ধৌলিগঙ্গা। যোশীমঠের দুই মাইল দূরে বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে ধৌলি। যোশীমঠ থেকেই ধৌলি ধরে যেতে হবে। ..."ডিরি ডিরি রি রি..." এ-পথ একেবারে সরল। বাঁধা সড়কে যাওয়া। ধৌলি উপত্যকাতেই তপোবন। তপোবন থেকে ধৌলি আর ঋষিগঙ্গার সঙ্গমের দূরত্ব নিমাইয়ের হিসেবে হচ্ছে চার মাইল। যোশীমঠ থেকে তপোবন মাইল নয়েক। নয় আর চার তেরো।..."রি রি রি রি রা রা" পথের যা অবস্থা, তাতে ঘণ্টা পাঁচ-ছয়েতেই যোশীমঠ থেকে ধৌলি-ঋষির সঙ্গমে পেঁৗছে যাওয়া যাবে।..."লে লো সুরমা লে লো..." ইজি ইজি। নিমাই উচ্চগ্রামে শিস চড়াল। হ্যাঁ, ওখানে গ্রাম আছে একটা। নিমাই মানচিত্রের অস্পষ্ট অক্ষরের উপর ঝুঁকে পড়ল। রিনি। গ্রামের নাম রিনি। নোটবুকে টুকে রাখল। বেশ মিষ্টি নাম। রিনি।..."রিনি রিনি রি নি ই ...চিনি চিনি চি নি ই... ডারা রা রা রি রিই" রিনি ছ হাজার ফুটের বেশী উঁচু হবে না। নিমাইয়ের হিসেব বলল। এ-উচ্চতা কিছুই না। তেরো মাইলে বড় জোড় দেড় হাজার ফুট উঠতে হবে। কিছু না।

রিনি থেকে ধৌলিকে বিদায় দিতে হবে। ধরতে হবে ঋষির ধারা। ঋষিগঙ্গা বেগ দিতে পারেন। কতটা বেগ দেবেন? সাহেব অভিযাত্রীদের যতটা বেগ দিয়েছেন, ততটা?

ঋষিগঙ্গার নদীখাত কুড়ি মাইল লম্বা। উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন—এই তিন ভাগে বিভক্ত। নিমাই যেন ভূগোলের পড়া তৈরি করছে। আর নিম্ন ভাগটিই যত নষ্টের গোড়া। এই অংশ দিয়েই তাদের কিছুটা পথ যেতে হবে।

> . . . . The lowest of these is so formidable that no one has yet succeeded in forcing a way through.

শিপটন সাহেব লিখে রেখে গেছেন।

১৮৮৩ সনে গ্রাহাম সাহেব এসেছিলেন ঋষির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে। তিনি আর পথ-প্রদর্শকেরা প্রাণপণ চেষ্টায় কোনমতে মাইল চারেক এগিয়েছিলেন। বাস্, আর না। তারপর ঋষিগঙ্গার কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার করে তাঁদের পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯০৭ সনে এসেছিলেন তিন জন বাঘা পর্বতারোহী —লঙস্টাফ, ব্রুস্ আর মাম। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন অভিজ্ঞ আল্পাইন গাইড। ফল হয়েছিল একই। ঋষির প্রবল পরাক্রমে তাঁদেরও পিছু হঠতে হয়েছিল।

এই ঋষির মহড়া এবার আমাদের নিতে হবে। নিমাই নিজেকেই শোনাল। ..."লে লো সুরমা লে লো..." তবে ভরসা এই, ঋষির ধারা অনুসরণ করে বেশীদূর

বোধহয় তাদের যেতে হবে না। আর এ-ধারের কনট্যুর রেখা যা বলছে, তাতে মনে হয়, বিকল্প রুট্ খুঁজে বের করাতেও খুব বেশী অসুবিধে একটা হবে না। ঋষি আর রণ্টি নদীর সঙ্গম পর্যন্ত পেঁাছাতে পারলে, আর ঋষির সঙ্গে সম্পর্ক কী? শুধু ঋষির সঙ্গেই বা বলি কেন, তখন পৃথিবীর কারোর সঙ্গেই কি সম্পর্ক থাকবে আমাদের? নিমাইয়ের মুখে সরু একফালি হাসি ফুটে উঠল।

তখন যে অঞ্চলে পেঁাছবে তারা, তার বিবরণ আজ পর্যন্ত কোন ভূগোলে স্থান পায় নি। কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। কেউ, কোন শিক্ষিত লোক, এ অঞ্চল পাড়ি দিয়েছে কোনদিন, এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে বলে নিমাই জানে না।

অজানা বলেই নিমাইয়ের আগ্রহ এত বেড়েছে। ধীরে ধীরে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে মনে। চেঞ্জে যদি যেতেই হয়, তবে এর চাইতে ভাল জায়গা আর কোথায় পাবে?

ধ্রুব বা সুকুমারের মত নিমাইয়ের মন সর্বদা পাহাড় পাহাড় করে না। বিশ্বদেবের মত অভিযান অভিযান করে নেচে বেড়ানো নিমাইয়ের কাছে হাস্যকর এক পাগলামি। ওদের ভাব-সাব দেখলে, কথাবার্তা শুনলে, নিমাইয়ের মনে হয়, কলকাতা যেন সর্বদা ওদের চিমটি কাটছে।

না বাবা, কলকাতার উপর কোন বিরক্তি নেই নিমাইয়ের। সভ্যতার যা কিছু প্রকাশ সে দেখেছে, তা এইখানেই। শিক্ষা দীক্ষা যা কিছু পেয়েছে, এইখানেই। আরামের আস্বাদ সব পেয়েছে এইখানেই। কলকাতাকে তাই তার ভাল লাগে। ট্রাম-বাসের ভিড়ে সে কষ্ট পায় না। হিন্দী সিনেমা দেখে সে নাক সিঁটকোয় না। ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, থিয়েটার, কোন কিছুতেই তার অরুচি নেই।

তবে তুমি পাহাড়ে যাবার জন্য এত মেতে উঠলে কেন? বাঃ, চেঞ্জে কি লোকে যায় না!

চেঞ্জে যাবার জন্য কেউ বুঝি ম্যাপ সামনে করে রাত পুইয়ে দেয়? বাঃ, যাচ্ছি যেখানে সেখানকার পথঘাটের হদিশ ভাল করে জেনে নিতে হবে না! লোকে তো সিনেমা দেখতে যাবার আগেও বিজ্ঞাপনগুলো ভাল করে পড়ে নেয়। নেয় না? উত্তরপাড়া যেতে গেলেও তো টাইমটেবল দেখে। দেখে না?

তা দেখে। তবে তার জন্য রাত কাবার করে কি কেউ? রাত শেষ হয়ে এল না কি! যা! কাল যে আবার আফিস আছে। নিমাই মানচিত্রখানা বন্ধ করল। নোট বইটা যত্ন করে তুলে রাখল। তারপর বিছানায় গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

কলকাতা যে কত ভাল, সেটা বোঝার জন্যই আমি পাহাড়ে যাই। পাহাড় থেকে ফিরে এলে যে কলকাতা নতুন করে ধরা দেয়।

॥ এগার ॥

"প্রিয় রায়",

সুকুমার দেখল তারই চিঠি। এসেছে ভারত সরকারের বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে। লিখেছেন স্বয়ং মন্ত্রী, শ্রীহুমায়ুন কবীর। তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯৬০।

সরকারী চিঠি। সুকুমার খুলল। কী আর থাকবে প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া? আর বড় জোর "আপনার প্রস্তাবটি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।" এ ছাড়া সরকারী চিঠিতে আর-কিছু থাকে বলে সুকুমার জানে না।

সেই একই গৎ। দেশরক্ষা-বিভাগ থেকে যে চিঠি পেয়েছে সুকুমার তারও শুরু এই রকমই। আর শেষ "আপনার প্রস্তাবটি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।" পর পর তিনখানা চিঠি পেয়েছে সুকুমার দেশরক্ষা-বিভাগের কাছ থেকে। একই চিঠির তিনটে জবাব! বেসামরিক-দপ্তর যে সময়ের মধ্যে একটি জবাব পাঠাত, সেই সময়টুকুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ মেননের সামরিক-দপ্তর তিনবার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছে। লোকে যে বলে, মিলিটারি আদমির তৎপরতা বেশী, তা সুকুমার দেখল কথাটা মিথ্যে নয়। জবাব তিনটেই বটে, তবে বয়ান একই। "প্রস্তাবটি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।"

এতে আর তার বেশী কথা কী থাকবে? সুকুমার কবীরের চিঠিখানায় চোখ বুলাতে লাগল।

প্রিয় রায়,

> আপনি এবং আপনার সহকর্মীরা আমাদের তরুণদিগের মনে দুঃসাহসিক কাজ করিবার উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবার জন্য এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সংকল্প করিয়াছেন, এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ...

এ কী! এ তো শুকনো দায়সারা সরকারী উত্তর নয়! এতে যে অন্তরের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। সুকুমার রীতিমত অবাক হয়ে গেল। ওর মনে আশার একটা ক্ষীণ আলো বুঝি উঁকি মেরে উঠল। তবে কি...তবে কি...ওদের চেষ্টা ফলবতী হবে!

একটু আগেও এ আশা ছিল না সুকুমারের। সত্যি বলতে কী, আশা ওরা হারাতেই বসেছিল।

জুলাই মাসের প্রথম দুটো সপ্তাহে ওদের আর ফুরসত ছিল না। দিনের পর দিন বৈঠক বসেছে ওদের। প্ল্যান ছকেছে ওরা। রুট্ নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর কী, এবারে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। হ্যাঁ, তা হয়। তবে তার আগে সামান্য কিছু কাজ বাকী আছে। সেগুলোর ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত নেহাত বের হওয়া যায় না, তাই ওরা যেতে পারছে না।

কী এমন কাজ, যা বাকী আছে?

এই কিছু টাকার যোগাড় করা, কিছু সাজ-সরঞ্জাম আর জনকয়েক শেরপাও সংগ্রহ করা।

ধ্রুব বলে, ঘোড়া হলে চাবুকের জন্য আটকাবে না। টাকা পেলে সাজ-সরঞ্জামও হবে, শেরপাও। পয়লা হচ্ছে টাকা।

কত টাকা? কত টাকা চাই ওদের?

এ প্রশ্ন যখন উঠেছে, তার উত্তর ওরা কেউ দিতে পারে নি। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি। পর্বত আরোহণে টাকা লাগে, এটা ওরা জানে। কিন্তু কত টাকা লাগে, তা জানে না। কেউই না।

—বল না, ধ্রুব বলেছে, পর্বত আরোহণ করতে গেলে কী কী সরঞ্জাম লাগে। তারপর সেই 'বেসিসে' হিসেব করলেই তো বেরিয়ে আসবে অংকটা। তোমরা তো ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক, বল না তোমরা।

—ক্লাইম্বিং ট্রাউজার, ক্লাইম্বিং শার্ট। বিশ্বদেব বলল।

—ফেদার ট্রাউজার, ফেদার কোট, উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার, উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট, ফুল মোজা, হাফ মোজা, মাউণ্টেনীয়ারিং বুট, জাঙ্গল বুট, সু-কভার, ক্র্যাম্পন, উলেন গ্লাভ্‌স্, লেদার গ্লাভ্‌স্, ক্লাইম্বিং উলেন সোয়েটার। নিমাই চটপট আউড়ে গেল।

—আর বালাক্লাভা? মাথা ঢাকবে কী দিয়ে?

—আর স্নো গগ্‌ল্‌স্‌? চোখ বাঁচাবে কী দিয়ে?

—বাঃ! আসল জিনিসই যে বাদ! আর আইস্‌-অ্যাক্‌স্‌?

ও হরি, এ যে দেখি বিসমিল্লায় গলদ। আইস্‌-অ্যাক্‌স্‌ ছাড়া পর্বতারোহণ, এ যে রাম বিনে রামায়ণ।

হাসে ওরা।

আর এ তো গেল শুধু পরার পোশাক। এ ছাড়া যেমন পর্বতারোহণ হয় না, শুধুমাত্র এই পোশাক পরেই পর্বতে চড়া যায় না। আরও বহু সরঞ্জাম আছে। খাওয়া, থাকা, পাথরে ওঠা, বরফে ওঠা—নানা কাজের জন্য নানা সরঞ্জাম। ধীরে ধীরে ওরা মোটামুটি একটা তালিকা করে ফেলল। তার মধ্যে এমন বহু জিনিস আছে, যার নাম জানে ওরা, দাম জানে না। কোথায় পাওয়া যায়, কলকাতায় না কলম্বোতে, কালীঘাটে না কালিফোর্নিয়ায়, তাও জানে না।

—ভাবিস নে সুকুমার, ধ্রুব বলে, আর কোথাও যদি এসব জিনিস নাও পাওয়া যায়, তবু হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

—আমার মনে হয়, তেনজিং কি জ্ঞান সিং যখন শুনবেন, আমরা একটা অভিযানে বের হচ্ছি, তখন খুশীই হবেন হয়তো। সুকুমার বলেছিল।

উৎসাহভরে সমর্থন করেছিল নিমাই। বিশ্বদেবও।

—নিশ্চয়ই খুশী হবেন ওঁরা। আমরা তো ওঁদেরই ছাত্র। মন্ত্রশিষ্য। দেখ্‌ না, চিঠি তো ছেড়েছিস্‌ কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌ এল বলে।

—আমার মনে হয়, ইকুইপ্‌মেণ্ট্‌ যা কিছু ইন্‌স্টিটিউট্‌ থেকেই পাওয়া যাবে। কিনতে আর হবে না। কেমন কি না?

নিমাই বলল, ভাড়া দিতে হবে তার জন্য।

—সে আর কত? খুবই কম।

ধ্রুব বলল, কত হতে পারে আন্দাজ? ছয় জনের সাজ-সরঞ্জামের ভাড়া কতই আর হবে? দু-তিন হাজার টাকাই হোক।

—দু-তিন হা-জা-র! অত লাগবে!

—এটা কি একটা বেশী টাকা হল! আমার তো মনে হয় ধ্রুব, অন্ততপক্ষে পাঁচ হাজার টাকার কমে হবে না।

—বেশ, না হয়, পাঁচ হাজার টাকাই লাগল। বড় খরচ তো এইটাই। আর তো বাকী থাকল এই কজনের খাওয়া, শেরপা আর পোর্টারদের মজুরি আর যাতায়াত খরচ। তা এতে আর কত পড়বে?

ধ্রুব একটু থামল। চোখ বুজে হিসেব কষে নিল।

বলল, ধর, আরও পাঁচ-ছয় হাজার। আমার মনে হয়, বারো হাজার টাকা পেলেই আমরা এই অভিযান সাকসেস্‌ফুল করে তুলতে পারি।

এই ছিল তাদের এস্টিমেট। সুকুমার কবীরের চিঠিখানায় চোখ রেখে ভাবল। মাত্র বারো হাজার টাকা। কিন্তু তাও তারা যোগাড় করতে পারে নি। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েছে। পেয়েছে শুধু প্রত্যাখ্যান। উপেক্ষা।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা পেড়েছে ওরা।

—কিছু টাকা যোগাড় করে দিবি? আমরা একটা এক্‌স্‌পিডিশন করব।

—এক্‌স্‌পিডিশন কর্‌বি! কেন? ভূতে কিলোচ্ছে নাকি! কোথায় যাবি?

—নন্দাঘুণ্টি।

—সে আবার কী?

—হিমালয়ের একটা পাহাড়।

—দূর দূর, যত শ্লা—বোগাসিটি। তার চাইতে রাঁচী যা না। চাঁদা করে কিছু টাকা তুলে দিচ্ছি।

—রাঁচী! রাঁচী যাব কেন?

—মাথাটা অয়েলিং করাতে। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

পাড়ার চাঁইদের কাছে গিয়েছে ওরা। প্রস্তাবটি শোনামাত্র চাঁইরা লাফিয়ে উঠেছেন।

—কী বললে! পাহাড়ে যাবে? কেন, যাবার জায়গার কী অভাব পড়েছে? অতই যদি শুলুনি, তা হলে যাও না, আসাম যাও না। সেদিকে নেই। দেখ হে, ও-সব বাজে কাজ ছাড়। কায়িক পরিশ্রম কর। ইট বানাও, খোয়া ভাঙো, মাটি কাটো, মোট বও। তবে যদি দেশের কিছু হয়। দেখছ না, বাইরের লোক এসে কায়িক পরিশ্রম করে বাংলার টাকা বাইরে মনি অর্ডার করে দিচ্ছে। আর তোমাদের কিনা, সেই সময় পাহাড়ে চড়ার শখ চাগাল! অদ্ভুত বাবা!

আরও উপদেশ কয়েক জায়গা থেকে পাওয়া গেল। শোনা গেল নানা মন্তব্য। তার একটা সুকুমারের মনে পড়ল।

—নন্দঘুটিং? সেটা কী বস্তু?

—আজ্ঞে, নন্দ নয়, নন্দা। ঘুটিং নয়, ঘুণ্টি। কথাটা নন্দাঘুণ্টি। ওটা একটা পাহাড়।

—ও, তা বেশ। আইডিয়াটা নতুন। মন্দ নয়। বাঙালীর ছেলেরা পাহাড় চড়তে চাইছে। আজকাল তো এ রেওয়াজ উঠেই গেছে। সেই কবে বাঙালীর ছেলে রাধানাথ শিকদার, অ্যাঁ, কী বলে, সেই এভারেস্টের মাথায় উঠেছিলেন, অ্যাঁ, আর তারপর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উঠেছিলেন হিমালয়ের পালামৌ শৃঙ্গে, সে কি আজকের কথা! এঁরা যখন এসব কাজ হাসিল করেছিলেন তখন পাহাড় কি তা বোধহয় বিশ্বের কেউ জানতই না। বাঙালীরাই পথ দেখিয়েছে। তা বেশ বেশ। তোমাদেরও এদিকে মন আছে দেখে বড় আনন্দ হল।

ভদ্রলোকের ইতিহাস এবং ভূগোলশাস্ত্রে একইরকম দখল দেখে ওরা চমৎকৃত হল। একই নিশ্বাসে রাধানাথ শিকদারকে এভারেস্টে এবং পালামৌকে হিমালয়ে তুলে দেওয়া যেমন-তেমন কাজ নয়।

—তা, আমার কাছে কেন এসেছ? আমি কী করতে পারি বল?

সাহসে ভর করে ওরা বলল, আজ্ঞে, কিছু টাকার জন্য।

—টাকা!

ভদ্রলোকের চোখ দুটো প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় সেই যে কপালে গিয়ে উঠল আর বুঝি নামে না। খানিকক্ষণ শিবনেত্র হয়ে থাকার পর ভদ্রলোক গভীর বিষাদে এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—টা—কা! বাঙালীর ঘরে কি আর টাকা আছে! সব টাকা এখন গিয়ে জমেছে হয় মাড়োয়ারীর সিন্দুকে, আর নয় সরকারের তোষাখানায়। সেই সব জায়গায় যাও। তোমরা ইয়ংম্যান, অ্যাঁ, ওদের ট্যাঁক থেকে টাকা খসাও। আমরা তোমাদের বাণী দেব। শুভেচ্ছা জানাব। অ্যাঁ।

ঘুরে ঘুরে ওরা ক্লান্ত। অকূলে ভাসছে। কোথায় যাবে, কার কাছে টাকা চাইবে? একজন পরামর্শ দিলেন এক প্রতিপত্তিশালী লোকের কাছে যেতে। বাঙালী-দরদী। খবরের কাগজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গেল ওরা।

—কী চাই?

—কিছু টাকা।

—কেন?

—বাঙালীর ছেলেরা একটা মাউণ্টেনীয়ারিং এক্স্‌পিডিশনে যাবে...

মুখের কথা শেষ হল না ওদের। ভদ্রলোক যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

—এক্স্‌পিডিশন! লাখ টাকার ব্যাপার। নাউ প্লিজ্‌।—

—আজ্ঞে?

—আই সে, আসুন আপনারা।

ওরা উঠে পড়ল। ভদ্রলোক হয়তো ভাবলেন, চাবুকটা একটু কড়া হয়ে গেছে। একটু মলম লাগানো দরকার।

বললেন, ওহে শোন, আমাদের অত টাকা নেই। তবে দু-একজনের কাছে চিঠি দিতে পারি। দেখ, যদি তাঁরা দেন। পরে একদিন এস।

না, সুকুমার অন্তত আলোর নিশানা কোনদিক থেকে দেখতে পায় নি। ধীরে ধীরে হতাশা এসে ঘিরে ধরছিল তাকে। এমন সময় কবীরের এই চিঠি। যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

সুকুমার পড়তে লাগল...

> এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সংকল্প করিয়াছেন, এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

সেপ্টেম্বর মাসে নন্দাঘুণ্টি অভিযান! সুকুমার ম্লান হাসল। এ ধ্রুবর কীর্তি। মাস পর্যন্ত ঘোষণা করে বসে আছে।

সুকুমার আবার পড়তে শুরু করল...

> অভিযাত্রী সদস্যরা সকলেই যে দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। আমি অবশ্যই আপনাদিগকে সাহায্য করিব...

সুকুমার কথাটা আবার পড়ল।

"...আমি অবশ্যই আপনাদিগকে সাহায্য করিব..."

আর পড়তে পারল না সুকুমার। ওর শুধু একটাই কথা তখন মনে পড়ছিল, ধ্রুব—ধ্রুবকে পড়াতে হবে, চিঠিখানা। চিঠিখানা কোনক্রমে মুড়ে সুকুমার প্রায় ছুটতে ছুটতেই হাজির হল ধ্রুবর কর্মস্থলে। এক পাঞ্জাবী মালিকের মোটর পার্টসের দোকানে বসে খাতা লিখতে লিখতে ধ্রুব তখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে। কড়িকাঠে উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে ধ্রুব।

॥ বারো ॥

হুমায়ুন কবীরের আশ্বাস আন্তরিক। সে বিষয়ে কারোর দ্বিমত নেই। কিন্তু সে আশ্বাস টাকায় রূপান্তরিত হয়ে ওদের হাতে কবে পৌঁছবে, মতবিরোধ দেখা দিল তাই নিয়ে। ইতিমধ্যে কবীর সাহেবের কাছ থেকে আর-একখানা চিঠি এসেছে। হিমালয়ান ইনস্টিটিউটের বিস্তারিত বিবরণ জানতে চেয়েছেন। কে কে আছেন এর মধ্যে, সে কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কে প্রেসিডেণ্ট? কে সেক্রেটারি? তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সরকারী যন্ত্র নড়ছে। নড়ছে খুব ধীরে। এত ধীরে যে ভরসা ক্ষীণ হয়ে আসে।

নিমাই বলল, "টাকা পাওয়া যাবে সুকুমার। কবীর সাহেব যখন আগ্রহ দেখিয়েছেন, তখন টাকা পাওয়া যাবে।"

"তা তো বুঝলাম।" ধ্রুব বলল, "কিন্তু পাওয়া যাবে কবে?"

"খুব বেশী দেরি হবে না।" নিমাই গম্ভীর হয়ে জবাব দিল। "এই এক্স্‌-পিডিশন থেকে ঘুরে এসে যদি নাও পাই, তার পরের এক্স্‌পিডিশনে যাবার আগেই টাকাটা এসে যাবে। এ বিষয়ে গারান্টি দিতে পারি।"

"দেখ্‌ নিমাই" ধ্রুব চটে গেল, "সব সময় চ্যাংড়ামি ভাল লাগে না।"

"ঠিক বলেছ ধ্রুব, সেটা আমারও ভাল লাগে না।" নিমাই ধ্রুবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করল। "আমি বলি কী, চ্যাংড়ামি করার একটা টাইম তোমরা বেঁধে দাও। সেই পিরিয়ডেই তা হলে চ্যাংড়ামিটা সেরে নেব।"

ধ্রুব হেসে ফেলল। "ইম্‌পসিব্‌ল্‌।"

নিমাইয়ের কথাটা কিন্তু ওরা উড়িয়ে দিতে পারল না। জুলাই শেষ হতে চলল। সেপ্টেম্বর মাসে ওদের যাত্রা করার কথা। তৈরী হবার সময় এমনিতেই হাতে বেশী নেই। গাড়োয়াল-হিমালয়ে অক্টোবরের পরে পা বাড়াতে অতি বড় দুঃসাহসীও সাহস করেন না। নভেম্বর মাসে বরফ পড়তে শুরু করবে। রাত বড় হবে, দিন ছোট। বাতাসের জোর বাড়বে। রোদের তেজ কমবে। তাপমাত্রা হু-হু করে কমে যাবে। ওদের মনে পড়ল কেনেথ ম্যাসনের সাবধান-বাণী।—

> . . . for the high altitude climber, particularly in the north-west, there are two serious drawbacks. As the monsoon currents lessen in strength the high westerly winds re-established. By November they again reach gale force and are much colder than in May. Also the days are shortening and the sun has little power to warm.

অক্টোবরের মধ্যে যদি ওরা নন্দাঘুণ্টি অভিযান শেষ করে ফিরতে না পারে, তবে এবারের মত অভিযান শিকেয় তুলে রাখতে হবে। অক্টোবরে অভিযান শেষ করা মানে কী? সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যাত্রা করা। তার মানে আগস্ট মাসের মধ্যেই প্রস্তুতির কাজ সেরে ফেলা। তার মানে—

"অন্তত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই টাকা যোগাড় করতে হবে।" ধ্রুব বলে উঠল।

"তা হলে সরকারী ভরসা ছাড়।" নিমাই বলল।

"তা হলে, কার ভরসা করব?" বিশ্বদেবের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল। "কে আমাদের টাকা দেবে?"

ওদের কেউই এ প্রশ্নের উত্তর জানে না। তবে এটা ওরা জানে এক সপ্তাহের মধ্যে সরকারী টাকার আশা করা নিতান্তই বাতুলতা। কবীরের আশ্বাসবাণীতে যেটাকে ওরা আলো বলে ভেবেছিল, এখন তাকে ওদের মনে হল মরীচিকা।

এই সময় ওদের বার বার মনে পড়ল আর-একজনের কথা। শেওড়াফুলির মিসেস ঘোষের কথা। প্রবোধ সান্যাল ওদের পাঠিয়েছিলেন সেখানে। মিসেস ঘোষ ওদের সাহস দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর যা সাধ্য করবেন।

সুকুমার বলল, "চল না, মিসেস ঘোষের কাছে যাই আবার।"

ধ্রুব বলল, "অগত্যা।"

বিশ্বদেব বলল, "রেলের স্ট্রাইক না মিটলে, যাই-ই বা কী করে?"

পরদিন সকালে কাগজ খুলতেই খবরটা নজরে পড়ল সুকুমারের। সার্‌ এড্‌মণ্ড্‌ হিলারি, এভারেস্ট-বিজয়ী হিলারি এসেছেন কলকাতায়। এবার এক নতুন ধরনের

বিচিত্র অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন তিনি। এভারেস্ট অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করবেন, ইয়েতি ধরবেন, মাকালুর চূড়ায় উঠবেন।

সুকুমার আর দেরি করল না। হিলারির সঙ্গে তার দেখা করা চাই। হয়তো কিছু সুবিধে হতে পারে। চাই কি সাজ-সরঞ্জাম কিছু পেয়েও যেতে পারে। কিংবা কিছু নাও যদি পায়, শুধু শুভেচ্ছাই যদি পায়, তা হলেও ওরা উৎসাহ পাবে।

খুঁজে খুঁজে সুকুমার হিলারির আস্তানা বের করল। গ্র্যান্ড হোটেল। ২০৬নং ঘর। রিসেপশন থেকে টেলিফোন করল সুকুমার।

—হ্যালো স্যর্ এড্মন্ড?

—হ্যাঁ।

—আমি সুকুমার রায়। একজন মাউণ্টেনীয়ার। একবার দেখা করতে চাই।

—বেশ, চলে আসুন আমার ঘরে।

সুকুমার দরজায় গিয়ে টোকা দিল। দরজা খুলে হিলারি বেরিয়ে এলেন। মুখে পরিচিত হাসি। সুকুমার মুহূর্তের জন্য একটু নার্ভাস হয়েছিল বুঝি। হাসি দেখে ধাতস্থ হল।

—"রয়? মাউণ্টেনীয়ার? হাউ ডু ই ডু।"

হিলারি হাত বাড়িয়ে দিলেন। লোকটা এত সহজ! অবাক হল সুকুমার। চকিতে তার মনে পড়ল তেনজিংয়ের কথা। স্যর্ না বললে চটে যান তেনজিং। সুকুমার সহজেই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

—"হাউ ডু ই ডু।"

—"ভিতরে আসুন।"

ঘরের ভিতরে কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। ছোট্ট টাইপরাইটারে কাগজ পরানো। বোধহয় চিঠি লিখছিলেন।

সুকুমার বলল, "আমরা এবার নন্দাঘুণ্টি যাব ঠিক করেছি।"

"খুব ভাল। খুব ভাল। আমি ওদিকে যাই নি।"

হিলারি উৎসাহ দিলেন।

বললেন, "দেখুন, কী দুঃখের কথা, এমন সময় এলেন, কথা বলি সে সময় নেই। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আজ তিনটের সময় আপনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কি? অনুগ্রহ করে তখন যদি একবার আসেন। আপনাদের ব্যাপারটা শুনতে বড় ইচ্ছে করছে। ভারতীয়দের মধ্যে ভাল ভাল মাউণ্টেনীয়ার আছে। এদেশে মাউণ্টে-নীয়ারিংয়ের চর্চা ভালভাবে হওয়া উচিত। তিনটের সময় আসবেন। তখন আমি ফ্রী।"

সুকুমার ধন্যবাদ জানিয়ে যখন রাস্তায় এল, তখন তার মনে হল, সে যেন হাওয়ায় উড়ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে ধ্রুবর দোকানে এল।

"ধ্রুব, হিলারি এসেছেন কলকাতায়। এই ওখান থেকে আসছি।"

"সত্যি! বললি নাকি আমাদের কথা?"

"হ্যাঁ। একটু ছুঁইয়ে এসেছি। এখন বড্ড ব্যস্ত। তিনটের সময় যেতে বলেছেন। সুন্দর লোক ভাই।"

"আসল মাউণ্টেনীয়ার।"

॥ তেরো ॥

প্রিয় রায়,

এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের ইনস্টিটিউট নন্দাঘুণ্টি অভিযানের পরিকল্পনা করিয়াছে, এ সংবাদে আনন্দিত হইলাম। হিমালয়ে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণরূপে অসামরিক একটি অভিযান আপনারা সংগঠন করিতে যাইতেছেন, আমার মনে হয়, আপনাদের এই উৎসাহ ও উদ্যমকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। আপনাদের এই দুঃসাহসিক কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আপনারা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, সে আশা আমার আছে। নন্দাঘুণ্টি দুঃসাধ্য পর্বত। আপনার দলের পক্ষে ইহা ভাল চ্যালেঞ্জ হইবে। আপনাদের উদ্যোগ-আয়োজন বাধামুক্ত হউক, আরোহণ সাফল্যমণ্ডিত হউক।

ভবদীয় সার্ এড্মণ্ড হিলারি। ২৫শে জুলাই, ১৯৬০।

শুধুমাত্র চিঠিতেই নয়, মুখের কথাতেও অনেক উৎসাহ দিলেন হিলারি। অনেক পরামর্শ। ধ্রুব আর সুকুমারকে নিয়ে সস্ত্রীক ছবিও তোলালেন। ওদের ইনস্টিটিউটের অনারারি মেম্বরও হলেন খুশী মনে। ওদের প্রস্তাবিত অভিযানের সাফল্য কামনা করে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বিদায় জানালেন।

এতদিন ধ্রুবই উৎসাহ দিয়ে এসেছে, এবার সুকুমার বলল, "এ অভিযান হবে ধ্রুব। আমার মন বলছে হবে।"

ধ্রুব জবাব দিল না। তার মাথায় শুধু হিলারির চিঠিখানা ঘুরপাক খাচ্ছে। কী করে চিঠিখানা কাজে লাগানো যায়, সেই মতলবই ভাঁজছে ধ্রুব। এই চিঠিখানা দিয়ে একটা পাব্লিসিটি দিতে হবে খবরের কাগজে। হিলারি নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সাফল্য কামনা করেছেন। তারপরই ওরা আবেদন করবে, প্রথম ভারতীয় অসামরিক এই পর্বত-অভিযানের সাফল্যকল্পে মুক্ত হস্তে দান করুন। এমনিতে হয়তো এই আবেদনে কোন ফল হত না, কেউ কর্ণপাত করত না। কিন্তু হিলারির নাম ব্যবহার করলে জিনিসটার গুরুত্ব দাঁড়াবে অসাধারণ। এমনও হতে পারে, ধ্রুব ভাবল, হিলারির পরামর্শমত ঢুকে পড়বে এক খবরের কাগজের অফিসে, দেখা করবে সম্পাদকের সঙ্গে, দেখাবে হিলারির চিঠিখানা, সাহায্য চাইবে। হিলারির চিঠি যেন সর্বসিদ্ধির কবচ। সব মুশকিলের আসান হয়ে যাবে। সেই রকম একখানা ভাব ওরা দেখাতে লাগল।

কিন্তু কোথায় যাবে? কোন্ কাগজে? ধ্রুবর মনে পড়ল ইংরাজী কাগজের কথা। অভিযানের খবর ছবি ওরা আগ্রহ করে ছাপে। সেখানে যাবার কথাই সর্বপ্রথম মনে পড়ল ধ্রুবর।

সুকুমারের মনে পড়ল 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কথা। সে যখন দার্জিলিঙে ট্রেনিংয়ে ছিল, সেই সময় এই কাগজের চীফ রিপোর্টার (মিঃ ভট্চার্য) আর চীফ ফোটোগ্রাফার (মিঃ সিংহ)—এই দুজনের সঙ্গে আলাপও জমেছিল তার। ওঁরা খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন তাকে। হ্যাঁ, এই সময় আর-এক দিন, এই কাগজের আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার—কানাইবাবু,—এঁর কাছ থেকেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছিল সুকুমার। এদের কাছে গেলে তো হয় হিলারির চিঠিখানা নিয়ে।

"ইংরাজী কাগজে এখন যাব না ধ্রুব, চল বাংলা কাগজেই আগে যাই। বাঙালী অভিযান, বাংলা কাগজের দ্বারস্থই প্রথমে হওয়া ভাল। চল 'আনন্দবাজারে'ই যাই। কজন চেনা লোক আমার আছে ওখানে।"

"বেশ তো, চল না। নন্দাঘুণ্টির একটা ছবিও ছাপাতে হবে।"

চীফ রিপোর্টারের দেখা পেল না ওরা। চীফ ফটোগ্রাফারেরও না। দেখা হল কানাইবাবুর সঙ্গে। ওদের অভিযানের কথা, টাকার সমস্যার কথা, হিলারির চিঠির কথা, নন্দাঘুণ্টির ছবি ছাপানোর কথা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হল। সেদিনের মত উঠে পড়ল ওরা।

কানাইবাবুর ঘর থেকে বের হতেই ধ্রুবর সঙ্গে চোখাচোখি হল আর-এক চেনা মুখের।

"আরে, ধ্রুব যে! কী খবর? ভাল আছ বেশ।"

"আরে, সুবলদা যে! আপনার খবর কী? ভাল আছেন।" ধ্রুব খুশীই হল সুবলবাবুকে দেখে।

সুবলবাবু জানালেন তিনি কর্মসূত্রে এখন এখানে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়ের স্বকীয় সহায়ক।

ধ্রুব জানাল, ওরা একটা পর্বত অভিযানে যাবে, তারই একটা ছবি আর খবর ছাপাতে এসেছে।

"এভারেস্ট বিজয়ী হিলারি", (ধ্রুব ওদের গুরুত্ব সম্পর্কে সুবলবাবুকে সচেতন করতে চাইল) "আমাদের এই পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

ধ্রুব হিলারির চিঠিখানা সুবলবাবুর হাতে ধরিয়ে দিল।

"এস এস, আমার ঘরে এস। বস। আমি আসছি।"

সুবলবাবু ওদের দুজনকে তাঁর ঘরে বসিয়ে, হিলারির চিঠিখানা টেবিলের রাশিকৃত কাগজের মধ্যে চাপা দিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। ওরা দুজন বসে রইল। চুপচাপ। সিগারেট পুড়ল অনেক, টেলিফোন মাঝে মাঝে বাজতে লাগল, কত লোক এসে ঘরখানায় উঁকি মেরে চলে গেল। সুবলবাবুর আর পাত্তা নেই। ওরা প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত, উস্‌খুস্‌ করতে লাগল। এইবার উঠলে হয়। এমন সময় সুবলবাবু ঢুকলেন।

"এই যে ধ্রুব। হ্যাঁ, হিলারির কথা কী যেন বলছিলে।"

ধ্রুব বলল, "নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সংকল্পকে উনি অভিনন্দন জানিয়েছেন।"

"নন্দাঘুণ্টি!" সুবলবাবু বলে উঠলেন, "নন্দাঘুণ্টি অভিযানের সেই ধ্রুব মজুমদার তুমিই। আরে বা!"

ধ্রুব একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

বলল, "তার মানে?"

সুবলবাবু বললেন, "অশোকবাবুর কাছে একখানা চিঠি এল একদিন। আমরা নন্দাঘুণ্টি পাহাড়ে যাব, আপনার সাহায্যপ্রার্থী। দেখি জন কয়েকের সই। তার মধ্যে কে এক ধ্রুব মজুমদার সই করেছে। সেই সইটা তা হলে তোমারই।"

ধ্রুব বলল, "হ্যাঁ, আমারই সই। কিন্তু সে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারও পাই নি।"

ধ্রুবর মুখে তিক্ত আহত অভিমানের ছায়া খেলে গেল।

"কী চাও তাই বল না। প্রাপ্তিস্বীকার নিয়ে কি হবে?"

সুবলবাবুর কথায় ধ্রুব খুশী হল। লোকটাকে চেনে সে। 'শনিবারের চিঠি'র অফিস থেকে ওঁর সঙ্গে পরিচয়। বিস্তারিতভাবে সব কিছুই বলল ধ্রুব। বাঙালীদের পর্বতারোহণ এই প্রথম। ভারতবর্ষেও এর আগে বেসামরিক স্তরে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ অভিযান হয় নি। সব ঠিক হয়ে গেছে ওদের। শুধু কিছু টাকার জন্য আটকে পড়েছে ওরা। এখন ওদের চাই টাকা।

"কত টাকা লাগবে তোমাদের?"

ধ্রুব আগের হিসেব একটু বাড়িয়ে দিল।

"পনেরো হাজার টাকা।"

সুবলবাবু কী যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর বললেন, "তোমরা অশোকবাবুর সঙ্গে দেখা কর না। কাল এস। আমি কথা কয়ে রাখব 'খন।"

॥ চৌদ্দ ॥

দরজা ঠেলে ওরা দুজন যখন অশোকবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখনও ওরা বিমূঢ়, তখনও ধাতস্থ হতে পারে নি। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ওরা ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। ওরা সব ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে লাগল।

হ্যাঁ, সুকুমার আর ধ্রুবকে নিয়ে সুবলবাবু ভিতরে ঢুকলেন। অশোকবাবু একবার চোখ তুলেই আবার কাজে ডুবে গেলেন।

একবার বললেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

সুবলবাবু চাপাস্বরে বললেন, "ব্যাপারটা সব বল ধ্রুব।"

ধ্রুব খুব সংক্ষেপে গুছিয়ে বলল। টাকার কথাও বলল।

অশোকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা লাগবে?"

ধ্রুবর হিসেব আবার বেড়ে গেল। সুবলবাবুকে বিস্মিত করে ধ্রুব বলে উঠল, "আঠারো হাজার টাকা।"

এবার অশোকবাবু ওদের মুখের দিকে চাইলেন।

একটি মাত্র কথা ওদের কানে গেল, "কী, পারবেন?"

ধ্রুব কিছু বলার আগেই সুকুমার জবাব দিল, "প্রাণপাত চেষ্টা করব।"

এবারে সব চুপ। ঘরে একটুও শব্দ নেই। অশোকবাবু আবার ডুবে গেছেন কাজে। সুবলবাবু নিঃশব্দে বসে আছেন। ওরাও।

অশোকবাবুই স্তব্ধতা ভাঙলেন।

বললেন, "বেশ, যান আপনারা।"

ওরা এই জবাবে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে গেল। কোথায় যেতে বললেন আমাদের? নন্দাঘুণ্টি, না ঘরের বাইরে? ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও ওদের কথাটা পরিষ্কার বুঝতে দেরি হল। "বেশ, যান আপনারা।" এত সহজে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে বলা যায়। নন্দাঘুণ্টিতে যান বলার পিছনে যে দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব কি এত সহজে নেওয়া যায়? এ ব্যাপারে এত অনায়াসে হ্যাঁ কি কেউ বলতে পারে?

হঠাৎ দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন সুবলবাবু। মুখখানা হাসি-হাসি।

বললেন, "বেশ এস্টিমেট তোমার ধ্রুব। আমায় কাল বললে পনেরো হাজার, আমি সেই রকমই তাঁকে বলেছিলাম। আজ আবার তুমি দুম করে বলে বসলে আঠারো হাজার। বেশ যা হোক।"

ধ্রুবর মুখ শুকিয়ে গেল।

বলল, "সব হিসেবই তো আন্দাজ দাদা। তা উনি কী বললেন?"

"বললেন, টাকা দেবেন। যা চেয়েছ, তাই দেবেন। একটা বাজেট তৈরি কর। আর হ্যাঁ, দেখ, ম্যাপ-ট্যাপ যদি থাকে তোমাদের নিয়ে এস একদিন। ওঁকে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিও।"

আর-কোন ইচ্ছে হচ্ছিল না ওদের, শুধু নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল। হো-হো করে হাসতে ইচ্ছে হচ্ছিল। শুধু চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছিল। বাঁধ-ভাঙা আনন্দের বন্যা ওদের

ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এমনিভাবেই ভাসতে ভাসতে ওরা বিশ্বদেবের অফিসে গেল। দিলীপের আস্তানায় গেল। নিমাইকে বের করে আনল। সবাই মিলে জড় হল আশুতোষের ব্রোঞ্জ মূর্তিটার নিচে। সেদিন ছিল ৭ই আগস্ট। সব সংশয়, সব অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে। ওদের পায়ের তলায় এতদিনে শক্ত মাটি ঠেকেছে। এখন ওদের আর পায় কে? এখন ওদের আর রোখে কে?

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র টাকা আর দার্জিলিঙের মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের সাজ-সরঞ্জাম, এ দুয়ে মিলে সফল করে তুলবে এদের অভিযান। বাঙালী অভি-যাত্রিকেরাও আপন পদচিহ্ন এঁকে রেখে আসবে হিমালয়ের চূড়ায়। জগতের পর্বত অভিযাত্রিক ভ্রাতৃত্বের—মাউণ্টেনীয়ারদের ব্রাদারহুডের—কনিষ্ঠতম অংশীদার হবে বাঙালী! ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে। বড় বাধা যা ছিল, প্রয়োজনমত টাকা সংগ্রহে বাধা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চমকপ্রদ বদান্যতায় তা দূর হয়েছে। টাকার যোগাড় হয়েছে। এখন চাই সাজ-সরঞ্জাম। তা এর জন্য ভাবছে না ওরা। মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট আছে। তেনজিং আছেন। এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং নোরগে। ভারতের গৌরব, পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। কোন ভাবনা নেই। চাইবামাত্র জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। চিঠি লেখা হয়েছে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংকে। তার উত্তর এল বলে।

কিন্তু না। কোন জবাব এল না। দুর্জয়-লিঙের দেবগণ হিমালয়ের মৌনে সমাধিস্থ হয়েই রইলেন।

এর মধ্যে 'আনন্দবাজার' থেকে ডাক এল ওদের। ওদের বলা হল একটা বাজেট পেশ করতে। অশোকবাবু আগ্রহ প্রকাশ করলেন ম্যাপ দেখতে, রুট জানতে। নিমাই ম্যাপ তৈরি করে ফেলল। তারপর পুরো দল চলল—এই প্রথম পুরো দলটার সদস্যগণ সকলে সকলের চেহারা দেখলেন। পুরো দল মানে সুকুমার রায়, বিশ্বদেব বিশ্বাস, ধ্রুবরঞ্জন মজুমদার, নিমাই বসু, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর সুরানা।

অশোকবাবুকে ম্যাপ দেখানো এবং রুট বাতলানো যত সহজে হল, বাজেট তৈরি অত সহজে হয় না। একসঙ্গে আঠারো হাজার টাকা খরচ করার অভিজ্ঞতা ওদের মধ্যবিত্ত জীবনে কারোরই নেই। তার উপর খরচটা হচ্ছে পর্বতারোহণে। জিনিসটা অপরিচিত।

ওরা আবার জড় হল ওদের হেড্ কোয়ার্টারে অর্থাৎ চৌরঙ্গীপাড়ার রেস্তোরাঁয়।

—"এ তোমার মুখে মুখে বাজেট নয় ধ্রুব, খাতা-কলমের ব্যাপার। হুঁশিয়ার হয়ে হিসেব ধরতে হবে।"

—"বুঝেছি রে বাবা, বুঝেছি। এতদূর যখন আসতে পেরেছি, বাকীটাও পার হতে পারব। এই নিমাই—"

—সু-উ-ই।

—"মোট কতদিন লাগবে বল্। কলকাতা টু কলকাতা।"

—"এসব হিসেব ফোকটে হয় না। চা দিতে বল।"

চায়ের অর্ডার গেল। নিমাই হিসেব কষতে শুরু করল। কলকাতা থেকে যোশীমঠ সাত দিন। যোশীমঠ থেকে বেসক্যাম্প আট দিন। সাত আর আট পনেরো।

—"কলকাতা থেকে বেসক্যাম্প যেতে আসতে তিরিশ দিন।"

—"আর বেসক্যাম্প থেকে সামিট?"

নিমাই গম্ভীরভাবে বলল, "সেটা হাই অলটিচ্যুডের হিসেব। শুধু চায়ে হবে না। টোস্ট দিতে বল।"

ধ্রুব হেসে ফেলল।

—"তোর দাবির দেখি আর শেষ নেই।"

"শেষ!" বিশ্বদেব বলল, "নিমাইদার এই সবে শুরু।" বাজেটে নিমাইদার জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে।"

—"তাই নাকি রে নিমাই?"

সু-উ-ই।

টোস্টের অর্ডার গেল। নিমাই খুশী হয়ে নড়েচড়ে বসল।

—"বেসক্যাম্পের উপরে কটা ক্যাম্প হবে বলে মনে হয় নিমাই?"

সুকুমারের প্রশ্ন শুনে নিমাই ওর মুখের দিকে চাইল।

বলল, "সেটা নির্ভর করবে, কত উপরে আমরা বেসক্যাম্প করতে পারব, তার ওপর।"

ধ্রুব বলল, "ধর্ পনেরো হাজার ফুটে। উড্ সাহেব যেখানে চতুর্থ শিবির স্থাপন করেছিলেন।"

নিমাই টোস্টে কামড় দিয়ে ম্যাপখানা বিছিয়ে নিল। মনোযোগ দিয়ে খানিকক্ষণ দেখল। মনে মনে হিসেব কষল।

বলল, "তুমি যেখানকার কথা বলছ ধ্রুব, সেটা পনেরো হাজার ফুট উঁচু হবে না বোধ হয়। এই দেখ, যেখানে রণ্টি হিমবাহ নন্দাঘুণ্টি হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটা ক্যাম্প করার মত জায়গা পাওয়া যেতে পারে। উচ্চতা চোদ্দ হাজার ফুট হবে হয়তো। ধর এখানেই যদি আমাদের পক্ষে বেসক্যাম্প করা সম্ভব হয়, তা হলে আর বড় জোর চারটে শিবির করতে হবে।"

—"বেশ এবারে দিনের হিসেব কর।"

—"আট থেকে দশ দিন। যদি আবহাওয়া ভাল থাকে।"

—"তা হলে বেস্ থেকে সামিট্ আর সামিট্ থেকে বেস্—মোট পনেরো দিন ধরতে পারি?"

—"থিয়োরেটিক্যালি ধরে রাখতে পার। তবে আমার মনে হয়, কিছু মার্জিন দিয়ে সাত সপ্তাহের হিসেব ধরলেই যথেষ্ট। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে যদি কলকাতা থেকে যাত্রা করতে পারি, তা হলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় ফিরে আসা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে না।"

ওদের হিসেব শুরু হল এই সাত সপ্তাহের ভিত্তিতে। শেরপা ছয় আর মালবাহক কুড়ি। এই ছাব্বিশ জন লোক নেওয়া ঠিক হল। শেরপা নেওয়া হবে দার্জিলিঙ থেকে আর ধোটিয়াল মালবাহক পিপুলকোটি থেকে।

নিমাই বলল, "এই মালবাহকদের সামলানো বড় ঝামেলার কাজ। একজন দুধে ট্রান্সপোর্ট অফিসার না থাকলে নাক দিয়ে জল বের করে ছাড়বে আমাদের।"

হঠাৎ বিশ্বদেব বলে উঠল, "আচ্ছা নিমাইদা, মদনাকে নিলে হয় না। আমাদের ট্রেনিংয়ের সময় এসব ঝক্কি কিন্তু সেই সামলেছিল। মনে পড়ে?"

নিমাই বলল, "ঠিক ঠিক। মদন মণ্ডলকে পেলে খুব ভাল হয় ধ্রুব। এসব ব্যাপারে ও খুব এক্সপার্ট। একেবারে অখণ্ড মণ্ডলাকারং। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কি?"

"খুব পাবে। ও এখন আছে চিত্তরঞ্জনে। ও পর্বতের নামে পা বাড়িয়েই থাকে। চিঠি দিলেই চলে আসবে।"

"তবে লীডার," নিমাই সুকুমারকে বলল, "তুমি অবিলম্বে ওকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে চিঠি লিখে দাও। মদন মাউণ্টেনীয়ার হিসেবেও খুব ভাল।"

"কিন্তু", ধ্রুব বলল, "এর মধ্যে একটা কথা আছে। আমাদের টীম তো পুরো হয়ে গেছে। কাগজে পুরো টীমের নামও ছাপা হয়ে গেছে। ওকে ঢোকাতে কাউকে বাদ দিতে হয়। সেটা ঠিক হবে না।"

বিশ্বদেব বলল, "কিন্তু ধ্রুব, তুমি মদনকে চেন না, তাই কিন্তু কিন্তু করছ। আমরা যদি মদনকে বলি মদন, তোমাকে আমরা এবার মেম্বার করতে পারব না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে, ও তাই যাবে। যদি বল, মদন আমাদের এই সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তুমি একে বেস্‌ক্যাম্প থেকে কাঁধে করে কলকাতায় হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এস, ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না, হাসতে হাসতে সে কাজ করে দেবে।"

—"হ্যাঁ, ও এই রকম মদন। আমাদের ব্যাচে ওর নাম ছিল জি-মদন।"

—"জি-মদন! তার মানে?"

বিশ্বদেব কী বলতে যাচ্ছিল, নিমাই তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "গ্রেট্ মদন।"

—"অবিশ্যি", বিশ্বদেব বলল, "ওর একটা বাংলা কথাও ছিল। তা সেটা না বললেও চলে। ওর সঙ্গে ঘর করলেই সেটা বুঝতে পারবে। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ওর মত সাহস, ওর মত সহ্যশক্তি, ওর মত নিরহংকার, আত্মত্যাগের ক্ষমতা খুব কম লোকের মধ্যেই আছে। কী বল নিমাইদা?"

—সু-উ-ই—

"ঠিক আছে," ধ্রুব বলল, "সুকুমার, তুই একখানা চিঠি লিখে দে। ট্রান্সপোর্ট অফিসার হিসাবেই ও চলুক আমাদের সঙ্গে।"

তারপর ওরা মন দিল বাজেট আলোচনায়। রেস্তোরাঁ যখন বন্ধ হল, তখনও ওদের হিসেব পুরো হয় নি। কিন্তু আর সময় নেই হাতে। রাত পোয়ালেই বাজেট নিয়ে যেতে হবে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' অফিসে। তাড়াতাড়ি টাকা বের করতে না পারলে মুশকিল। সময় নেই। সময় নেই এতটুকু। বহু কাজ বাকী। দার্জিলিঙ যেতে হবে। শেরপা ঠিক করতে হবে। সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে।

রাস্তায় যখন বেরিয়ে এল তখন রাত বেশ গভীর হয়েছে। বাজেট তৈরির ভার ধ্রুবর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সেদিনের মত সবাই বিদায় নিল। ধ্রুব গভীর রাত্রে বাসায় ফিরে দাদার টাইপরাইটার নিয়ে বসল বাজেট তৈরি করতে। সব ব্যাপারটা মিলিয়ে ওর কাছে কেমন হাস্যকর ঠেকল। যেন সব অন্ধ পথ দেখাবার ভার পরম নির্ভরতায় আর-এক অন্ধের হাতে সঁপে দিয়েছে।

খট্-খট্-খট্। টাইপের চাবিতে শব্দ তুলে তুলে ধ্রুব হিসেব লিখতে লাগল। বাজেটটা যখন সত্যিই একটা আকার ধরে বেরিয়ে এল সেই ছোট্ট টাইপ মেসিন থেকে, তখন রাত পুইয়ে গিয়েছে।

॥ পনেরো ॥

"হিমালয়ে বাঙালী অভিযান—

"যাত্রা শুরু : ২৫শে সেপ্টেম্বর"—

৯ই আগস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এই সংবাদ ঘোষণা করল। বিশেষ প্রতিনিধি লিখলেন :

সারা বছর একটানা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর সামান্য ক'দিনের পুজোর

ছুটিকে আরামে এবং আলস্যে উপভোগ করার জন্য সপরিবার ভিড়গুলি যখন একে একে হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনে জমতে শুরু করবে, জমতে জমতে যখন ভেঙে পড়বে, বিশ্রাম আর বিশ্রামের খুশিতে, তখন সেই ভিড়ের মধ্য থেকে এই ছটি যুবককে দেখলেও কেউ বুঝতে পারবেন না যে, এরা মরণকঠিন পণ করে যুঝতে চলেছে দুর্ধর্ষ হিমালয়ের অন্যতম চূড়া নন্দাঘুণ্টির সঙ্গে।

এদের দেখতে পাবেন ২৫শে সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশন থেকে হরিদ্বার-জনতা এক্সপ্রেসের যে গাড়িটি রাত সওয়া দশটায় ছাড়বে, তারই কোন এক কামরায়। এই যুবক কটি বাঙালী। এই বাঙালীরা বয়সের দিক থেকে কেউই এখনও ত্রিশের ঘরে পা দেন নি। এই ছটি ডাকাবুকো ঠিক করেছেন, দুর্ধর্ষ নন্দাঘুণ্টি শৃঙ্গ জয় করবেন। এজন্য অর্থের দরকার। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলেছে, অর্থ আমি দেব। অন্যান্য সাহায্যেরও দরকার। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলেছে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তোমরা 'বাঙালী কিছু করে না, কিছু পারে না' এ অপবাদ ঘুচাও। বাঙালী যুবকদের সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ কর। হিমালয় ইনস্টিটিউট বলেছে, আমরা সংগঠনের ভার নিলাম। আমাদের ছটি সভ্য এই কাজে অভিযাত্রিক হবে।

এই অভিযাত্রী দলের নেতা হবেন শ্রীসুকুমার রায়, সহনেতা শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস, ম্যানেজার এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীধ্রুবরঞ্জন মজুমদার, কোয়ার্টার মাস্টার শ্রীনিমাই বসু, আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশেষকিরণ সুরানা।

খবরের কাগজের কী যে মহিমা, ওরা তা বুঝতে পারল, খবরটা বেরিয়ে যাবার পর। অখ্যাত কয়েকটি যুবক রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ল। পর্দার আড়াল থেকে ওরা হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল পাদপ্রদীপের সামনে। ওদের সম্পর্কে পরিচিত মহল এতদিন যে ধারণা পোষণ করে এসেছে, তা যেন হঠাৎ বদলাতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, নিজেরাই যেন নিজেদের নতুন আলোয় দেখতে লাগল। ওরা যে কী বিরাট দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছে, এই প্রথম সেটা ওদের বোধগম্য হল। এই প্রথম ওরা কিছুটা নার্ভাস বোধ করল।

এতদিন টাকার বাধা মস্ত বাধা ছিল। 'আনন্দবাজার' এক কথায় সে বাধা দূর করে দিয়েছে। আর কী, এখন তবে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। আর তবে অপেক্ষা কিসের? সাজ-সরঞ্জামের। প্রয়োজনীয় টাকা ওদের সংগ্রহ হয়েছে, এবারে সরঞ্জাম-গুলো জুটলেই ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু পর্বত অভিযানের উপযোগী প্রধান প্রধান সরঞ্জামের কোনটাই এদেশে তৈরী হয় না। দোকান-বাজারে পাওয়া যায় না। ওদের একমাত্র ভরসা দার্জিলিঙের মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-ই ওদের এই বাধা—যাত্রাপথের শেষ বাধা—দূর করতে পারেন।

ধ্রুব আর সুকুমার দার্জিলিঙ যাবে ঠিক করল।

ধ্রুব বলল, "এক কাজ করলে হয় সুকুমার, দার্জিলিঙ যাবার আগে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটা সুপারিশ নিয়ে গেলে হয়। উনি যে মুখ্যমন্ত্রী তাই নন, হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের ভাইস-প্রেসিডেণ্টও বটেন।"

সুকুমার বলল, "তবে চল, অশোকবাবুর কাছে যাই। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে ওঁর সাহায্য পেলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।"

অশোকবাবুর কাছে প্রস্তাবটি করামাত্র উনি ডঃ রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। ডঃ রায় বড় ব্যস্ত। ওঁকে পাওয়া গেল না। অশোকবাবু ওদের অপেক্ষা করতে বললেন।

বললেন, "উনি যখন বাড়ি ফিরবেন, তখন ওঁকে ধরব। ওঁর বাড়িতেই যেতে হবে।"

ওরা ভেবেছিল, অশোকবাবু হয়তো একটা চিঠি লিখে দেবেন ডঃ রায়কে। ওরা সেই চিঠি নিয়ে তাঁর সংগে দেখা করবে। তাই অশোকবাবু যখন ওদের নিয়ে নিজেই ডঃ রায়ের বাড়িতে গেলেন, তখন ওরা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডঃ রায়ের ওখানে খুব বেশীক্ষণ ওদের কাটাতে হল না। সব কথা শুনে তিনি বললেন, তাঁকে সরকারীভাবে একখানা চিঠি লিখতে। তারপর যা করার তিনি করবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

ওরা আর দেরি করল না, পরদিনই ডঃ রায়ের নামে চিঠি লিখে অশোকবাবুকে দেখাল। সেই সংগে সাজ-সরঞ্জামের একটা লিস্টিও দাখিল করল। সেই চিঠির সংগে অশোকবাবুও একখানা চিঠি দিলেন ডঃ রায়কে। তাঁর কাছে অনুরোধ জানালেন, "এরা ২৫শে সেপ্টেম্বর যাত্রা করবে, তার আগে এদের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে, কাজেই এ ব্যাপারে আপনি ব্যক্তিগতভাবে একটু নজর দিয়ে বাধিত করবেন।"

অশোকবাবুর ঘর থেকে বেরোতেই 'আনন্দবাজারে'র প্রতিনিধির সংগে দেখা। নিমাইও সংগে ছিল সেদিন।

—"এই যে, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি। কয়েকটা কথা জানবার আছে।"

—"বলুন।"

—"চলুন না, উপরে গিয়ে বসি।"

চায়ের কাপের সামনে বসে শুরু হল খবরের-কাগজী সাক্ষাৎকার। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। জবাবের পর জবাব।

সুকুমার বলল, "আমরা সকলেই সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলে। জীবিকার জন্য সাধারণ চাকরি করি। নিমাই কেরানী, আমি শিক্ষক, ধ্রুব মোটর পার্টসের দোকানের মুন্সী, বিশ্বদেব প্রাইভেট ফার্মে খাতা রাখে। অর্থ নেই, বড় বড় লোকের সংগে চেনা-শোনাও নেই। মনের সাধ তাই আমরা মনেই পুষে রেখেছিলাম। কিন্তু কতদিন এভাবে থাকা সম্ভব, থাকা উচিত?"

সুকুমার এতক্ষণ তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদুস্বরেই কথা বলে যাচ্ছিল। হঠাৎ আবেগের প্রচণ্ড জোয়ার যেন তাকে ধাক্কা দিল। হঠাৎ সে কেমন এক প্রবল উত্তেজনার আবর্তে পড়ে গেল। তার মার্জিত স্পষ্ট উচ্চারণ তীক্ষ্ণ চিকন হয়ে গেল। সে উন্মনা হয়ে উঠল।

বলতে লাগল, "বাংলা দেশ আর বাঙালীকে আজ সব দিক থেকেই কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে। অন্যায় অপবাদ আর ঘৃণা, অশ্রদ্ধা আর হিংসার কুৎসিত রূপ যখন থাবা মেলে আক্রমণ করতে আসছে তখন অতীত গরিমা নিয়ে আর আত্মসন্তুষ্ট থাকা যায় না। কিছু একটা করে প্রমাণ করতেই হবে যে, শৌর্যে বীর্যে সাহসে আমরা আগের মতই রয়ে গেছি। তার মানে এই নয় যে, নিরীহ অসহায় নরনারীকে হত্যা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে মেয়েদের বেইজ্জত করে বীরত্বের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমরা এমন এক দেশে জন্মেছি যেখানে শক্তি সব সময়েই পরিচালিত হয়েছে শুভচেতনার সাহায্যে। পর্বতারোহণের অনাবিল আনন্দ উপভোগ ছাড়া আর যদি কোন উদ্দেশ্য এই অভিযানের থেকে থাকে, তবে এই। এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা 'আনন্দবাজারে'র কাছ থেকে পেয়েছি, এ জন্য তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।"

ধ্রুব বলল, "আমাদের প্রধান দুটি দুশ্চিন্তা, অর্থ এবং সাজ-সরঞ্জামের অভাব।

দুটিরই ভারমুক্ত হয়েছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিজের কাঁধে এ ভার তুলে নিয়েছে।"
"নন্দাঘুণ্টিকেই কেন আপনারা অভিযানের জন্য বেছে নিলেন?"
"কারণ," নিমাই উত্তর দিল, "এইটিই আমাদের প্রথম অভিযান। কারও কারও ইচ্ছে ছিল নীলকণ্ঠ শৃঙ্গে উঠব। কিন্তু নীলকণ্ঠ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথকেও হটিয়ে দিয়েছে নীলকণ্ঠ। এর তুলনায় নন্দাঘুণ্টির বিপদ কম, কিন্তু প্রতিবন্ধকতা কম নয়। নীলকণ্ঠ ডেঞ্জারাস, নন্দাঘুণ্টি ডিফিকাল্ট। নন্দাঘুণ্টিকে আমরা বেছে নিয়েছি—"
"কিংবা উল্টোটা", ধ্রুব বাধা দিল, "আসলে নন্দাঘুণ্টিই এসে আমাদের ঘাড়ে ভর করেছেন, বাংলাদেশের সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্য।"
"হ্যাঁ, তাও বলতে পারা যায়।" নিমাই বলল, "হিলারির একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছেন, পাহাড়কে কখনও তার উচ্চতা দিয়ে মাপতে নেই। তার প্রতিরোধী ক্ষমতা ও প্রতিবন্ধকতা দিয়েই তাকে বিচার করবে, হিসেব করবে। আর নন্দাঘুণ্টির প্রতিবন্ধকতা যে জোরাল হিলারি সেটা স্বীকার করেছেন। শিপটনও বলেছেন এটা "টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট।" নন্দাঘুণ্টি নিতান্ত হেলাছেন্দার পাত্তর নয়।"

১৪ই আগস্টের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় ফলাও করে এই সাক্ষাৎকার ছাপা হল। একেবারে প্রথম পাতায় বড় বড় শিরোনামা দিয়ে :

আনন্দবাজার পত্রিকার আনুকূল্যে
হিমালয়ে প্রথম বাঙ্গালী অভিযান

খবর ছাপা হল 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায়। সঙ্গে সঙ্গে যেন দুনিয়া বদলে গেল।
১৬ই আগস্ট 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বিশেষ সংবাদদাতার দিল্লি থেকে প্রেরিত সংবাদে জানা গেল :

> 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র উদ্যোগে হিমালয়ে এক অভিযান পরিচালিত হইতেছে, এই সংবাদে রাজধানীতে পর্বতারোহণ অনুরাগী মহলে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চারিত হইয়াছে।
>
> দার্জিলিঙের হিমালয় মাউন্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির নিকট বলেন, কয়েকজন বাঙালী যুবক ২০৭০০ ফুট উঁচু নন্দাঘুণ্টি চূড়ায় আরোহণ করিতে যাইতেছেন, ইহা জানিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন।

জ্ঞান সিং অভিযানের সাফল্য কামনা করলেন। নানা লোকের কাছ থেকে এই দুঃসাহসিক উদ্যমের জন্য অভিনন্দন আসতে লাগল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই অভিযাত্রিকদের সহায়তা করবেন বলে চিঠিপত্র লিখতে লাগলেন। ধ্রুবরা দেখল, দেশের অধিকাংশ লোকই তাঁদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। সকলেই তাদের উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছেন।

॥ ষোল ॥

সুকুমার আর ধ্রুব যখন দার্জিলিঙে হাজির হল তখন উৎসাহে ওরা ফুটছে। ওদের উদ্দেশ্য ছিল দুটো—(১) সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা, (২) শেরপা নিয়োগ করা।

প্রথম কাজটার ব্যাপারে ওদের আর দুশ্চিন্তা করার কিছুমাত্র কারণ আছে, এ কথা ওদের মনেও হল না। ডঃ রায় ওদের হয়ে সুপারিশ করেছেন ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংয়ের কাছে। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং ওদের অভিযানের খবর পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন, সাফল্য কামনা করেছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রতিনিধির কাছে। দুই আর দুই যোগ করলে চার হয় যখন, তখন এই দুই ঘটনার যোগফলে হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে ওদের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রাপ্তিও অবধারিত। সর্বোপরি আছেন তেনজিং। যে তেনজিংকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ভেবে বাঙালী মাত্রেই গর্বিত। সেই তেনজিং যখন দেখবেন যে-পশ্চিমবঙ্গ তাঁকে মাতৃস্নেহে লালিত করেছে, যেখানকার আকাশ বাতাস জল তাঁকে পুষ্ট করেছে, যশের দ্বারে পেঁছে দিয়েছে, সেই রাজ্যেরই কয়েকটি যুবক সত্যি-সত্যিই একটা অভিযান গড়ে তুলেছে, তাঁর স্বপ্নই সফল করতে চলেছে, তখন তিনিও উল্লাসে অধীর হয়ে উঠবেন নিশ্চয়, উপদেশ দেবেন, পরামর্শ দেবেন আর ওদের সরঞ্জাম সংগ্রহে বিন্দুমাত্রও যদি বাধা সৃষ্টি হয়, হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা মুহূর্তে দূর করে দেবেন তেনজিং অঙ্গুলিহেলনে।

১৬ই আগস্ট ওরা ইনস্টিটিউটে গেল। তেনজিং আর মেজর দেওয়ানের সঙ্গে দেখা করল ওরা। তেনজিংয়ের মুখে অতি পরিচিত সেই তেনজিং-হাসি। সুকুমার ওদের অভিযানের কথা বলল। বলল ওদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের কথা। জিজ্ঞাসা করল, জিনিসগুলো পাওয়া যাবে কি না?

তেনজিং এই জিজ্ঞাসার সরাসরি কোন উত্তর দিলেন না। বললেন, "ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং কো আনে দো।"

—"আছে কি আমাদের তালিকামত সরঞ্জাম আপনাদের ভাণ্ডারে?"

—"ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং কো আনে দো।"

হিমশীতল শুকনো জবাবটা ওদের কানে আবার বেজে উঠল। ব্যস্ত তেনজিং দুটি হতভম্ব যুবকের সঙ্গে কালক্ষেপ বৃথা মনে করে মুহূর্তে উঠে গেলেন। হতাশার সূক্ষ্ম আবরণ দার্জিলিঙের মেঘের মত অতর্কিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের উৎসাহের তেজকে অনেকটা ম্লান করে দিল।

ইনস্টিটিউটের আর-একজন কর্মচারী, মেজর দেওয়ান, ওদের মনে আবার উৎসাহের আলো জেবলে দিলেন। এই ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্ররা এই অভিযান পরিচালনা করছে, এ কথা শুনে মেজর দেওয়ান খুব খুশী হলেন। বেশ বেশ। ওদের সাহস দিলেন। আন্তরিক আগ্রহে ওদের কাছ থেকে অভিযান সংক্রান্ত নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। পরামর্শ দিলেন খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে। ওদের তালিকাটি চেয়ে নিয়ে ভাল করে দেখলেন। বললেন, প্রায় সব জিনিসই—অতি আবশ্যকীয় জিনিসগুলি তো বটেই—ইনস্টিটিউটের স্টকে আছে। তবে এ সব জিনিস ব্রিগেডিয়ারের অনুমতি ছাড়া দেওয়া যাবে না। দেওয়ান বললেন, কিছু কিছু জিনিস এখান থেকে পাওয়া যাবে। বাকীটা শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন (শ্রীতেনজিং তার সভাপতি) থেকে ভাড়া নিতে হবে।

"তোমরা ব্রিগেডিয়ার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

"কবে আসবেন, ব্রিগেডিয়ার।"

"১৯ তারিখে।"

আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে ওরা হোটেলে ফিরছে, এমন সময় ওদের দেখা দার্জিলিঙের বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীমণি সেনের সঙ্গে। শ্রীসেন, [illegible] একজন

পূর্বতোরোহী। ছবি আঁকার উদ্দেশ্যেই নানা পাহাড়ে ভ্রমণ করেছেন। ওঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের একজন ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ। শ্রীসেনের বয়স হয়েছে। তবু উৎসাহ ও উদ্যম এখনও যুবকদের মত। ওঁদের দেখে শ্রীসেন খুব খুশী। বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। উৎসাহ দিলেন। আর অনেক মূল্যবান পরামর্শ। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাভারস্যাক আর এক জোড়া স্নো-গগল্‌স্‌ দিয়ে দিলেন। এই ওদের প্রথম বউনি।

ওরা যখন হোটেলে ফিরে এল, তখন ওদের অনিশ্চিত ভাব অনেকটা কেটে গেছে। আবার ওরা কল্পনার জাল বুনতে লাগল। ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং আসবেন... ওরা তালিকা পেশ করবে...ব্রিগেডিয়ার সাহেব মঞ্জুর করবেন। ওদের অভিযান শুরু হয়ে যাবে।

দিন যেন আর কাটতেই চায় না। এক-একটা দিন যেন এক-একটা বছর। ১৫ই ওরা দার্জিলিঙ পেঁছেছে, ১৬ই ওরা ইনস্টিটিউটে গিয়েছে। আজ ১৭ই। যেন তিনটে যুগ ওরা পার করে দিল এই "স্নো ভিউ হোটেলে"। এখনও আরও দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে। দুটো দিন!

ওরা শেরপাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করতে লাগল। এখানে ওরা সফল হল আশাতীত। বিশেষ করে ওদের ভাল লাগল ইনস্ট্রাক্টার ওয়াংদি নরবুকে। চো-য়ু অভিযানে যথেষ্ট নাম করেছেন ওয়াংদি।

> আমরা দার্জিলিঙে এখন বড় ব্যস্ত। স্নো ভিউ হোটেলে উঠেছি। আছি শহরের একেবারে দক্ষিণে। আর যেতে হচ্ছে একেবারে উত্তরে ইনস্টিটিউটে। ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ তেনজিং, দেওয়ান প্রভৃতি যাঁরা বর্তমানে এখানে আছেন—জ্ঞান সিংয়ের অবর্তমানে কিছুই করতে পারবেন না। আশা করছি, তিনি ১৯ তারিখে এখানে ফিরবেন। সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের চেষ্টা মুলতুবী রেখে আমরা এখন অভিজ্ঞ শেরপাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করছি। দেখে খুশী হয়েছি যে ভারতের এই প্রথম বেসরকারী অভিযান সম্পর্কে এরা যথেষ্ট আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখাচ্ছে। তার মধ্যে চো-য়ু অভিযানখ্যাত ওয়াংদি নরবুর উৎসাহই সব থেকে বেশী। আমাদের মনে হয় ওঁকে সহযাত্রীরূপে পেলে আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা নিশ্চিত। আমরা এ-ও স্থির করেছি যে, উচ্চমার্গের শেরপা নিয়োগের ভার ওঁর হাতেই অর্পণ করব। তবে এঁকে পেতে হলে জ্ঞান সিংয়ের অনুমতি চাই। আশা করি তা পাব।

১৭ই আগস্ট সুকুমার অশোককুমার সরকারকে এই কথা চিঠি লিখে জানাল। লিখল :

> রোজ সকালে আমরা ইনস্টিটিউটে ধর্না দিচ্ছি আর বিকালে হানা দিচ্ছি তুনসুঙ বস্তিতে। সাজ-সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যাবে কি না, পেলে তার দাম কত লাগবে, সে সম্পর্কেও খবর সংগ্রহ করছি। যদি জ্ঞান সিং আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে না পারেন তা হলে হয়তো এসব খবর আমাদের কাজে লাগতে পারে।
>
> আমরা সংবাদ পেয়েছি ডঃ রায়ের চিঠিখানা জ্ঞান সিংয়ের দপ্তরে এসে পেঁছেছে। আশা করছি, ওই চিঠিখানা ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংকে আমাদের অভিযানে সাজ-সরঞ্জাম ধার দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে।

২০শে আগস্ট ওরা ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংয়ের সঙ্গে দেখা করল। এই সাক্ষাৎকারে সময়ের অপব্যয় একটুও হল না। অল্পের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ওদের

মনে হল, অভিযানেরও ইতি বুঝি হয়ে গেল। জ্ঞান সিং প্রথমেই বললেন, দিল্লি থেকে তিনি এই অভিযানের সাফল্য কামনা করেছেন বলে যে খবর বেরিয়েছে, তা ঠিক নয়। তিনি সামরিক স্পষ্টতায় বললেন, এই দলটির পর্বত আরোহণের কোন যোগ্যতা আছে বলে তিনি মনে করেন না। এই সামান্য অভিজ্ঞতা সম্বল করে ওরা যদি অভিযানে যাবার চেষ্টা করে, তা হলে সেটা হবে জ্ঞান সিংয়ের মতে আত্মঘাতী কাজ।

সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া যায় কি না, সে সম্পর্কে তিনি তেনজিংয়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর জানালেন, গোটা কতক জীর্ণ তাঁবু আর ক্র্যাম্পন ছাড়া দেবার মত কোন জিনিস ইনস্টিটিউটের বাড়তি নেই।

—"আর শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন? তারা দেবে তো?"

—"না। তাদেরও কিছু নেই এদের দেবার মত। একেবারে সাফ জবাব পাওয়া গেল।"

—"আর ওয়াংদি? ওয়াংদিকে আমরা পাব তো?"

—"না। ওকে ছাড়া যাবে না।"

আর কী, যা জানার ছিল, সবই জানা হয়ে গেল। না, একটু বাকী ছিল। সেটুকু তেনজিং জানিয়ে দিলেন—"যদি সাজ-সরঞ্জাম চাও, আমি যোগাড় করে দিতে পারি। তবে কিনতে হবে।"

—"কী রকম দাম পড়বে?" শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে ওরা জিজ্ঞেস করল।

তেনজিং দামের যা আন্দাজ দিলেন, তা শুনে ওদের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল। তেনজিং বললেন, "সরঞ্জাম যদি আমার কাছ থেকে নাও, তবে শেরপাও আমি ঠিক করে দেব। কাল সকালে ইনস্টিটিউটে এসো। মাল সব রেডি থাকবে।"

হোটেলে ফিরে এসেই ধপ করে শুয়ে পড়ল ওরা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলল না। বলার আর কী আছে? ওদের সামনে এখন দুটো পথ খোলা। হয় অভিযানের পালা চুকিয়ে দেওয়া, আর নয় তেনজিংয়ের পরামর্শমত সাজ-সরঞ্জাম কেনা।

অভিযান বন্ধ করে দেবে? এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে যেতে হবে? এত প্রচার হয়েছে কাগজে? শুভেচ্ছা অভিনন্দন এসে জমেছে। ওরা হাল ছেড়ে দেবে? ফিরে যাবে ম্লান মুখে? কী বলবে ওদের লোকে? কী ধারণা হবে বাঙালী যুবকদের সম্পর্কে?

"না, অসম্ভব ধ্রুব, শুধু হাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।"

"এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ করতেই হবে সুকুমার। আমরা যদি এর পরে ফিরে যাই, বাংলা দেশে পর্বত অভিযান সম্পর্কে আর কেউ উৎসাহ দেখাবে না।"

"এখন উপায়?"

"একমাত্র উপায় জিনিসপত্র কেনা।"

"সে যে প্রচুর টাকা। অত টাকা কোথায় পাব?"

"অশোকবাবুকে সব ব্যাপারটা খুলে লিখে দে। এখন একমাত্র ভরসা 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'। আর অন্য উপায় তো দেখি না"।

"তাতে কী ফল হবে?" সুকুমার সংশয় প্রকাশ করে। "এমনিতেই তো এক রকম বললাম, আর-এক রকম হিসেব দাখিল করলাম। আবার এখন যদি অন্য রকম কথা বলি, কী ভাববেন আমাদের বল্ তো।"

"তুই লেখ্ না রে বাপু। অত ভাবলে কাজ হয় না। আমরা তো ফুর্তি করার জন্য টাকা চাইছি না। তেনজিং, জ্ঞান সিং আমাদের অকূলে ভাসাতে পারেন, কিন্তু অশোকবাবু ভাসাবেন না বলেই তো বিশ্বাস।"

(বাঁ দিক থেকে) প্রথম সারি : ধ্রুব, সুকুমার, আঙ শেরিং, বিশ্বদেব; দ্বিতীয় সারি : নিমাই, আজীব, মদন, দিলীপ; তৃতীয় সারি : ডাঃ কর, লেখক, নরবু, বীরেন; চতুর্থ সারি : টাসি, গুর্ণদিন, দা তেম্বা, আঙ ফুতার

ঘন্যাকুলে মালবাহকদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ

ফটো : আনন্দবাজার

॥ সতর ॥

কিন্তু সুকুমার তবুও মনস্থির করে উঠতে পারছিল না যে, অশোকবাবুকে চিঠিখানা সত্যিই লিখবে কি না? ওদের যদি সব জিনিস এখন কিনতে হয়, তা হলে যে অনেক টাকা লাগবে। যে বাজেট 'আনন্দবাজারে' পেশ করে এসেছে তা অনেক—অনেকখানি ছাপিয়ে যাবে। যদি 'আনন্দবাজার' এ টাকা দিতে রাজী না হয়?

সংশয় আর চরম অনিশ্চিতি সুকুমারকে দিশাহারা করে ফেলল। ইনস্টিটিউট ওকে যেন পথে বসিয়ে দিল। জব্বলপুর থেকে একটা দল আসছে পর্বতাভিযানে, তাদের জন্য ইনস্টিটিউটের সাহায্যহস্ত প্রসারিত। ইনস্টিটিউটের করুণা থেকে ওরাই শুধু বঞ্চিত হল। কেন? গেঁয়ো যোগী বলে? সত্যিই এ রহস্যের কোন কিনারা সুকুমার করে উঠতে পারছিল না।

ইনস্টিটিউট বলল, আমাদের সাজ-সরঞ্জাম বাড়তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন বলল, আমাদেরও ধার দেবার মত বাড়তি কিছু নেই। এ-ও এক রহস্য।

সব থেকে সুকুমারের অভিমানে ঘা দিল, জ্ঞান সিংয়ের মিলিটারি মন্তব্য: "তোমাদের পর্বতারোহণের কোন যোগ্যতা আছে বলে আমি মনে করি নে।"

হোটেলের ঘরে শুয়ে সুকুমার এই অবমাননাকর উক্তির মুখোমুখি হল।

—কেন? সুকুমার মনে মনে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেন আপনি তা মনে করেন না জ্ঞান সিং মহাশয়? আমরা মিলিটারির লোক নই বলে? না কি বাঙালী বলে?

—না তা নয়, তোমাদের অভিজ্ঞতা নেই।

—পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা পাহাড়ে না চড়লে আর কীভাবে হতে পারে?

আর কোন জবাব পেল না সুকুমার। হঠাৎ তার মনে হল, আমাদের যোগ্যতা আছে কি নেই, কাজ দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। এর জন্য প্রাণ যায়, পরোয়া নেই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়েছে অমনি ওদের সঙ্গে এক পুরনো বন্ধুর দেখা হল। দার্জিলিঙেরই বাসিন্দা। জন্মসূত্রে ও হিমালয়-প্রেমিক।

"এই যে, নন্দাঘুণ্টির নেতা—"

"আর নন্দাঘুণ্টি—"

ম্লান তিক্ত হাসি সুকুমারের ঠোঁটে ফুটে উঠল। বন্ধুটি বুঝল ব্যথার জায়গায় হাত দিয়েছে। অপ্রস্তুত হল।

বলল, "ব্যাপারটা কী হল বল তো। শুনলাম তোমরা ওই কাজেই দার্জিলিঙ এসেছ। শুনেই দেখা করতে আসছি। তা এমন বেসুরো গাইছ কেন?"

ধীরে ধীরে ওরা সব কথা তাকে বলল। শুনতে শুনতে বন্ধুটির মুখ প্রথমে গম্ভীর, পরে অপমানে লাল হয়ে উঠল।

বলল, "ইনস্টিটিউট যদি এই ব্যবহার করে থাকে তবে যে করেই হোক, এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। নালিশ করে নয়, যোগ্যতার প্রমাণ দাখিল করেই সে জবাব দিতে হবে।"

"কী করে সে জবাব দেব?" সুকুমার জবাব দিল। "এ তো কথার কথা নয়। সাজ-সরঞ্জাম পাব কোথায়, শেরপা কোথায় পাব?"

"তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন সুকুমার", বন্ধুটি ওকে সাহস দিল। "তোমার কি ধারণা, ইনস্টিটিউট [illegible] কিছুর ইজারা নিয়ে বসে আছে? আমার পরামর্শ শোন, যা

ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে পাও নিয়ে নাও। বাকী জিনিসের সন্ধান আমি তোমাদের দিচ্ছি। চল তো আমার সঙ্গে তুনসুঙ-বস্তিতে।"

"ওসব জায়গা আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে।"

"বেশ তো, না হয় আর-একবার গেলেই। সর্দার আঙ শেরিঙের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"আঙ শেরিঙ!"

"আঙ শেরিঙের নাম শোন নি?"

"শুনেছি বইকি।" ধ্রুব বলল, "নাঙ্গাপর্বতখ্যাত সেই দুর্ধর্ষ শেরপা তো?"

"হ্যাঁ, সেই আঙ শেরিঙ, চারজন জার্মান আর আটজন শেরপার মধ্যে যে একা জীবিতাবস্থায় উপর থেকে নিচে ফিরে আসতে পেরেছিল। ধর, একে যদি দলে পাও, নেবে?"

"নিশ্চয়ই।" ওরা যেন এতক্ষণ অকূলে ভাসছিল, এখন কূল পেল।

আঙ শেরিঙের সঙ্গে অবশেষে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ওঁকে সর্দার নিযুক্ত করা হল। ঠিক হল, আর যে ছয়জন শেরপাকে দলে নেওয়া হবে, তাদের নিয়োগ করবেন আঙ শেরিঙ। দীর্ঘ ঋজুদেহ, তীক্ষ্ণচক্ষু, ব্যক্তিত্বময় আঙ শেরিঙকে ওদের ভালই লাগল। সাত শো টাকা আগাম তাঁর হাতে তুলে দিল ওরা। আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সংগ্রহের ভার আঙ শেরিঙ নিজের হাতে অনেকটা তুলে নিলেন।

ধ্রুব বলল, "সর্দার, আপনি শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন না তো?"

—"আমার উপর আপনারা যতদিন বিশ্বাস রাখবেন, আমিও ততদিন বিশ্বস্ত থাকব।"

—"তেনজিং যদি বাধা দেন?"

—"সে আমার গার্জেন নয়।"

—"যদি শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশন আপনার উপর চাপ দেয়?"

—"তা হলে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক ত্যাগ করব।"

—"সর্দার, আমরা তোমার উপর নির্ভর করছি। এখন যে কথা বললে, তা মনে থাকবে?"

আঙ শেরিঙ ধ্রুবর মুখের দিকে একবার, একবার সুকুমারের দিকে চাইলেন। তারপর সুকুমারকে বললেন, "লীডার সাব্, ম্যয় শেরপা হুঁ, মেরা জবান এক হ্যাঁয়।"

এত সহজে এমন একজন অভিজ্ঞ শেরপাকে ওরা সহযাত্রী হিসাবে পাবে এটা ওদের চিন্তার বাইরে ছিল। যে প্রত্যয় ওরা হারাতে বসেছিল, সর্দার আঙ শেরিঙকে দলে পেয়ে আবার তা পূর্ণভাবে ফিরে এল।

আঙ শেরিঙ ছাড়া আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ শেরপার সঙ্গে দেখা হল ওদের। শুনল, ইনস্টিটিউট এবং শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনকে কেন্দ্র করে এর মধ্যেই এমন এক কায়েমী স্বার্থচক্র সৃষ্টি হয়েছে যে, যে শেরপা ওই চক্রের বাইরে তার সুযোগ সুবিধা পাবার উপায় ক্রমেই কমে আসছে। দার্জিলিঙে শেরপারা স্পষ্টত দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে। বিশ্ববিখ্যাত এক শেরপা দার্জিলিঙ ছেড়ে সিকিম চলে গেছেন। কয়েকজন কাঠমাণ্ডু চলে গেছেন। অচিরে এমন অবস্থা আসবে যখন পর্বতারোহণ-জগতে দার্জিলিঙের প্রভাব কমে যাবে। শুনে ওরা খুবই দুঃখ পেল।

হোটেলে ফিরে এসে সুকুমার এবার অনায়াসেই অশোকবাবুকে চিঠি লিখতে পারল।

লিখল :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ (২০শে আগস্ট) আমাদের ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। কথাবার্তাও হইয়াছে। আমাদের সহিত সাক্ষাতের পূর্বে তেনজিংয়ের সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, তাঁহারা আমাদের অভিযান এবং ডঃ বি সি রায়ের চিঠি সম্পর্কেই আলোচনা করেন।

শুরুতেই ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং পর্বতারোহণ করিতে হইলে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় তৎসম্পর্কে সুদীর্ঘ উপদেশ দিয়া আমাদিগকে বাধিত করেন। সত্য কথা বলিতে কী, আমরা যাহাতে এই কার্যে বিরত হই, তিনি সেই চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তবুও আমরা যে কার্য-সাধনের জন্য উপস্থিত হইয়াছি তাহার সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বার বার চেষ্টা করিতে থাকি। ইহাতে তিনি যে জবাব দেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়ি। তিনি জানান, পর্বতারোহণের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ইনস্টিটিউটে সামান্য পরিমাণই আছে। যাহা আছে তাহা পর্বতারোহণ-শিক্ষা দিবার কার্যেই ব্যবহৃত হইবে। যে সকল সরঞ্জাম এভারেস্ট হইতে ফিরিয়াছে, তাহা এভারেস্ট অভিযান উদ্যোগী সমিতির সম্পত্তি। যে সকল সরঞ্জাম ইনস্টিটিউটের হেফাজতে আছে তাহার যথাযথ হিসাব দাখিল করিতে হইয়াছে। মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টি-টিউট আমাদের অভিযানে প্রায় কোন সামগ্রীই দিতে পারিবে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে তেনজিং এই সকল দ্রব্যাদি কিনাইয়া দিতে পারিবেন।

আমরা সোমবারে তেনজিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব, এইরূপ কথা আছে। সেই সময় তিনি আমাদের অভিযানে কতটুকু সাহায্য করিতে পারিবেন তাহা জানাইবেন। ইতিমধ্যে আমরা আঙ শেরিঙ, তোপকে, পাসাং প্রভৃতি কয়েকজন অভিজ্ঞ শেরপার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের অন্তরালে কী ঘটিতেছে সে সম্পর্কে তাঁহারা আমাদিগকে কিছু কিছু খবর দিয়াছেন। নানাসূত্রে আমরা যে সকল কথা শুনিতেছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে এখানকার কেলেঙ্কারিও দণ্ডকারণ্য অথবা জীবনবীমা কর্পোরেশন হইতে কিছু কম হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ফিরিয়া গিয়া সব কথা আপনাকে জানাইব। আমরা ঠিক করিয়াছি, আমাদের নন্দাঘুণ্টি অভিযানের জন্য আমরা আর ইনস্টিটিউটের মুখাপেক্ষী হইব না। দার্জিলিঙের অধিকাংশ শেরপা অধিবাসীই মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং শেরপা ক্লাইম্বিং অ্যাসোসিয়েশন হইতে তফাত থাকিতেছে। তাহারা আমাদিগকে সাজ-সরঞ্জাম ধার দিয়া, ভাড়া দিয়া এবং উপযুক্ত শেরপা দিয়া সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছে। এই মাউণ্টেনীয়ারিং ইনস্টিটিউট কার্যত বাঙালী-বিদ্বেষী; মনে করেন, ভারতে পর্বতারোহণের একচেটিয়া অধিকার কেবল উঁহাদেরই আছে। আমরা যদি উঁহাদের দেখাইতে পারি, উঁহাদের সাহায্য ছাড়াও অভিযান সংগঠন করা যায়, এবং সেই সকল অভিযানও সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে উঁহাদিগকে একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। (নাঙ্গাপর্বতখ্যাত শেরপা সর্দার আঙ শেরিঙ আমাদিগকে কথা দিয়াছেন যে, বেস্ ক্যাম্প হইতে পনের দিনের মধ্যেই আমরা সফলতা প্রাপ্ত হইব। এবং সাফল্যের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন।)

আমাদের এই অভিযানের স্বরূপ হইবে স্বতন্ত্র স্বাধীন, কারণ ইনস্টি-

টিউটের সাহায্য পাওয়া যাইবে না। আমরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিব, ঠিক করিয়াছি। যে সকল সাজ-সরঞ্জাম কিনিতে পাইব তাহা কিনিব, বাকীটা ভাড়া করিব। আশা করিতেছি, দুই-একদিনের মধ্যেই এইসব ব্যাপার চুকিয়া যাইবে, তারপর কলিকাতায় ফিরিব। আমাদের দুইজনেরই সোমবারে অফিসে জয়েন করার কথা ছিল, আশা করি, তাঁহাদের দরজা আমাদের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত খোলা থাকিবে। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের জন্য যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক তাহার সংগ্রহের ব্যবস্থা পাকা না করিয়া আমরা দার্জিলিঙ ছাড়িতে পারি না।

শ্রদ্ধা জানিবেন। ভবদীয় সুকুমার রায়।

পুনশ্চ। আমরা টাকা পাঠাইবার জন্য আপনার নিকট যে তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলাম তদনুযায়ী ৪০০০৲ টাকা আসিয়াছে, সংবাদ পাইয়াছি। আমরা যে কার্য সাধনের জন্য আসিয়াছি তাহা সাধিয়া তবে ফিরিব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।—ইতি।'

॥ আঠার ॥

পরদিন সুকুমার আর ধ্রুব ইনস্টিটিউটে গেল। সম্ভবত ইনস্টিটিউটের সঙ্গে এই ওদের শেষ সম্পর্ক। গভীর বেদনা বুকে চেপে সুকুমার তার পরিচিত পরিবেশটায় একবার নজর বুলিয়ে নিল। কী মন্দ ভাগ্য তার! যেখানে সাহায্য পাওয়া অবধারিত ছিল, সেই ইনস্টিটিউটই শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরাল!

তেনজিং এলেন। ওরা দেখে আশ্বস্ত হল যে তিনি কোন জিনিসপত্র আনেন নি। আনলে ওরা মুশকিলেই পড়ত। কারণ অত চড়া দাম দেবার মত পুঁজি ওদের ছিল না। অপেক্ষাকৃত কম দামে—অনেক কমে—সাজ-সরঞ্জাম কেনবার ব্যবস্থা ওরা ঠিকই করে ফেলেছে। তেনজিং ইনস্টিটিউটের গুদাম থেকে এক বাক্স ক্র্যাম্পন এনে ওদের বললেন, "এগুলো তোমরা কিনতে পার। এগুলো এক শেরপার। ২৫৲ টাকা করে জোড়া।"

ওরা তেনজিংকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে, ক্র্যাম্পন আপাতত ওদের চাই না। ইনস্টিটিউট দেবে বলেছে।

ইনস্টিটিউট ওদের ছয় জোড়া ক্র্যাম্পন আর ছয়টি তাঁবু শেষ পর্যন্ত দিতে রাজী হলেন। ওরা বিনাবাক্যে সেগুলো গ্রহণ করল। তাঁবুর অবস্থা দেখে ওদের কান্না পেল। বহু অভিযানে ব্যবহৃত, জরাজীর্ণ, আর্কেয়িক, আর্কটিক তাঁবু। সার্ভেয়াররা যে ধরনের তাঁবু আগে ব্যবহার করতেন, তাই। ওজনে ভারী। হাই-অলটিচ্যুডে ওগুলো ব্যবহার করা যাবে কি না সন্দেহ। আরও মুশকিল, কোনটাই ওয়াটার-প্রুফ বা স্নো-প্রুফ নয়। ঝড়ো বাতাসের গুঁতো খেয়ে টিঁকে থাকতে পারবে, ওগুলোর চেহারা দেখে তেমন ভরসা ওদের হল না। তবু নাই-তাঁবুর চেয়ে ফুটো-তাঁবুও ভাল, তাই ওগুলো গ্রহণ করতে ওরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। তাঁবুর চাইতে ক্র্যাম্পনগুলোর অবস্থা যে ভাল, ওরা এতেই খুশী। আর-একটা ক্লাইম্বিং ট্রাউজার্স আর ক্লাইম্বিং শার্টও চেয়ে নিল। দর্জীকে ওগুলো দেখিয়ে ওরা ওইরকমই বানিয়ে নেবে কলকাতায়।

ওরা আর কালবিলম্ব করল না। তুনসুঙ-বস্তি চষে ফেলল সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে। ধীরে ধীরে একটা দুটো করে সামগ্রী ওদের সামনে হাজির হতে শুরু

করল। ছেঁড়া, নোংরা, এমন সব জিনিস, যা ছুঁতেও গা ঘিনঘিন করে। কোনটা দু-হাত-ফেরতা, কোনটা তিন-চার-হাত-ফেরতা। আর রকমারি জায়গার তৈরী। ফেদার ট্রাউজার্স মেড ইন জাপান। ফেদার কোট মেড্ ইন সুইজারল্যাণ্ড। এমনি কোনটা ফরাসীস্, কোনটা ইংলিশ, কোনটা বা জার্মানির। যখন কিছু জিনিস ওদের হোটেলে এসে জড় হল, তখন তাদের চেহারা দেখে ওদের একটাই উপমা মনে হল : "হরিদাসের সাড়ে বত্রিশ ভাজা"।

তাও যদি সব জিনিস পেত! অনেক জিনিস তখনও কেনা বাকী রইল। যেগুলো কেনা হল, তাও সবার গায়ে ঠিকমত ফিট্ করবে কি না সন্দেহ। ওরা বুঝতে পারল, এক অদ্ভুত অভিযান তৈরী হয়ে উঠছে। বুঝল ঠিকই, কিন্তু আর কী-ই বা করার আছে! ওদের সামনে পরিষ্কার দুটো পথ পড়ে আছে। হয় অভিযান বন্ধ করে দেওয়া, আর না হয় ভাল-মন্দ কোন-কিছুর বাছ-বিচার না করে চোখ কান বন্ধ রেখে এগিয়ে যাওয়া।

অভিযান বন্ধ রাখা দূরে থাক্, স্থগিত রাখার কথাও ওরা ভাবতে পারে না। এত প্রচার হয়েছে, এত উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে দেশে। এখন ওরা কোনমতেই পিছিয়ে পড়তে পারে না। শত বাধা মাথায় করে ওরা যদি এগিয়ে যায় আর তাতে যদি ওদের মৃত্যুও হয়, তবু ভাল। হয়তো বাঙালীর ছেলেদের মধ্যে পাহাড়ে ওঠার ঝোঁক বেড়ে উঠবে। সংঘবদ্ধ, সংগঠিত অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাঙালী যুবক। মাউণ্টেনীয়ারিংয়ের চর্চা গড়ে উঠবে আমাদের দেশে, হিমালয়-আশ্রিত পশ্চিমবঙ্গে। হ্যাঁ, এই কারণেই আমাদের এবার নির্দিষ্ট দিনেই কলকাতা ছাড়তে হবে। ওদের প্রতিজ্ঞায় ওরা অটল।

আর না যদি যায়, কী বলবে তাদের লোকে?

—কেন গেলে না তোমরা?

—ইনস্টিটিউটের সহায়তা পেলাম না।

—খালি নালিশ। বাঙালী কাজ করে না, করতে চায় না। তাই একটা কৈফিয়ত খাড়া করে। খালি দোষারোপ করে। এত লোককে মদত দিচ্ছে ইনস্টিটিউট, তোমাদেরই শুধু দিচ্ছে না! এ কথা কে বিশ্বাস করবে? আসলে এটা বাঙালীদের কম্‌প্লেক্‌স্। কিছু করার মুরোদ নেই। আছে শুধু বাঙালীদের কেউ কিছু করতে দিচ্ছে না বলে কাঁদুনি।

সুকুমার জানে, ধ্রুব জানে, এমন কথা উঠবে। ওরা সে সুযোগ কাউকে দেবে না।

—কেন গেলে না তোমরা?

—উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম পেলাম না।

—নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। এত লোক পাহাড়ে উঠছে তাদের কোন-কিছুতেই আটকাচ্ছে না, পৃথিবীর সব বাধা বুঝি জড়ো হয়েছে এক তোমাদেরই সামনে! আসলে মুরোদ নেই তাই বল। কিংবা এইসব ভড়ং দেখিয়ে কিছু টাকা খিঁচে নেবার মতলব। টাকাটা হাতিয়েছে, এখন কেটে পড়ছে।

সুকুমার জানে, ধ্রুব জানে, এখন পিছিয়ে পড়লে বাঙালীদের মুখ থেকেই এই কথা শুনতে হবে। বাঙালী অদ্ভুত জাত। নগদ বিদায় ছাড়া আর-কিছু বুঝতে চায় না। সফল হও, তোমাকে মাথায় তুলে নাচব। গলা চিরে তোমার জয়ধ্বনি দেব। জয়ের মালা পরিয়ে তোমার আগাপাছতলা ঢেকে দেব। কিন্তু যদি ব্যর্থ হও, তা হলে যে হাতে মালা পরাতাম, সেই হাতেই কাদা ছুঁড়ব। মাউণ্টেনীয়ারিং সম্পর্কে খোঁজ-খবর যাঁরা রাখেন সেই দু-পাঁচজন ছাড়া আর কে তাদের এ কথা বিশ্বাস করবে যে, ভাল সাজ-সরঞ্জাম পেল না বলেই ওরা যেতে পারছে না? না, ওরা কাউকেই কোন

কথা বলার সুযোগ দেবে না।

অতএব, যা পাচ্ছ তাই নাও। তাই নিয়েই এগিয়ে চল। যা হয় হবে। এই হল ওদের নীতি। তাই যে জিনিস হাতের কাছে পেল, তাই ওরা নিয়ে নিল। যা পেল, কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করল। যা পেল না তা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে এল।

হোটেলে ফিরে শুনল, ইনস্টিটিউট থেকে টেলিফোন এসেছিল। ওদের খুব খুঁজছেন ওঁরা। একটু পরেই আবার টেলিফোন এল।

—হ্যালো, রায়?

—হ্যাঁ।

—আমি ইনস্টিটিউট থেকে বলছি।

—বলুন।

সুকুমার অতি-পরিচিত একটা গলা শুনতে পেল।

—হ্যালো রায়?

—বলুন।

—দেখ, কিছু মনে কোর না, তোমরা ইনস্টিটিউটের ছাত্র, তোমাদের ভালবাসি তাই বলছি, এবারে এতবড় ঝুঁকিটা তোমরা নাই বা নিলে। জ্ঞান সিং এবং তেনজিং—দুজনেরই ধারণা, তোমরা যে কাজ করতে যাচ্ছ, তোমাদের যোগ্যতার তুলনায় তা অনেক বড়। জ্ঞান সিংয়ের ধারণা তোমরা একটা অঘটন ঘটাবে। তেনজিংয়ের ধারণা, তার ফলে ভারতীয় পর্বতারোহণ বেশ বড় রকমের চোট খেতে পারে। তাই আমি বলি কী, ওঁদের উপদেশটা না হয় এবারের মত মানলেই। কেমন?

সুকুমার বুঝতে পারল এ স্বরে আন্তরিকতার অভাব নেই। তবু জবাব দিল না।

—হ্যালো, রায়?

—বলুন।

—কী, কথাটা বুঝি মনঃপূত হল না?

সুকুমার নিরুত্তর।

—হ্যালো, হ্যালো রায়?

—বলুন।

—জ্ঞান সিং তোমাদের উৎসাহ দেখে খুশীই হয়েছেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা এবারে ট্রেকিং কর। তার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম ইনস্টিটিউট তোমাদের দিতে রাজী আছে। তারপর তুমি অ্যাড্‌ভান্স কোর্সে ট্রেনিং নাও। তখন পুরো একটা এক্‌স্‌পিডিশনের নেতৃত্ব কোর। আমার মনে হয়, জ্ঞান সিংয়ের পরামর্শ গ্রহণ করাই তোমার উচিত।

সুকুমার হাঁ-না কিছুই বলল না।

—হ্যালো হ্যালো হ্যালো। রায়?

—আমি ভেবে দেখব।

—হ্যালো, তুমি এক কাজ কর না। কাল সকালে এসে ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে দেখা কর না একবার। আমার মনে হয়, উনি খুশীই হবেন।

—আচ্ছা, চেষ্টা করব।

কিন্তু ইনস্টিটিউটে যাবার কোন প্রয়োজন ওরা আর বোধ করল না। কী হবে শুধু শুধু কতকগুলো উপদেশ শুনে! আর উপদেশ ছাড়া ব্রিগেডিয়ার আর-কিছু দিতে পারবেন না, সে তো নিশ্চিত। সে উপদেশ তো ওরা মান্যও করতে পারবে না। চার হাজার টাকার জিনিস এরই মধ্যে কেনা হয়ে গিয়েছে। সাত শো টাকা [illegible] গ্রম

দেওয়া হয়ে গিয়েছে শেরপাদের। এই টাকা ওরা হাত পেতে নিয়েছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র কাছ থেকে একটিমাত্র অঙ্গীকারে।

কী, পারবেন তো?—অশোকবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সুকুমার বলেছিল, প্রাণপণ চেষ্টা করব।

সে কথার খেলাপ করা বুঝি সুকুমারের নিজেরও সাধ্য নেই। জ্ঞান সিং বলছেন, আগে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর, তারপর পাহাড়ে উঠো। হিলারি ওদের বলেছেন, পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা পাহাড়ে উঠে-উঠেই সঞ্চয় করতে হয়। উপদেশ শুনতে হলে ওরা হিলারির উপদেশই শুনবে।

তাই পরদিন ওরা আর ইনস্টিটিউটে গেল না, সটান কলকাতায় চলে এল।

॥ উনিশ ॥

২৯শে আগস্ট সুকুমার আর ধ্রুব দার্জিলিঙের কাজ সেরে কলকাতায় এসে পৌঁছাল। কিছু সরঞ্জাম তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে। সকাল সাড়ে সাতটায় ওরা তুনসুঙ বস্তিতে গিয়ে হানা দিত। রোজ। বিকাল চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত চলত অন্বেষণ। কার ঘরে কী আছে, খুঁজে দেখ, নিয়ে এস।

এমনি করে, একটা একটা করে জিনিস খুঁটে ছজনের পার্সোন্যাল কিট্ কোনমতে যোগাড় হল। কোনমতে মানে যা প্রয়োজন তাও পুরো পাওয়া গেল না। বাড়তি মোজা, দস্তানা তাও পাওয়া গেল না। পাহাড়ে চড়ার হাতিয়ার যা পাওয়া গেল, তার কথা না বলাই ভাল। নাইলনের দড়ি মাত্র চারটে পাওয়া গেল। ক্যারাবিনা মিলল মাত্র বারোটা, শিলং একটা। আর একটা মাত্র হাই-অলটিচ্যুড তাঁবু কিনতে পারল।

যা পেল, কলকাতায় এনে হাজির করল। এসে দেখে হাজারটা কাজ তাদের অপেক্ষায় পড়ে আছে। বহু প্রতিষ্ঠান ওদের চিঠির জবাব দিয়েছে। সাধ্যমত জিনিস দিতে চেয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে আনতে হবে, বহু জিনিস কিনতে হবে, তৈরি করিয়ে নিতে হবে এমন জিনিসের সংখ্যাও কম নয়। অথচ পুরো এক মাস সময়ও হাতে নেই।

কলকাতায় ফিরে আসামাত্র ওরা জানতে পারল, ওদের সহযাত্রীর সংখ্যা দুজন বাড়বে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাঁদের একজন রিপোর্টার এবং ফোটোগ্রাফারকে ওদের সঙ্গে পাঠাবেন। তাঁদের জন্যও সাজ-সরঞ্জাম চাই। ব্যবস্থা করতে হবে।

সব থেকে ওরা সমস্যায় পড়ল মালগুলো নিয়ে। এসব এখন রাখে কোথায়? ধ্রুবর দাদার প্রেস-ঘর, আশুতোষের স্ট্যাচু আর চৌরঙ্গীপাড়ার রেস্তোরাঁ, এই তিন জায়গায় ছিল ওদের হেড অফিস। প্রেস-ঘরে তিল ধরার জায়গা নেই। আশুতোষের স্ট্যাচু কিংবা রেস্তোরাঁ মাল গুদামের পক্ষে সুষ্ঠু জায়গা বলে ওদের কারোরই মনে ধরল না।

ধ্রুব বলল, "তবে চল, কপাল ঠুকে 'আনন্দবাজারে'র কাছেই আবার যাই। বলি, একটা জায়গা ঠিক করে দিন, মাল এনে তুলি।"

সুকুমার আর ধ্রুব 'আনন্দবাজারে' আসতেই সে ব্যবস্থা হয়ে গেল। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে নিজেদের গুদামের দুখানা ঘর ছেড়ে দিলেন ওঁরা।

সুবলবাবু বললেন, "এস সুকুমার, আলাপ করিয়ে দিই।"

ওঁর ঘরে বসা নাদুস-নুদুস এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, "এই আমাদের রিপোর্টার, গৌরকিশোর ঘোষ, যে তোমাদের সঙ্গে যাবে। আর এ হচ্ছে সুকুমার, ও ধ্রুব।"

রিপোর্টার ভদ্রলোক ওদেরকে বেশ ভাল করে দেখে নিলেন। যেন জরীপ করলেন ওদের। মুখ দেখে বুঝা গেল না, পছন্দ হল কি না!

তারপর বললেন, "প্রথমে শুনেছিলাম এক জোড়া ভেড়া আপনাদের সঙ্গে যাবে। পরে শুনলাম যাচ্ছে এক জোড়া সাংবাদিক। ভেড়ার বিকল্প সাংবাদিকের চাইতে আর ভাল কিছু পেলেন না বুঝি?"

এমন একটা আচমকা প্রশ্নে সুকুমার একটু থতমত খেয়ে বলল, "না, না, ভেড়াও তো যাবে।"

"যাবে। যাক, ভেড়ার শূন্য স্থান পূর্ণ করবার দায়িত্ব থেকে সাংবাদিকরা রেহাই পাবেন, এতেই আশ্বস্ত হলাম। হ্যাঁ, আপনাদের টীমে তো প্রায় সব রকম লোকই আছে দেখলাম, কিন্তু মেডিকেল অফিসার তো দেখছিনে? কী ব্যাপার?"

সুকুমার আর ধ্রুব মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তাই তো, এ কথা তো মনে পড়ে নি।

তবু ধ্রুব বলল, "আবার মেডিকেল অফিসার কেন?"

রিপোর্টার বললেন, "নইলে বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ শহীদরা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে যে সত্যিই শহীদ হয়েছেন তার প্রমাণ দাখিল করবে কে?"

একটু থেমে তিনি বললেন, "দেখুন মশাই, আমার হাজার তিনেক টাকার অফিস-বীমা আছে। সত্যি বলতে কী, আর অনর্থক প্রিমিয়াম না টেনে টাকাটা জলদি জলদি স্ত্রীকে পাইয়ে দেব বলেই আপনাদের সঙ্গী হচ্ছি। কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট দাখিল করতে না পারলে সে টাকা তো নমিনির হাতে পেঁছিবে না। যদি গুরুর কৃপায় সত্যিই তেমন কিছু ঘটে নন্দাঘুণ্টিতে, শেষ ঘণ্টা কারও যদি বেজেই ওঠে, তবে মেডিকেল অফিসার ছাড়া তার ডেথ সার্টিফিকেট ইসু করবে কে?"

কোথাও কিছু নেই, একেবারে ডেথ সার্টিফিকেট লেখবার সমস্যায় ফেলে দিলেন ভদ্রলোক। আচ্ছা যা হোক। কিন্তু কথাটা যেভাবেই বলে থাকুন তিনি, 'ডেথ সার্টি-ফিকেট' কথাটা গিয়ে ওদের দুজনকেই ঘা দিল। বেশ ভাবিত হল ওরা। এবং এটাও ওদের এখন মনে হতে লাগল, ডাক্তার না থাকায় দলটা যথেষ্ট যেন শক্তিশালী হচ্ছে না।

নাঃ, ডাক্তার একজন চাই। দুজনেই একমত হল। কিন্তু তেমন ডাক্তার পাবে কোথায়? কোন্ ডাক্তার ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হবেন? তেমন ডাক্তারের সন্ধানই বা ওদের কে দেবে? সুকুমারের হঠাৎ মনে পড়ল ডাঃ ভোসের কথা। চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের স্ত্রী-রোগবিশেষজ্ঞ ডাঃ লোকনাথ ভোস। সুকুমারের সঙ্গে বেশ ভালই আলাপ আছে। তাঁর কাছে ধর্না দিতে তিনি তাঁরই এক তরুণ সহকর্মী ডাঃ অরুণ-কুমার করকে ঠিক করে দিলেন। মেডিকেল অফিসারের সমস্যা মিটল, কিন্তু আর এক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ডাক্তারের পর্বতারোহণের সরঞ্জাম পাওয়া যাবে কেমন করে? ওরা অতি কষ্টে মাত্র ছয়জনের সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পেরেছে। এখন আরও তিনজনের সরঞ্জাম চাই।

ঠিক হল আবার একজনকে দার্জিলিঙে পাঠাবে ওরা।

এদিকে কাজের চাপে চোখে ওরা অন্ধকার দেখতে লাগল। আর কাজ কি একটা? কাজ কি এক রকমের? রসদ নিতে হবে। কতজনের? কতদিনের? পরিমাণ কী? ভাল জানে না কেউ। হিসেব কষতে বসলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। রসদ যত বাড়ে, তা বইবার জন্য লোক তত বাড়ে। আবার লোক যত বাড়ে তার জন্য রসদের হিসেবও বেড়ে যায়। আবার লোক বাড়াতে হয়। ওদের প্রথমে হিসেব ছিল, কুড়িজন মালবাহক নেবে। তারই ভিত্তিতে আঠার হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছিল। সাজ-সরঞ্জাম কিনতে গিয়ে সে বাজেট কবে ফেঁসে গেছে। এখন মালবাহকের হিসেব কষতে গিয়ে

বুঝল, ভরাডুবি ছাড়া গতি নেই। হু-হু করে মালবাহকের সংখ্যা বাড়ছে, তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ...তাও বুঝি পার হয়ে যায়।

এতদিনে ধ্রুব বুঝল, বাজেট রচনার নামে কী ছেলেখেলা করেছে সে! বাজেটের অঙ্ক দ্বিগুণ ছাপিয়ে গেল। তবু থামছে না। টাকার অঙ্ক স্ফীত হয়েই চলেছে। তবু সে ঠাঁই পাচ্ছে না। তাও তো প্রচুর টাকার জিনিস কিনতে হচ্ছে না। অমনিই দিচ্ছে লোকে তাঁদের উৎসাহ দেবার জন্য।

দিলীপের পাড়ার পৌরপ্রতিনিধি কেষ্ট বসাক ভারত সেবক সমাজের পক্ষ থেকে জানালেন, চাল ডাল আটা ছাতু, যা লাগবে তাঁরা তা চাঁদা করে বড়বাজার থেকে তুলে দেবেন। বিশ্বদেবের কোম্পানি জানালেন এফার থার্মাস বোতল দেবেন। দুটো পেট্রোম্যাক্স বাতি দেবেন। জগন্নাথ কোলে বললেন, বিস্কুট, টফি, যা লাগে আমি দেব। ওদের হাল্কা ওয়াটারপ্রুফ দরকার, তাঁবুর উপর ওয়াটারপ্রুফের আচ্ছাদন দরকার। ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রিসকে ওরা লিখল, এর জন্য বিশেষ ধরনের অ্যালকাথিন শীট তাঁরা তৈরি করে দিতে পারবেন কি না! পারলে দাম কিছু কম নিতে পারবেন কি না! কালবিলম্ব না করে আই-সি-আই ওদের দেখা করতে বললেন। কী ধরনের অ্যালকাথিন চাই, কত গজ চাই? ওরা ১২০ গজ চাইল। সঙ্গে সঙ্গে আই-সি-আই ১২০ গজ অ্যালকাথিন প্রথম বাঙালী পর্বতারোহণ অভিযানকে উপহার দিয়ে দিলেন। ব্রুক বন্ড কোম্পানি উপহার দিলেন কুড়ি পাউণ্ড উৎকৃষ্ট কফি, ডায়ারমিকিন রম, ইম্পিরিয়াল টোবাকো দিলেন প্রচুর সিগারেট। ফিলিপস্ কোম্পানি দিলেন একটা ব্যাটারি সেট রেডিও। ছোট-বড় দেশী-বিলাতী প্রায় তিরিশটে কোম্পানি নানা জিনিস দিয়ে ওদের সাহায্য করলেন।

ওদের সব থেকে প্রয়োজন ছিল মাউণ্টেনীয়ারিং বুটের। বাটা কোম্পানি দশ জোড়া জঙ্গলবুট অর্ধমূল্যে উপহার দিলেন।

জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে ওদের নাওয়া-খাওয়া ঘুচে গেল। অফিস মাথায় উঠল। ওরা চর্কির মত শুধু ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এই সময় কাজ দেখাল দিলীপ। দলের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র দিলীপই চাকরি করে না। বড়বাজারে ওদের ব্যবসা আছে। তাই ওকে হাতের কাছে সব সময় পাওয়া গেল।

বড়বাজার থেকে চাল আটা চিনি পাওয়া যাবে। দিলীপ ছুটল সেখানে। লাল শালু কিনতে হবে, পথচিহ্ন রাখার পতাকা বানাবার জন্য। দিলীপ শালু কিনল। পতাকা বানাতে দিয়ে এল। টিনের খাবার কিনতে হবে দিলীপ। দিলীপ কলকাতা চষে বেড়াতে লাগল। দিলীপ অ্যালুমিনিয়ামের থালা চাই, ওয়াটার বটল চাই, খন্তা চাই. মাংস কাটা ছুরি চাই, মেটা ফুয়েল চাই দিলীপ। কলাই-করা মগ আসে নি দিলীপ। গ্রাণ্ট স্ট্রীটে পোশাক তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে, কই. পোশাক তো এল না দিলীপ!

যত পুরনো জিনিস বেচার দোকান আছে কলকাতায় দিলীপ খুঁজে খুঁজে তা বের করল। ডিসপোজালের মাল হাতড়ে হাতড়ে কোন জায়গা থেকে বের করল ত্রিশটি মিলিটারী কিট ব্যাগ, কোনখান থেকে বের করল চারটে পুরনো কম্পাস। দুটো বেলচা, গোটা কতক স্কাউট ছুরি, ডজনখানেক স্নো-গগল্স্। ধ্রুব আর দিলীপ মালগুলো ঘাড়ে করে বড়বাজারের গোলোক ধাঁধা থেকে বেরিয়ে ব্র্যাবোর্ন রোডে পড়তেই দিলীপ পছন্দসই দুটো ত্রিপল পেল। কিনে ফেলল। ঘাড়ে উঠল ত্রিপল। ধ্রুবর ঘাড় ভেঙে পড়ে আর কী! দিলীপের ভ্রূক্ষেপ নেই। গন্ধমাদন ঘাড়ে চাপিয়ে

অক্লেশে এগিয়ে চলেছে। বেলা সাড়ে বারটা। গরমে ঘামে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। চীনে-বাজারে ঢুকতেই দুটো মনোমত প্রেসার কুকার পাওয়া গেল।

—নিয়ে নাও ধ্রুব।

—নেবটা কোথায়?

—এস না, বগলের ফাঁকে একটা করে নিয়ে নিই। এর জন্য আবার আসতে হবে? আর সময়ই বা কই!

অতএব বগলে উঠল প্রেসার কুকার। যাক, শেষ ফাঁকটাও ভরে গেছে। এবারে অন্তত নিশ্চিন্ত। এ দেহে মাল আর উঠবে কোথায়?

—ধ্রুব, ওই দেখ এনামেলের মগ। এস, নিয়ে নিই।

—আর নেব কোথায় দিলীপ?

—দেখই না, কী করি?

দরদাম করে আঠারোটা মগ কেনা হল। দিলীপ মগগুলো দিয়ে দুটো মালা বানিয়ে একটা ধ্রুবর গলায় পরিয়ে, আর-একটা নিজে পরে ফেলল।

তারপর একগাল অমায়িক হেসে বলল, "সওদা মন্দ হল না, কী বল? এবার চল বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে যাওয়া যাক।

বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িটায় ঢুকে ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এইবার ওদের ঘরে ঢুকে ওরা পাখা খুলে নিশ্চিন্ত মনে করল। হাত-পা মেলে জিরিয়ে নেবে কিছুক্ষণ। তারপর যাবে। এতক্ষণ পরে ক্ষিধের কথা মনে পড়ল ওদের। ভোর সাতটায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, এখন প্রায় দুটো। চা ছাড়া পেটে আর-কিছু পড়ে নি। ঘর দুটো জিনিসপত্রে কেমন তাড়াতাড়ি ভরে উঠছে। পাখা খুলে দিয়ে বসেছে দুজনে, এমন সময় ডাক এল। টেলিফোনে ডাকছে ওদের।

'আনন্দবাজার' থেকে টেলিফোন এসেছে। ওরা জিনিসপত্র আনবার জন্য যে গাড়ি চেয়েছিল তা পাওয়া গেছে দু-তিন ঘণ্টার জন্য। এক্ষুনি এসে যেন ওরা গাড়ি নিয়ে নেয়। টেলিফোন রেখে ধ্রুব দিলীপের মুখের দিকে চাইল। দিলীপ হাসল।

বলল, "চেয়ে দেখছ কী? এক্ষুনি চল। গাড়িখানা হাতছাড়া হয়ে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।"

ধ্রুব আর কথা বলল না। ওদের গায়ের ঘাম তখনও শুকোয় নি। ওরা ক্লান্ত শরীরটাকে ধাক্কা দিয়েই যেন পথে বের করে দিল।

॥ কুড়ি ॥

আর সময় নেই। সময় নেই। কলকাতায় এখনও প্রচুর কাজ বাকী। অথচ একজনকে আবার দার্জিলিঙে যেতে হবে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারের পোশাক চাই, ডাক্তারের সরঞ্জাম চাই। কিনতে হবে। কিন্তু কে যায় দার্জিলিঙ? ধ্রুব বা সুকুমারের পক্ষে অসম্ভব। নিমাই, বিশ্বদেবও যেতে পারবে না। সুরানা বোলপুরে, মদন চিত্তরঞ্জনে। কে যাবে দার্জিলিঙে এক দিলীপ ছাড়া! দিলীপই গেল।

কদিন পরে দিলীপ যখন ফিরে এল কলকাতায়, তখন জানা গেল ওর অসামান্য চাতুর্যে এক মস্ত বড় দুশ্চিন্তা কেটে গেছে। হাই অলটিচ্যুড তাঁবুর সমস্যার সমাধান ও প্রায় ভেল্কি দেখিয়েই করে ফেলেছে। বিরাট একটা হাল্কা তাঁবু দার্জিলিঙের দেবগণের খোদ দপ্তর থেকেই বাগিয়ে এনেছে দিলীপ।

আরও কয়েকটা ভাল খবর আনল দিলীপ। অন্নপূর্ণা-অভিযানখ্যাত শেরপা আজীবাকে হয়তো দলে পাওয়া যাবে। পাওয়া গেছে নরবুকে। আঙ ফুতার, দা তেম্বা আর গুণদিন আসবে বলে ও শুনে এসেছে। আর দিলীপ নিজে ঠিক করে এসেছে টাসীকে। দিলীপের ধারণা টাসী খুবই কাজে আসবে।

দিলীপ জানাল, আর মাত্র দু সেট সরঞ্জাম সে সংগ্রহ করতে পেরেছে 'আনন্দবাজারে'র রিপোর্টার আর ফোটোগ্রাফারের জন্য। তাদের দলের জন্য আর-এক সেট সরঞ্জাম পাওয়া যায় নি।

ওরা তো মাথায় হাত দিল। এখন উপায়? ডাক্তারকে নিয়ে ওদের দলে লোক হল সাতজন। অথচ সরঞ্জাম আছে ছয়জনের। এখন উপায়?

আরও একটা মারাত্মক খবর দিল দিলীপ। নন্দাঘুণ্টি অভিযানে কোন শেরপা যাতে না যায়, শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। এমন কথাও বলা হচ্ছে, ওদের সঙ্গে যদি যাও, তা হলে ভবিষ্যতে অ্যাসোসিয়েশনের কোন সাহায্য পাবে না তোমরা। এতে কেউ কেউ ভয় পেয়ে গেছে। আবার শেরপা ক্লাইম্বার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকেরাও বলছেন, এই অভিযান কোন অথরাইজ্‌ড্‌ অভিযান নয়। ওরা তোমাদের টাকা মেরে দিয়ে পালাবে। তোমাদের চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবে এই "নন্দাঘাতীওয়ালারা"। তখন পস্তাবে তোমরা।

দিলীপ বলল, "শেরপারা বলল, আমাদের বিরুদ্ধে এমনিধারা প্রচার চালানো হচ্ছে দার্জিলিঙে।"

নিমাই বলল, "এ এক অদ্ভুত অভিযান ঘাড়ে চাপল সুকুমার। যদি কোন কারণে বিফল হই, তা হলে আর মুখ দেখানো যাবে না। যার সঙ্গে দেখা হবে, সেই বলবে—কেমন বলেছিলাম কি না?"

কিন্তু সুকুমার এ কথা ভাবছিল না, এখন তার মাথায় অন্য সমস্যা চেপেছে। সাতজন অভিযাত্রী, ছয় সেট সরঞ্জাম। এখন এর সমাধান কী? এমন সামান্যমাত্রও বাড়তি সরঞ্জাম ওদের নেই, যা দিয়ে আর-এক জনকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে। বাড়তি তো দূরের কথা, এই যে কয় সেট সরঞ্জাম ওরা সংগ্রহ করেছে তার মধ্যেও বহু জিনিস ঘাটতি আছে। সু-কভার সকলের জন্য যোগাড় করতে পারা যায় নি। চামড়ার দস্তানারও সেই অবস্থা। শ্লিপিং ব্যাগ ভিতরেরটা পেল, বাইরেরটা সংগ্রহই করতে পারল না। দু-একটা এয়ার ম্যাট্রেস দেখে ওদের মনে হল, সেটা যেন পসারহীন গেঁয়ো ডাক্তারের সাইকেল চাকার তাপ্পিমারা টিউব। এই রকম জিনিস কিনে ওরা ছয় সেট সরঞ্জাম কোনমতে গুছিয়েছে, এখন আবার একজন লোক বেড়ে গেল—ডাক্তার।

আগে ওরা ডাক্তারের কথা চিন্তাই করে নি। কিন্তু এখন ডাক্তার ছাড়া অভিযানের কথাই ওরা চিন্তা করতে পারছে না। না, ডাক্তারকে বাদ দেওয়া যেতেই পারে না। তবে কাকে বাদ দেওয়া যায়? কার জায়গায় ডাক্তারকে ঢোকানো যায়?

ধ্রুবকে সমস্যার কথা বলল সুকুমার। সুকুমার এদের কাউকেই পাহাড়ে চড়তে দেখে নি। কাজেই দক্ষতার প্রশ্ন তুলল না। সে সকলকেই ফুল মার্ক দিয়ে রাখল। এবার সে তার সহযাত্রীদের মেজাজ স্বভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। এদিক থেকেও কোন তারতম্য বের করতে পারল না। ধরেই নিল ছয়জনেরই এসব গুণাগুণ প্রায় সমান।

ধ্রুব বলল, "একজনকে বাদ দিতেই হবে সুকুমার। হয় ডাক্তারকে, নয় কোন এক ক্লাইম্বারকে। ডাক্তারকে বাদ দিলে টীমের যত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা, ক্লাইম্বারকে বাদ দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা তার চাইতে কম।"

সুকুমার বলল, "সে কথা আমিও ভেবেছি। কিন্তু বাদ দেব কাকে? যাকে বাদ দেব, সে কী ভাববে?"

ধ্রুব বলল, "তুমি লীডার। সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে।"

অবশেষে অনেক চিন্তার পর শেষকিরণ সুরানাকে এবারের মত বাদ দেবার সিদ্ধান্ত ওরা গ্রহণ করল। আর এই সিদ্ধান্তে ওরা কেউই সুখী হতে পারল না। সুরানার কথা ভেবে ওরা খুবই দুঃখিত হল। সুরানা খুব উৎসাহী ছেলে। ওর শারীরিক গঠনও পর্বতারোহণের খুব উপযোগী। ওকে বাদ দেওয়াতে দলের খানিকটা অঙ্গহানিও হল। তবু ওকে বাদ দিতেই হল। উপায় কী? সুরানা মাছ-মাংস খায় না। নিরামিষাশী। ওদের মত একটা অভিযানের পক্ষে ট্রেকিং এবং আরোহণকালে দুটো কিচেনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। সাত সেট সরঞ্জাম যোগাড় করতে পারলে এই অসুবিধা এত বড় করে ওরা দেখত কি না সন্দেহ, (যদিও এটা বেশ বড় ঝামেলা) তবে এখন যেহেতু আর-কোন বিকল্প নেই তাই এই ভেবেই ওরা মনকে প্রবোধ দিল।

ডাঃ অরুণকুমার কর স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেন নি যে, তাঁকে আবার পাহাড় চড়তে যেতে হবে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে প্রসূতি-বিজ্ঞানে হাত পাকাচ্ছিলেন, হঠাৎ জুটে গেলেন অভিযানে।

ডাঃ কর যখন এদের দলে যোগ দিলেন তখন এদের যাত্রা করতে আর দশ দিন মাত্র বাকী। সুকুমার জানিয়ে দিল, তাঁর যা যা লাগবে, তা তাঁকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। তাঁদের হাতে টাকা পয়সা বেশী নেই। কেনাকাটা বিশেষ কিছু করা যাবে না।

ডাঃ করের মাথায়, সত্য বলতে কী, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পর্বতারোহণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কী ওষুধ লাগবে সেখানে, কী কী এখান থেকে নিতে হবে, তাই জানেন না। ধ্রুব ডাক্তারের অবস্থা বুঝতে পারল। সে চার্লস ইভান্সের কাঞ্চনজঙ্ঘা বইখানা ডাঃ করকে এনে দিল। তারই পরিশিষ্টে একটা তালিকা দেওয়া আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের বৃটিশ অভিযাত্রীদল কী কী ওষুধ নিয়েছিলেন, তারই এক তালিকা।

তালিকা দেখে তো ডাঃ করের চক্ষুস্থির। এত ওষুধ লাগে! এত ওষুধ নিতে হবে? যোগাড় হবে কী করে? কিন্তু অমিত উৎসাহী এই তরুণ ডাক্তারটি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, সাত দিনের মধ্যে সব ওষুধ যোগাড় করে।

ডাক্তার করের ডায়েরিতে লেখা আছে সে কাহিনীঃ

"মেডিসিন যোগাড় করার ভার ছিল আমার উপর। সামান্য কিছু অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি আর ওষুধ কেনা ছাড়া সবই প্রায় যোগাড় করেছিলাম বিনামূল্যে এবং সাত দিনে। সেবাসদনের ইমারজেন্সিতে বসে বসে ওষুধ কোম্পানিতে টেলিফোন করতাম। তাঁরা দেখা করতে বলতেন। যেতাম আর ওষুধ নিয়ে ফিরতাম। এমনি করে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার ওষুধ যোগাড় করেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। বিশেষ করে র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া (টি সি এফ প্রোডাক্টস), গ্লাক্সো ল্যাবরেটরিস এবং দে'জ মেডিক্যাল— এঁদের অকৃপণ দান আমি ভুলতে পারবো না।"

গ্ল্যাক্সো লেবরেটরিসের মিঃ পলসন, দে'জ মেডিকেলের শ্রীভূপেন দে ওষুধ দিলেন আর সেই সঙ্গে প্রচুর উৎসাহ। র‍্যালিজ ইণ্ডিয়ার বিদেশী সেই ম্যানেজারটির কথা ভুলবেন না কখনও হয়তো ডাঃ কর। অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, অনেক উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সুন্দর প্যাকিং করে পুরো এক পেটি ওষুধ পাঠিয়ে-

ছিলেন। ডাঃ কর যা চেয়েছিলেন, তিনি তার ঢের বেশী দিয়েছিলেন। ডাঃ কর বিস্মিত হচ্ছেন দেখে একগাল হেসে বলেছিলেন, ইয়ংম্যান, তুমি নতুন। এক্‌স্‌পিডিশনে কোন্‌ মেডিসিন কত লাগে, তুমি জানবে কী করে? যা দিচ্ছি টেক ইট।

"It is a very small donation by us to you. If it gives any help to you, we shall be much obliged. Hope you will succeed."

এ লোককে কি ভোলা যায়! আর-একটি অদ্ভুত লোক আর-একটি বিলাতী ওষুধ কোম্পানির সেই সাহেবটি। সব শুনে তিনি বললেন, বুঝলাম, তোমরা পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছ, মহৎ কাজ করতে যাচ্ছ। কিন্তু এটা বুঝলাম না, "হোয়াই সুড উই ডোনেট?" তার জন্য আমরা খয়রাত করব কেন? এ কথায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ডাঃ কর। ওকে আমতা-আমতা করতে দেখে সাহেব হেসে ফেললেন। বললেন, এ কথার কোন জবাব নেই জানি। অলরাইট। টেক হোয়াট ইউ লাইক। কিন্তু খবরদার, এ কথা কাউকে বলো না। এমন কী, কৃতজ্ঞতা স্বীকার পর্যন্ত করবার দরকার নেই। বুঝলে। জাস্ট ফরগেট ইট।

—কেন সাহেব? আমরা তো অকৃতজ্ঞ নই। কাগজে আমরা ডোনারদের নাম ছাপব।

—খবরদার না, খবরদার না। সাহেব লাফিয়ে উঠলেন: তোমরা কাগজে নাম ছাপ আর আমার ঘরে দলে দলে এক্‌স্‌পিডিশন ঢুকুক। ডোনেশন দিতে দিতে কোম্পানি তারপরে লালবাতি জ্বালুক আর কী!

॥ একুশ ॥

ওদের যাত্রার দিন হু-হু করে এগিয়ে আসছে। আর পুরো সাত দিনও হাতে নেই। কিন্তু কী সর্বনাশ, এখনও যে প্রচুর কাজ বাকী। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ঘর দুখানা রকমারি জিনিসে ভরে গেছে। রোজই মাল আসছে। কিন্তু কী সর্বনাশ, এখনও যে প্রচুর জিনিস আনা বাকী। আর কবে আসবে, কে আনবে জিনিসগুলো?

আই-সি-আই-এর অফিস থেকে অ্যালকাথিনের ফিল্মটা এখনও এসে পৌঁছাল না। ওয়াটারপ্রুফ গাত্রাবরণ তৈরি করতে হবে। আর কবে হবে? ধ্রুব, প্লিজ, ওদিকটা দেখ। অবশেষে এল অ্যালকাথিনের থান। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আই-সি-আই-এর মিঃ কর নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন মাল। কিন্তু বিস্কুট কই? কোলে কোম্পানি বিস্কুট দেবে। এখনও এসে পৌঁছাল না? ওহে নিমাই, কোয়ার্টার মাস্টার, ব্যাপার কী? কোলে কোম্পানির কাছে দৌড়ায় নিমাই। খালি হাতে ফিরে আসে। কী ব্যাপার নিমাই? বিস্কুট কই? নিমাই গম্ভীরভাবে বলে, বিস্কুট তো রেডি। কোথায় বিস্কুট? নিমাই তেমনিভাবেই জবাব দেয়, কোম্পানির ঘরে। কেন? ভাল র‍্যাপিং পেপার পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলা দেশের ছেলেরা পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছে, যে সে কাগজ দিয়ে তো আর বিস্কুট প্যাক করে দেওয়া যায় না। কলকাতার বাজার কোলে কোম্পানি কাগজ খুঁজতে চষে বেড়াচ্ছে। যাচ্চলে, এদিকে আর সব প্যাকিং যে আটকে গেল। তার কী? অবশেষে কোলে বিস্কুটও পাওয়া গেল। ওরা চেয়েছিল পঞ্চাশ পাউন্ড। কোম্পানি ওদের উপহার দিল প্রায় আশি পাউন্ড বিস্কুট আর প্রচুর টফি। আর সত্যিই সে এমন প্যাকিং, খুলতে গেলে হাত ব্যথা হয়ে যায়।

ওরা কজন একদণ্ড বসতে পারছে না সুস্থির হয়ে। ভোরের আলো না ফুটতে বেরিয়ে পড়ে ওরা, টো-টো করে ঘোরে, জিনিসপত্র আনতে। এক ফাঁকে অফিসের হাজরে বজায় রেখে আসে। আবার জিনিস জিনিস করে পাগলের মত ছুটাছুটি করে।

রাত বারোটা-একটায় বাড়ি ফেরে। খাওয়া-দাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। ওদের ওজন কিছু কিছু কমে গেল।

এখনও তো আসল কাজ বাকী। জিনিসগুলো সর্ট করা হয় নি। কোন্ কোন্ জিনিস বেস্ ক্যাম্পের জন্য লাগবে, কোন্ জিনিস উপরে যাবে, সেগুলো বাছ-বাছাই হয়ে ওঠে নি এখনও। প্রথমে এসব জিনিস বাছাই করতে হবে, তারপরে ঠিক সেই-ভাবে প্যাক করতে হবে। কাজ আশি জনের, লোক ওরা ছয়জন। পারবে কেন সামলাতে? সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল অমিতাভ দাশগুপ্ত, এলেন আর-একজন হিমালয়প্রেমিক—গোষ্ঠীপতিবাবু। যদিও সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ, তবুও লোকবল যে বাড়ল, ওরা এতেই খুশী।

দার্জিলিঙ থেকে খবর এল, শেরপা আজীবাকে পাওয়া গেছে। তাঁর ছুটির সমস্যা মিটেছে। তবে শরীরটা তাঁর ভাল নেই। জানা গেল, সর্দার আঙ শেরিং আর আজীবা দিন চারেক আগেই কলকাতায় এসে পেঁছবেন। অন্যেরা কাটিহার-লখনউ হয়ে সোজা পিপুলকোটি চলে যাবে। সেখানেই এদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের।

এর মধ্যে ওদের ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাঃ কর নিজেই পরীক্ষা করলেন। ডাঃ করের দিনলিপিতে এ সম্পর্কে লেখা আছে:

> আমাদের যাত্রার আর সপ্তাহখানেক বাকী। অভিযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল। বলতে বাধা নেই প্রত্যেক সহযাত্রীরই কোন-না-কোন রোগ পাওয়া গেল। তবে কোনটাই খুব মারাত্মক রকমের নয়। তাই বাতিল করলাম না কাউকেই। সমস্যায় পড়েছিলাম একমাত্র গৌরকিশোর ঘোষকে নিয়ে। পরীক্ষায় দেখা গেল, তাঁর রক্তচাপের আধিক্য আছে। এবং সেটা বহুদিনের। বয়সেও তিনি আমাদের চেয়ে কিছু প্রবীণ। ওজনে আমার দ্বিগুণ। থপথপে চেহারা। উচিত ছিল তাঁকে বাতিল করা। কিন্তু তাঁর অসম্ভব দৃঢ় মনোবলের কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হল। এ লোককে বাতিল করা যায় না। দলের ম্যানেজার শ্রীধ্রুব মজুমদারের সমস্যা শ্রীঘোষের সমস্যার বিপরীত। তিনি একটু অতি-মাত্রায় ক্ষীণকায়। এঁই অল্প ওজন সম্বল করে পর্বতে তিনি সাবলীলভাবে চলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ থাকল। তবে আমাকে অবাক করেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ফোটোগ্রাফার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ। দলের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। একান্ন বছর বয়েস, কিন্তু তাঁর ফিটনেস দেখে মনে হয়, তিনি এখনও তরুণ, ইয়ংম্যান অব ফিফটিওয়ান।

যাত্রার চার-পাঁচ দিন আগে সর্দার আঙ শেরিং আর শেরপা আজীবা কলকাতায় এসে হাজির হলেন। ওঁদের মালপত্রের প্যাকিং তখনও শুরু হয় নি। আজীবা অসুখ থেকে উঠে এসেছেন। দেহে তখনও বল আসে নি। তবুও আসামাত্র কাজে লেগে গেলেন আজীবা। রান্না করার জন্য যেসব বাসনপত্র কেনা হয়েছিল, তার কিছু কিছু তাঁর পছন্দ হল না।

—বদল লো সব। ইসমে কাম নেহি চলেগা।

আজীবা দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে বের হল। ঘুরে ঘুরে পছন্দমাফিক জিনিস কিনে আনল। রোপ ল্যাডার (দড়ির মই) তৈরি করতে দিয়েছিল ওরা। দেশী কারিগরকে অনেক বক্তৃতা-টক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, জিনিসটা আদতে কী? বিদেশীরা দড়ির মই তৈরী করে নাইলনের দড়ি আর অ্যালুমিনিয়মের রড্ দিয়ে। তাতে জিনিসটা যেমন মজবুত, তেমনি হাল্কা হয়। ওরা এখানে নাইলনের দড়িই

বা পাবে কোথায় আর অ্যালুমিনিয়মের রডই বা ওদের কে বানিয়ে দেবে? তাই ওরা ঠিক করেছিল, ম্যানিলার পোক্ত দড়ি আর হাল্কা অথচ মজবুত কাঠ দিয়ে দড়ির মই বানাবে। সেইভাবেই কারিগর জিনিসটা বানালে। ওরা ডেলিভারি নিতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দুজনে টেনে তুলতে পারে না, এমন ভারী। সর্বনাশ, এ-মই বইবে কে? অনেক মাথা খাটিয়ে ওরা কিছুটা ওজন কমাবার পরামর্শ দিয়ে এল। তবু যা থাকল, তাও ঢের।

সোয়েটার সকলের জন্য যোগাড় করতে পারা যায় নি দার্জিলিঙে। কলকাতার বাজার তোলপাড় করেও প্রয়োজনীয় সোয়েটার পাওয়া গেল না। এমন কী, পর্বতা-রোহণের উপযুক্ত মোজাও ওরা যোগাড় করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, হরিদ্বার অথবা দেরাদুন থেকে ওগুলো কিনে নেবে।

এবারে আর-একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মালবাহকের সমস্যা। যা মাল এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, তার ওজন প্রায় ষাট মণে দাঁড়াবে। তবু তো সব মাল এসে পৌঁছয় নি। যতই কাটছাট করুক, ষাটজন মালবাহকের কম হলে তো চলবে না। এত লোক যোগাড় করা সোজা কথা নয়।

সর্দার আঙ শেরিং আর মদন বললে, ওঁরা দুদিনের পথ এগিয়ে যাবেন। চমৌলি, পিপুলকোটি অথবা যোশীমঠ—যেখান থেকে হোক অন্তত ষাটজন মালবাহক ওরা নিযুক্ত করবেন। আর একজন অভিজ্ঞ গাইডও ওঁদের খুঁজে বের করতে হবে।

এর মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে এক সাংবাদিক বৈঠক হল। সাংবাদিকরা অন্তর থেকে এই নবীন অভিযাত্রীদের শুভকামনা জানালেন। ফিল্ম ডিভিশন ছবি তুলে নিয়ে গেল। সম্বর্ধনা জানানো হল ওদের দু-তিন জায়গায়। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অফিসে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ওঁদের সম্বর্ধনা জানালেন। আঙ শেরিং আর মদন রওনা দিলেন হরিদ্বার অভিমুখে। নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলের অ্যাডভান্স পার্টি রওনা হয়ে গেল। তবু ওদের প্যাকিং শেষ হল না।

দু রাত আর দু দিন সমানে প্যাক করে ধ্রুব, দিলীপ, নিমাই, বিশ্বদেব যখন বাড়ির দিকে রওনা দিল তখন ওদের ট্রেন ছাড়তে আর দশটি ঘণ্টাও বাকী নেই। সকলেই কিছু-না-কিছু সাহায্য করেছে, তবু প্যাকিংয়ের কাজ করতে হয়েছে দিলীপ আর আজীবাকেই।

ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে অবসন্ন দেহটা কোনমতে টেনে নিয়ে দিলীপ বাড়ি ফিরল। ওর প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছিল। শরীরটা এলিয়ে দেবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছিল। কিন্তু সে না পারল ঘুমাতে, না পারল বিশ্রাম নিতে। মালগুলো পৌঁছাতে হবে হাওড়ায়। লাগেজ ভ্যানে বুক করাতে হবে। কাজ অজস্র বাকী রয়েছে এখনও। বাড়ির কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারল না।

দিলীপের মাথায় তখন এক চিন্তা ঘুরছে। কিছু ফেলে তো গেল না! কোন দরকারী জিনিস তো পড়ে থাকল না!

২৫শে সেপ্টেম্বর। পঞ্চমী। আগামীকাল দেবীর বোধন। পুজোর ছুটি হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে লোকের ভিড়ে আর জায়গা নেই। ছুটি কাটাতে সবাই বাইরে ছুটেছে। এই ভিড়ে নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদলও মিশে গেছে। প্রত্যেক সদস্যেরই আত্মীয়স্বজন এসেছেন। এসেছেন বন্ধুর দল, শুভানুধ্যায়ীরা। ফেস্টুন, ফোটোগ্রাফার, রিপোর্টার। মায়েদের শঙ্কাব্যাকুল মুখ, বন্ধুদের সহর্ষ পিঠচাপড়ানি।

এ সম্পর্কে ধ্রুব লিখেছে :

হাওড়া স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনায় রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সত্যি

বলতে কী, আমার জীবনে এ-আস্বাদ আমার এই প্রথম। ট্রেন আসার বহু আগে থেকেই আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুবান্ধবের দল এসে স্টেশনে ভিড় করেছেন। ওদিকে গাড়ীর প্যাসেঞ্জার, তাদের লটবহর, বিদায়-জানাবার লোক। সেই ভিড়ে বোঝার উপায় নেই, কারা আমাদের জন্য এসেছেন, আর কারা অন্য-দের জন্য। ফলে সর্বঘটে একটি বিরাট বিশৃঙ্খলা। যাঁরা আমাদের জন্য এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মালা, মুখে অফুরন্ত উৎসাহবাক্য। কত যে ফ্লাশ বাল্‌ব্‌ জ্বলছে ক্যামেরার, তার বুঝি হিসেব নেই। এই আমার হাত ধরে একজন হ্যাঁচকা টান মেরে ওধারে নিয়ে গেলেন। আমার গলায় ঝপাঝপ মালা পড়ল। শুনলাম, "বাঙালীর ছেলের এই তো কাজ, বেশ বেশ। মুখ রাখবেন মশাই।" মুহূর্তে আবার আর-এক হ্যাঁচকা টানে আর এক ধারে চলে গেলাম। কিছু বোঝবার আগেই কানে ঢুকল, "এদিকে তাকান, স্মাইল প্লিজ, থ্যাংক য়ু।" ফস্‌ করে ক্যামেরার বাল্‌বের তীব্র ফ্লাশে চোখে ধাঁ-ধা লাগল। বাড়ির লোক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা উৎসাহের এই দাপট দেখে এক কোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর অসহায়ভাবে দেখতে লাগলেন; আমাদের নিয়ে কী লোফালুফিটাই না চলেছে! এর মাঝখানে হঠাৎ হুড়মুড় করে ট্রেনখানা এসে পড়ল। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি, জয়ধ্বনি আর প্রচণ্ড গোলমালের সঙ্গে মিলে-মিশে আমরাও একাকার হয়ে গেলাম। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় তবু মালগুলোর উপর নজর রেখেছিলাম। আর বুঝি পারি নে। একবার দেখলাম আজীবা (বেচারী আজীবা) চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মালের কাছে। পরমুহূর্তেই দেখলাম, একদল 'ভলান্টিয়ার' (কোথাকার ভলান্টিয়ার, কে তাদের পাঠালে, ঈশ্বর জানেন) আমাদের মালগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের একজনকেও আমি চিনি নে। ছুটে এগিয়ে আসছি মালের দিকে, হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে হুমড়ি খেয়ে অন্য দিকে ছিটকে পড়লাম। "এই যে আর-একজন নন্দাঘুণ্টি দাদা, দে পেঁচো মালাটা দিয়ে দে। নইলে আবার পেইলে যাবে মাইরি।" কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, একটা বিরাট ভিজে মালা ঝপ করে আমার গলায় এসে পড়ল। জামা-কাপড় নোংরা হয়ে গেল। চোখের সামনে সিনেমার হিরোর মত উত্তম-ছাঁট দেওয়া একখানা মুখ চকিতে দাঁত বের করল। "আপনারা দাদা বাংলার নবীন যৌবনের দূত।" ওদের হাত ছাড়িয়ে এসেই ভলান্টিয়ারদের ধরলাম। কী করছেন, কী করছেন বলতে না বলতেই, আমি বাধা দেবার আগেই, দেখলাম ওঁরা আমাদের মোটগুলো তুলে "নন্দাঘুণ্টি মায়ীকি জয়" বলে একটা রেল-কামরার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন। আমার ভয় হল, এই ডামাডোলে আমাদের রুকস্যাক আর কিটব্যাগ না পাখা মেলে উড়ে যায়। আমি হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম!

ওরা শুধু ঘাবড়েই যায় নি, সত্যি বলতে কী, যথেষ্ট পরিমাণে অভিভূতও হয়ে পড়েছিল। একটু বা গর্বিতও। এত লোক, মালা, অভিনন্দন, ফোটো তোলা—সব ওদের ঘিরে। অখ্যাত অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল যারা তাদের নিয়ে এত টানাটানি। আর কত সব বিশিষ্ট লোকের আগমন হয়েছে স্টেশনে! প্রখ্যাত প্রবোধকুমার সান্যাল এসেছেন ওদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে। এসেছেন অশোককুমার সরকার।

সমস্ত হাওড়া স্টেশন যেন একটা নূতন রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে ওদের সামনে। এত লোক ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এত হৃদয়ে ওদের জন্য স্নেহ-ভালবাসা রয়েছে! দলে দলে লোক আসছে। কেউ জড়িয়ে ধরছে বুকে। কেউ ঝাঁকানি মারছেন হাতে। কেউ

পিঠে দিচ্ছেন থাপ্পড়। কেউ অটোগ্রাফের খাতায় সই চাইছেন।

আর ওই যে সমস্ত গোলমাল, হৈ-চৈ, উৎসাহ-উদ্দীপনার বড় বড় ঢেউয়ের পাশ কাটিয়ে, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অভিযাত্রীদের স্বজন-পরিজনেরা। মুখে তাঁদের হাসি, চোখে জল। আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা, হে ঈশ্বর, এদের রক্ষা কর। নীরবে উপদেশ দিয়ে চলেছেন : দেখে শুনে সাবধানে চল, গোয়ার্তুমি কর না। ভালয় ভালয় ফিরে এস।

কাজের চাপে এতদিন ওরা ব্যস্ত ছিল, বাড়িতে দু দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে নি। মা-বাবা, মাসি-পিসি, বোন, কারও সঙ্গে কথা বলার ফুরসতও পায় নি। স্টেশনে এসে শেষ সময়ে কাছে দাঁড়াবে—তাও পারল না। ওরা বুঝতে পারছে, কী আশঙ্কায় ওদের বুক দুরুদুরু করছে। বুঝতে পারছিল, কিছুক্ষণ ওঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওঁরা একটু সান্ত্বনা পেতেন। কিন্তু সুযোগ কোথায়?

অশোকবাবু সুকুমারের হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা বাঁধা একটা তুষার-গাঁইতি তুলে দিলেন। সুকুমারের বুকটা কেঁপে উঠল। জয়ধ্বনি হল। এক ভদ্রলোক মাঙ্গলিকের চিহ্নস্বরূপ গোটা কতক নারকেল ওদের হাতে তুলে দিলেন। জয়ধ্বনি হল। গার্ড সিটি দিলেন। ইঞ্জিন হুইশিল দিল। ট্রেন ছাড়ল।

॥ বাইশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

২৭শে সেপ্টেম্বর। হরিদ্বার এসে পেঁছেছি। ট্রেন অনেক লেট ছিল। সারা পথ গাড়ির লোক খাওয়ার কষ্টে ভুগেছে। একে পুজোর ভিড়, তায় হরিদ্বার-জনতা এক্সপ্রেস। গাড়িখানার যেন মা-বাপ নেই। এ-গাড়ির যাত্রীরা যেন সব অনাহূত। অন্তত রেল কোম্পানির ব্যবহার দেখলে তাই মনে হয়। আগে এই লাইনে খাবার কষ্ট কেউ কখনও ভোগ করে নি। কতবার তো এ-পথে যাতায়াত করেছি। তখন কেলনার কোম্পানি ছিল, বল্লভদাস ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। যাত্রীরা গাড়িতে বসে থাকতেন। খাবারওয়ালারা তাঁদের কাছে খাবার নিয়ে আসত। এখন সরকার কেটারিংয়ের ভার গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ। কোন স্টেশনে খাবারওয়ালা গাড়ির কছে এসেছে বলে তো মনে পড়ে না। এখন খাবার সংগ্রহের জন্য যাত্রীদেরই ছুটতে হয়। তার উপর গাড়িখানা যাচ্ছেও বড় বেয়াড়া টাইমে। স্টেশনের কেটারিংয়ের ভাঁড়ারে যা কিছু খাবার ছিল আগের গাড়িখানার যাত্রীরা তা নাকি সাবড়ে দিয়ে গেছে। কাজেই আমাদের বেলায় অষ্টরম্ভা।

আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার নিমাই আর সহ-নেতা বিশ্বদেবকে ধন্যবাদ। ওঁদের দুজনের 'দস্যুবৃত্তি'র জন্যই আমাদের হরিমটর চিবিয়ে থাকতে হয় নি। কোনক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে।

হাওড়া স্টেশনের সম্বর্ধনার হট্টগোলের মধ্যে বাবার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারি নি। প্রায় দশসেরী এক মালার ঘায়ে আমার সত্যিই প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা হয়েছিল। মালার ধারাল মোটা তারের খোঁচায় আমার ঘাড় ফুটো হয়ে গিয়েছিল।

পরে দেখি, সম্বর্ধনার গুতোয় সকলেই লবেজান। বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি নি, এরাও তাই। ঘ্যান ঘ্যান করছিল। সান্ত্বনা দিয়ে

বললাম, এখন তো দুঃখ করলে চলবে না ভাই। তোমরা এতদিন আপন আপন মাতার সন্তান ছিলে। সেটা প্রাইভেট প্রপার্টি। তাই কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করে নি। কিন্তু এই নন্দাঘুণ্টি অ্যাফেয়ারে মাথা গলিয়ে তোমরা হয়েছ বঙ্গমাতার সন্তান। এখন তোমরা পাবলিক প্রপার্টি। লোকেরা তোমাদের নিয়ে যা-ইচ্ছে তা করবে। ধ্রুব বলল, সেটা একদিনেই টের পেয়ে গেছি দাদা। ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি।

সত্যি বলতে কী, আমার হিংসে হচ্ছিল আজীবাকে দেখে। ওকে নিয়ে টানা-টানি করার কেউ ছিল না বলে ও দিব্যি বেঁচে গেছে। ওখানে একদিকে অভিযাত্রীদের নিয়ে যখন টানাটানি চলেছে ছবি তোলার জন্য, তখন হঠাৎ দেখি, কারা আমাদের মালগুলো গাড়ির কামরার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। আজীবাকে ডেকে বললাম, তুমি মালের কাছে দাঁড়িয়ে থাক আজীবা, নইলে কোথায় কোন্‌টা চলে যাবে। আজীবা বলল, আচ্ছা। আমি কামরার ভিতরে এসে ঢুকলাম। যথা-শক্তি মালগুলোকে এক দিকে জড় করার চেষ্টা করলাম। তবু মাল দু দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা অনেক চেষ্টা করেও কামরা রিজার্ভ করতে পারি নি। পারলে আমাদের মাথাব্যথা অনেক কমে যেত। বীরেনদা, দিলীপ—ওদের সঙ্গে দামী দামী সব ক্যামেরা ছিল। সেগুলোকে চোখে চোখে রাখা সত্যিই কষ্টকর। রিজার্ভ কামরার ব্যবস্থা ঈস্টার্ন রেল করে দিতে পারলেন না। রেলওয়ে কনসেশান, সিঙ্গল ফেয়ার ডবল জার্নি, তার ব্যবস্থাও হল না। রেলকর্তৃপক্ষের কেউ আইন আউড়ে বললেন, অথরাইজড্ প্রতিষ্ঠান ছাড়া এ কনসেশান দেওয়া যায় না। আপনাদের নন্দাঘুণ্টি ক্লাব তো অথরাইজড্ নয়। বিনীতভাবে জানিয়ে-ছিলাম, আজ্ঞে নন্দাঘুণ্টি ক্লাব নয়, ওটা একটা এক্‌স্‌পিডিশন। বাঙালী পর্বতা-রোহীদের প্রথম অভিযান। তিনি বললেন, দেখুন, আপনারা বড় প্রাদেশিক। সব ব্যাপারে বাঙালী বাঙালী করা বাঙালীদের একটা বদভ্যাস। এই জন্যই তো সবাই আপনাদের উপর হস্টাইল হয়ে যায়। আরে মশাই, প্রভিনসিয়ালিজ্‌ম্ পরিহার করুন, সে, উই আর ইণ্ডিয়ান্‌স্। বললাম, আজ্ঞে বলব। আমাদের রেলওয়ে কনসেশানটা—। বাধা দিয়ে তিনি বললেন, ওটার জন্য রেলওয়ে বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করুন। আচ্ছা, আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আর-একজন অফিসার চোখ টিপে বললেন, শুনলাম, 'আনন্দবাজার' ফাইন্যান্স করছে। তবে আর ভাবনা কী? আই থিঙ্ক, 'আনন্দবাজার' ইস সলভেণ্ট এনাফ টু পে দি ফুল ফেয়ার। শেষ পর্যন্ত জনসংযোগ অফিসের দ্বারস্থ হলাম। ২৫শে সেপ্টেম্বর হরিদ্বার-জনতা এক্সপ্রেসে দশটা শিলপিং অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানালাম। ওইদিন যদি যাত্রা করতে না পারি, তবে অভিযান ভেস্তে যাবে, এমন আশঙ্কা ছিল, তাই আমরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। পূর্ব রেলের জনসংযোগ বিভাগের কোন অফিসারস্থানীয় ব্যক্তি অনেকক্ষণ ভেবে একটা মোক্ষম উপায় বাতলে দিলেন। বললেন, যা পুজোর ভিড়, দু-তিন দিন আগে থেকে লাইনে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আপনারা সফল হোন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন, এই কামনা করি।

শেষ পর্যন্ত সাধারণ একজন রেলকর্মচারী কী কৌশলে যে এই অসাধ্য সাধন করলেন, আমাদের কজনের জন্য শিলপিং বার্থে সীট যোগাড় করে দিলেন তা তিনিই জানেন। তাঁর নাম আমি জানি নে, দিলীপ জানে, দিলীপেরই বন্ধু তিনি। গাড়ির অবস্থার কথা বিবেচনা করে, মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।

শ্লিপিং কামরার দুই প্রান্তে আমাদের সীট পড়েছিল। এক পাশে আমি আর আজীবা, অন্য প্রান্তে আর সবাই স্থান নিয়েছিলাম।

আমার দুটো দুশ্চিন্তা। একটা পায়ের, একটা মাথার। কলকাতার শান-বাঁধানো ফুটপাথে ভারি মাউণ্টেনীয়ারিং বুটজোড়া ট্রায়াল দেবার জন্য, ওই জুতো পরে আমি আমাদের যাত্রার দিন দুই আগে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ফোস্কা। সে ফোস্কা রীতিমত এক ক্ষত সৃষ্টি করল। ট্রেনে ডাক্তারকে ক্ষতটা দেখালাম। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, ভাবনার কিছু নেই, পায়ের ঘা পায়ে সেরে যাওয়াই বেস্ট। কাজেই একটা ভাবনা তক্ষুনি গেল। গেল না মাথার ভাবনাটা। তার কারণও ছিল।

যখন ঠিক হল, আমি এঁদের সঙ্গে যাব, সেই সময় একদিন নিউজ এডিটারের ঘর থেকে আমার ডাক এল। ঘরে ঢুকেই দেখি, শ্রদ্ধেয় এক হিমালয়-প্রেমিক লেখক। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ওহে তুমি পাহাড়ে যাচ্ছ? দেখি, তোমার হাঁটু দেখি। বলেই আমার হাঁটু টিপতে লাগলেন। আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তিনি বললেন, যাচ্ছ যাও। তবে সাবধান, তোমার হাঁটু রসস্থ। প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, বরফে যা ঠাণ্ডা, এক লাইন যদি লিখতে পার, বুঝব বড় বাহাদুর। তার উপর যদি তুষার-ঝড়ের পাল্লায় পড়, তবে তো আর দেখতে হবে না। নাকটি খসে পড়বে। মুখের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।। তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

এই ভয়াবহ পরিণতি রাত দিন আমাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। ট্রেনের মধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখলাম। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ভেঙে রস গড়িয়ে পড়ছে। আর তুষার-মানবরা সেই রস খেয়ে বলছে, আরে এ যে ফার্স্ট কেলাস খেজুর রস। এ-জিনিস অনেকদিন খাই নি। নে, ও হাঁটুটাও ভাঙ্। সে হাঁটুটা বাঁচাতে দৌড়ে পালাচ্ছি। তুষার-ঝড়ে আমার নাকটি খসে পড়ল। ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঘুম ভেঙে দেখি, গাড়ির দোলানিতে ওয়াটার বোটল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে আমার হাঁটু ভিজে গেছে। হাঁটু ফিরে পেয়েও আমার ভয় গেল না। আজীবা সেই গুমোট গরমে শ্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। ও-প্রান্ত থেকে বড়দার (বীরেন্দ্র সিংহ) গানের আওয়াজ পেলাম। "জয় শিব শংকর, জয় ত্রিপুরারি......।" ওদিকে গিয়ে বসলাম।

বারানসী স্টেশনে একাশী বছরের এক বৃদ্ধ আমাদের আশীর্বাদ করে গেলেন। বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল সুকুমারকে দিলেন। তিনি সারাদিন উপোস করে বিশ্বনাথের পুজো দিয়েছেন। বেশ বৃষ্টি পড়ছে এখানে। লখনউয়েও আমরা বৃষ্টি পেলাম। সেখানকার বাঙালীরাও এসেছিলেন সম্বর্ধনা জানাতে।

হরিদ্বার স্টেশনেও আবার আমাদের শুভকামনা জানানো হল। জানালেন কলকাতার পৌরসভার কাউন্সিলার শ্রীসুশীল রায়, বিখ্যাত স্পোর্টস রিপোর্টার শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য। আরও ক'টি চেনা মুখের দেখা পেলাম। এঁরা কলকাতা থেকে একই ট্রেনে এসেছেন। যাবেন কেদার-বদরি।

ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানির এজেণ্ট স্টেশনেই দেখা করলেন। হোটেলের ঠিকানা নিয়ে গেলেন। মালবাহকদের জন্য সিগারেট দিয়ে যাবেন। কলকাতার অফিস থেকে নির্দেশ এসেছে।

আঙ শেরিং আর মদনের খোঁজ করা হল। কোন খবর পাওয়া গেল না। অন্য শেরপারা এসেছে কি না, জানা গেল না। ধ্রুব আর নিমাই আজই ঋষিকেশ

চলে গেল। পিপলকোটি যাবার জন্য বাস ভাড়া করবে ওখান থেকে।
আমরা আগামীকাল ঋষিকেশ রওনা হব।

॥ তেইশ ॥

মদন ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। বারোটার গেটে ঋষিকেশ থেকে যে বাসগুলো আসবে, তার কোন একটাতে ওরা যদি না আসে, তবে মদন যে কী করবে, তা বুঝে উঠতে পারছিল না। ও ছটফট করতে লাগল। ধর্মশালার পাকা যে ঘরখানা বাগিয়েছে মদন তার পার্টির এক রাত্রের বিশ্রামের জন্য, সেই ঘরখানা দোতলায়। বেশ পরিষ্কার। নোংরা নেই। মাছিও নেই। একেবারে নতুন বাড়ি। বারান্দায় এসে একবার দাঁড়াল মদন। পিপলকোটির ভিউটা মন্দ পাওয়া গেল না। ধ্যাত্তোরি ভিউ! মদন বিরক্ত হল।

সামনের রাস্তা দিয়ে একপাল ভেড়া চলেছে। গোটা কতক ভুটিয়া মেয়ে পিঠে বোঝা চাপিয়ে শিস্ দিতে দিতে ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ধুলো উড়ছে। পিপলকোটির বাস-স্ট্যাণ্ডে সার সার বহু চকচকে মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। নেপালের রাজমাতা বদ্রীনাথ দর্শনে গেলেন। ঘণ্টা দুয়েক আগে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। বিরাট পার্টি। সত্তর-পঁচাত্তর জন মালবাহকই গেছে রাজমাতার পার্টিতে। এই গাড়িগুলো তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে---এই এখন মদন যেমন অপেক্ষা করছে তাদের পার্টির জন্য।

পাঁচজন শেরপা কাল সন্ধ্যাবেলাতেই এসে পৌঁছে গেছে। বাকী শুধু কলকাতা-ওয়ালারা। তাদেরও তো কালই এসে পৌঁছানোর কথা ছিল। কেন এল না, কে জানে? মদন অস্থির হয়ে উঠল। শেরপারা রান্নার যোগাড় করছে। ফাঁকে ফাঁকে তাস খেলছে। সর্দার আঙ শেরিং বাজারের দিকে ঘুরতে গেছে। মদন শুধু ছটফট করছে। একবার ঘরের ভিতর গেল। বিছানায় গিয়ে বসল। শুয়ে পড়ল। ভাল লাগল না। উঠে এসে আবার বারান্দায় দাঁড়াল। তারপর কী মনে করে, বাজারের দিকে বেরিয়ে গেল মদন। এগিয়ে গেল বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে।

মদন আর আঙ শেরিং দুদিন আগে পিপলকোটি এসে পৌঁছেছে। ২৬শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যাবেলা। হরিদ্বারে এসে কয়েকটা ঘাঁটিতে ওরা খোঁজখবর নিয়েছিল। শুনল, যাত্রীর সিজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেপ্টেম্বরের হিড়িকটাই শেষ। এপ্রিল মাস থেকেই কেদারবদরি তীর্থের যাত্রীদের মরশুম শুরু হয়। তখন সেইসব যাত্রীর মোট বইবার জন্য দক্ষিণ নেপাল থেকে প্রচুর মালবাহক আসে। ওরা যাত্রীদের মালই শুধু বয় না, অশক্ত বা আয়েসী যাত্রীদেরও বহন করে ডাণ্ডি বা কাণ্ডিতে। অক্টোবরের গোড়া থেকেই মালবাহকেরা সারা মরশুমের কামাই নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

হরিদ্বারে ওরা শুনল, মালবাহকরা একজন দুজন করে নেমে আসতে শুরু করেছে। মদন তখনই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ঋষিকেশে এসে সর্দার আঙ শেরিং খোঁজখবর নিয়ে জানল, মালবাহকরা কিছু কিছু করে নামতে শুরু করলেও, উপরে এখনও অনেক লোক আছে। মালবাহকের অভাব ওদের হবে না। তা ছাড়া, মাল বইবার জন্য খচ্চর-বাহিনীও পাওয়া যাবে। মদন একটু আশ্বস্ত হল।

মালবাহকরা হল অভিযানের প্রাণ। এত মাল নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে বেস্ ক্যাম্পে। তবে তো অভিযান শুরু হবে। আর মদনের উপর এই দায়িত্বটি এসে

চেপেছে। এ দিকটা সম্পর্কে মদনের ধারণা নেই বললেই চলে। তবু বন্ধুরা যখন তার ঘাড়ে দায়িত্বটি চাপিয়েই দিল, তখন মদন আর কোনরকম গাঁইগুঁই করল না। সে স্বভাবও অবশ্য নয় তার।

ঋষিকেশ থেকে পিপুলকোটি যাবার পথে যে ঘাঁটিতেই ওদের বাস থেমেছে সেইখানেই নেমে মদন আর আঙ শেরিং জনে জনে মালবাহকের খবর নিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগে ওদের সঙ্গে সদ্য-নেমে-আসা কয়েকজন মালবাহকের সাক্ষাৎ হল। ওরা আর ফিরে যেতে রাজি হল না। তবে ওরাও জানাল, উপরে এখনও অনেক লোক আছে। আর, ওরা সেই সঙ্গে এমন আর-একটি সংবাদ দিল, যাতে ওদের দুর্ভাবনা আরও বেড়ে গেল। ওরা শুনল, নেপালের রাজমাতা ঠিক এই সময়েই বদ্রীনারায়ণ যাচ্ছেন। তাঁর পার্টির জন্য প্রচুর মালবাহক নিয়োগ করা হয়েছে। রাজমাতা এক মাস বদ্রীনারায়ণে থাকবেন। তার মধ্যে একটি লোককেও তিনি ছাড়বেন না। মদনের তো বুক দুরদুর করতে লাগল। পাওয়া যাবে তো মালবাহক?

চামোলিতে গিয়ে শুনল, রাষ্ট্রপতি বদ্রীনাথে আসছেন। প্রায় ওই একই সময়ে। যেটুকু আশা মদনের মনে জেগে উঠেছিল, এই খবরটা পাবার পর তাও যেন এক ফুৎকারে নিবে গেল। সর্বনাশ করেছে! মদন ভাবল। একে অফ্ সিজন, তার উপর নেপালের রাজমাতা, তারও উপর আবার খোদ রাষ্ট্রপতি। দু পাশে রাজরাজড়া আর তার মাঝখানে উলুখাগড়া শ্রীমান মদন মণ্ডল—নন্দাঘুণ্টি অভিযানের ট্রান্সপোর্ট অফিসার।

চামোলিতে, বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই গোটা কতক মালবাহককে ঘোরাফেরা করতে দেখেই মদন তাদের পাকড়াও করলে। মদনের আবেগময়ী এক ভাষণে ওরা এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে, মদন ভাবল ওরা ভজে গেছে।

দ্বিগুণ উৎসাহে মদন ওর ভাষণের দ্বিতীয় কিস্তি শুরু করে দিল: এই এক্স্পিডিশান কা উপর অনেক কিছু ডিপেণ্ড করতা হ্যায়। তুমলোগ নেই যানেসে এই এক্স্পিডিশান কা ভরাডুবি হো যায়েগা সিওর। বিদেশী লোগ আকে আকে হামারা দেশকা পাহাড়মে চড়তা হ্যায় আর হামলোগ খালি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতা হ্যায়। হামারা দেশকা, জাতিকা, ইজ্জৎ অ্যাণ্ড প্রেস্টিজ্ বাঢ়ানেকা লিয়ে হামলোগ এক্স্পিডিশান মে যাতা হ্যায়। তুমলোগ নেহি যানেসে কেইসে হোগা।

মদনের তৃতীয় কিস্তি ভাষণ শোনার আগেই ওরা কথা দিয়ে ফেলল, ওরা যাবে। পরদিন পিপুলকোটিতে গিয়ে দেখা করবে সাহেবের সঙ্গে। মদন এখন একটু ভাল বোধ করল।

মদন আর আঙ শেরিং পিপুলকোটি পেঁছে দেখল, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও। রেস্ট হাউস রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে। রাজমাতা উঠেছেন। ডাকবাংলো ভর্তি। রাজমাতার পার্টি। শেষ পর্যন্ত কালিকমলিওয়ালার ধর্মশালায় ওরা একটু জায়গা পেল। ওরা দুজন না হয় ধর্মশালায় উঠল। কিন্তু শেরপারা এসে উঠবে কোথায়? কলকাতার পার্টি, ওই বিপুল মাল, ওদের জায়গা হবে কোথায়? মদন ভাবনায় পড়ল। রাত থাকতে ঋষিকেশে বাসে উঠেছিল। সারাদিন উদ্বেগ আর জার্নির ধকল মন্দ যায় নি। কিন্তু মদন সে সব গ্রাহ্য করল না।

আঙ শেরিংকে জিনিসপত্রের পাহারায় রেখে প্রথম রাত্রির অন্ধকারে মদন সেই অপরিচিত শহরে বেরিয়ে পড়ল। মালবাহকের সন্ধান চাই। ওদের জন্য থাকবার জায়গা চাই। রাত প্রায় আটটা বাজে। বাজারের কাছে জনকয়েক মালবাহকের সঙ্গে দেখা। মদন ওদের পাকড়ালে।

ওরা বললে, "আমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বল।"

—"কে তোমাদের সর্দার? যাও তাকে ডেকে আন।"

একটু পরে ওরা একজন রোগা লম্বা বয়স্ক এক লোককে ধরে নিয়ে এল। দেশী মদের গন্ধে মদনের গা পাক দিয়ে উঠল।

একজন বললে, "হুজুর, এই হচ্ছে শের সিং। আমাদের মেট্। এর সঙ্গে কথা বল।"

শের সিং টলতে টলতে বললে, "রাম রাম, গুড্ মর্নিং, হুজুর।"

শের সিং জানাল, মালবাহক পাওয়া যাবে।

মদন বলল, "একটা থাকবার জায়গা চাই আমাদের। ঠিক করে দিতে হবে সর্দার।"

—"জরুর্। আভি দেগা হুজুর। শের সিং হুজুরকে লিয়ে সব কুছ কর শক্তা হ্যায়।"

মদনের সঙ্গে শের সিং কালিকমলিতে গেল। তারপর মালপত্র নিয়ে মদন আর আঙ শেরিংকে ওর সঙ্গে যেতে বলল। শের সিংকে অনুসরণ করে অলিগলির মধ্যে একটা ঘরে গিয়ে উঠল। ঘরটা ছোট। ভাঙা। মানুষ সেখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারে না। আঙ শেরিং মদনের মুখের দিকে বোকার মত একবার চাইল।

মদন বলল, "এ ঘরে থাকা যাবে না।"

দ্বিরুক্তি না করে শের সিং বলল, "ঠিক হ্যায়, ত চলিয়ে হুজুর, দুসরা মকান। আভি সরকারী মকান মে লে যায়েগা হুজুর।"

মদন এতক্ষণে বুঝতে পারল মাতালের পাল্লায় পড়া কাকে বলে। ওর আশঙ্কা হল, সারারাত না পিপুলকোটির রাস্তায় রাস্তায় কেটে যায়। তাই সরকারী মকানের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হল। ভাবল, ডাকবাংলোতেই নিয়ে যাবে বোধ হয়। কিন্তু কোথায় ডাকবাংলো? শের সিং ওদের পোস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। এখানে কী? মদনের চোখ কপালে উঠল।

শের সিং পোস্ট-মাস্টারকে ডেকে বললে, তার দুজন অতিথি এসেছে বিদেশ থেকে, এবং যেহেতু অতিথিদ্বয় বিশেষ সম্মান-ভাজন ব্যক্তি, তাই যেখানে সেখানে ওদের তোলা যায় না, তাই শের সিং ওর মান্যবর অতিথি দুজনকে নিয়ে পোস্ট-মাস্টারজীর ন্যায় বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আশ্রয়ে এসেছে। এখন পোস্ট-মাস্টারজী যদি অনুগ্রহ করে এ দুজনকে তাঁর এই প্রাসাদতুল্য পোস্ট অফিস ঘরের এক পাশে, যে পাশে পোস্টাল ব্যাগগুলো পড়ে আছে, ওইখানেই একটু ঠাঁই দেন আজ রাতের মত, তা হলে শের সিং পোস্ট-মাস্টারজীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

পোস্ট-মাস্টারজী একবার মদনকে আর আঙ শেরিংকে এবং পরক্ষণেই শের সিংকে দেখে নিলেন। তারপর বাক্যব্যয় বাহুল্য মনে করে, তর্জনী নেড়ে জায়গাটা ওদের দেখিয়ে দিলেন।

শের সিং খুশী হয়ে বললে, "ঠিক হ্যায়। আজ রাতকো ঠর্ যাও ইঁহা। কাল সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।"

শের সিং চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, সকালে ও সমস্ত কুলিদের এনে লিস্টি করে দেবে। হুজুর যেন ভাবনা-চিন্তা না করেন।

সেই যে চলে গেল শের সিং, আর তার পাত্তা নেই। কয়েকজন মালবাহক এসে ঘুরে গেল। তারাও শের সিংয়ের নাগাল পাচ্ছে না। হঠাৎ শের সিং উদয় হল। এসেই মদনকে বলল, হুজুরের জন্য ঘর ঠিক করে এসেছে সে। এখন হুজুর যদি দয়া করে মকানটা দেখে আসেন। মদন ওর সঙ্গে গিয়ে দেখল, না, বাড়িটা সত্যিই ভাল। এটাও একটা ধর্মশালা। নতুন তৈরি হয়েছে। মদন গোটা দোতলাটা নিয়ে নিল ব্যবস্থা করে।

শের সিং বলল, এখানে মালবাহকদের অ্যাসোসিয়েশন আছে। তার মারফতে মালবাহক নিয়োগ করলেই ভাল হবে। রেট্ ঠিক করাই আছে। হুজুর যদি অ্যাসোসিয়েশনকে একটা চিঠি লিখে দেন, ব্যস্, আমি দশটার মধ্যে সব লোক এনে হাজির করব। আমি শের সিং! হুজুরের জন্য সব কিছু করতে পারি।

দশটায় আসবে, বলে গিয়েছিল শের সিং। বলেছিল মালবাহকদের নিয়ে আসবে। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব মালবাহক? কোথায় বা শের সিং। অপেক্ষা করতে করতে বারোটা বাজল, একটা বাজল, রোদের তেজ কমে আসতে লাগল। বেলা পড়ে এল। কোথায় শের সিং? মদন যেন অথৈ জলে পড়ল। তার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আঙ শেরিংয়ের মুখও যেন শুকিয়ে এল। মালবাহক যদি সত্যিই পাওয়া না যায়?

আঙ শেরিংয়ের সঙ্গে পরামর্শে বসল মদন। আঙ শেরিংও শেষ পর্যন্ত বলল, শের সিং বোধ হয় কেটেই পড়ল। মালবাহক নিজেদেরই এখন সংগ্রহ করতে হবে। আঙ শেরিং বলল, "এখান থেকে 'মিউল' আমি সংগ্রহ করতে পারব। মণ্ডল সাব্, তুমি একজন লোক্যাল লোক নিয়ে খুব সকালেই গ্রামের দিকে বেরিয়ে যেয়ো। গ্রাম থেকে লোক আনতে হবে।" সাতাশে সেপ্টেম্বরের হতাশ রাত্রিটা যে কী করে কাটল, মদনই জানে।

আঠাশে সেপ্টেম্বর সকাল বেলাতে মদন আর আঙ শেরিং বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় মালবাহক অ্যাসোসিয়েশনের এজেন্ট এসে হাজির। কন্‌ট্রাক্‌ট্ ফরম এনেছে। টার্মস্ অ্যান্ড কণ্ডিশন্‌স্ জানাতে এসেছে। রেট্‌ও নিয়ে এসেছে। এখন সাহেবদের যদি পছন্দ হয় তো ফরমে সই কর। মালবাহক পাবে। মদনের বুকে ভরসা ফিরে এল। এদের টার্মস্ অ্যান্ড কণ্ডিশন্‌স্ মদনের মনোমতই হল। ওদের ফরমে সে সই করে দিল। সেই সঙ্গে মদন বুদ্ধি করে নিজেও একটা চুক্তিপত্র তৈরি করল। কোন মালবাহক যদি নির্দেশ অমান্য করে, শৃঙ্খলা ভাঙ্গে, অসদাচরণ করে, তবে তার জন্য অ্যাসোসিয়েশন দায়ী থাকবে। এজেন্ট এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলে।

বেলা চারটের মধ্যেই পঞ্চাশ জন মালবাহক সঙ্গে নিয়ে হাজির হল শের সিং। কিছু পরে আরও ষোল জনকে পাওয়া গেল। শের সিং হল এদের মেট্।

বেতন ছাড়াও এদের খোরাকি দিতে হবে। যতদূর পর্যন্ত লোকালয় থাকবে, খাদ্যবস্তু কিনতে পাওয়া যাবে, ততদূর পর্যন্ত ওদেরকে খোরাকি বাবদ নগদ টাকা দিতে হবে। লোকালয়ের নাগালের বাইরে যাবার পর খোরাকি বাবদ খাদ্যই দিতে হবে। ওরা বেস্ ক্যাম্প পর্যন্ত মাল বইবে, তার উপরে নয়। বরফে ওরা পা দেবে না। যেদিন ছুটি, বা মাল বইতে হবে না, সেদিন ওরা আধা বেতন পাবে।

মদন সব কাজ পাকা করে রাখল। সবাইকে বলে দিল, আজ সন্ধ্যেয় পার্টি এসে পৌঁছাবে। রাত্রে বাঁধাছাঁদা হবে। কাল ভোর বেলাতেই মার্চ শুরু হবে।

কিন্তু ২৮ তারিখের সন্ধ্যাবেলার গেটে কলকাতার পার্টি এসে পৌঁছাল না। মাল-বাহকরা যথাসময়ে উৎসাহসহকারে মালপত্র বাঁধাছাঁদা করতে এল। মদনকে বাধ্য হয়ে জানাতে হল, আগামীকাল মার্চ হবে না। পার্টি এসে পৌঁছায় নি। মালবাহকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। গাঁইগুঁই করতে লাগল ওদের একদিনের রোজগার নষ্ট হল বলে। যা হোক, মদনকে আবার লেকচার দিতে হল। মালবাহকেরা সেদিনের মত ফিরে গেল।

২৯ তারিখের সকাল বেলাতেই মালবাহকেরা দল বেঁধে মদনের কাছে হাজির হল। মদন বুঝল, হাওয়া সুবিধের নয়। মদন একগাল হাসি নিয়ে সবাইকে জয় হিন্দ্ বলে স্বাগত জানাল।

তার উত্তরে মালবাহকদের একজন গোমড়ামুখে বলল, "সাব্, তোমার অ্যাড্-ভান্স ফেরত নাও।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা সমর্থন জানাল, "হাঁ হাঁ, ওয়াপস্ লে লো।"

মদনকে অতর্কিতে এক ধাক্কা মেরে অতল গহ্বরে যেন ফেলে দিল ওরা। সেই শীতল আবহাওয়াতেও ওর মুখে চোখে ঘাম দেখা দিল।

—"অ্যাড্ভান্স ফেরত নিতে হবে? কেন?"

—"হমলোগ নেহি যায়েগা।"

একজন যেই বলল কথাটা, অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল, "নেহি যায়েগা।"

মদনের হৃদ্পিণ্ডে যেন আর স্পন্দন নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন বায়ু নেই। যাবে না এরা? যাবে না! সর্বনাশ, তা হলে উপায়? কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিল মদন। যাবে না! চালাকি পেয়েছে! তীরে এনে তরী ডোবাবে!

"যাবে না", মদন একটু ধমক দিল। "কেন?"

ওরা একটু থমকে গেল। একটুক্ষণ সব চুপ। তারপর একসঙ্গে সবাই কথা বলতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে মদন অসীম ধৈর্যে ওদের তালগোল-পাকানো বক্তব্য শুনল। প্রাণপণ চেষ্টায় যে অর্থ উদ্ধার করল তাতে সে বুঝল: কলকাতার পার্টি কাল না এসে পৌঁছানোর ফলে ওদের আজ "হল্ট্" করতে হচ্ছে। তার মানেই আজকের দিনটা পুরো লোকসান। এক পয়সাও মজুরি পাবে না ওরা।

ওরা বলল, "দেখ সাব্, খবর পেয়েছি আমাদের দেশে রাজা আসছেন। দেখব বলে নেমে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝপথ থেকে আমাদের ধরে এনে তোমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে। এখন দেখ আমাদের কি হাল হল। 'মার্চ' না হলে ত তোমরা টাকা দেবে না। তবে, আজ খাব কী?"

অ্যাসোসিয়েশনের এজেন্ট এসে মদনের সঙ্গে দেখা করল। বললে, "ওরা বিগড়ে গেলে মুশকিল। আপনি ওদের একটা করে টাকা মিষ্টি খেতে দিয়ে দিন। টাকা আমিই আপনাকে দিচ্ছি, যে টাকা অগ্রিম দিয়েছেন, তার থেকে। আপনার বাড়তি খরচ হবে না। আর ওদের বুঝিয়ে বলুন যে, আজ বারোটার গেটে পার্টি নিশ্চয়ই এসে যাবে।"

মদন আবার একটা দেশাত্মবোধক ভাষণ দিলে। এবারে ঝাড়া এক ঘণ্টা। যখন দেখল, কারও মুখ দিয়ে আর বাক্য সরছে না, তখন একটা করে টাকা ওদের হতভম্ব হাতে মিষ্টি খেতে দিল আর বলল, "ঘাবড়াও মৎ, বারোটার গেট্সে দুস্রা সাব্ লোগ আসে গা।"

মদন তখনকার মত ওদের ভাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু নিজে সুস্থির হতে পারল না। বাস-স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিল।

॥ চব্বিশ ॥

লেখকের দিনলিপি:

২৯শে সেপ্টেম্বর। পিপুলকোটি পৌঁছালাম সন্ধ্যা ৭টায়। ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। এক অন্ধকারে (ভোর পাঁচটায়) ঋষিকেশ থেকে যাত্রা করেছিলাম, আরেক অন্ধকারে গন্তব্যে এসে পৌঁছালাম। সারাটা দিন, একটানা চোদ্দ ঘণ্টা বাস জার্নি করে শরীরের হাড়গোড় প্রায় গুঁড়িয়ে যাবার জো হয়েছে। ঋষিকেশে দুটো খবর পেলাম। আমাদের দলের শেরপারা দুদিন আগে পিপুলকোটি চলে

গিয়েছে। আর দ্বিতীয় সংবাদ, একটা ফরাসী পার্টি প্রায় মাসখানেক আগে নন্দাঘুণ্টি পাহাড় থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। একটা হোটেলওয়ালা তাদের ছবিও দেখাল।

পাহাড়ের পথে বাসে জার্নি করলে যাওয়াটা দ্রুত হয় বটে, কিন্তু দেখাটা হয় না। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগের মত সুন্দর জায়গার সৌন্দর্য, এই তাড়াহুড়োর মধ্যে উপভোগই করা গেল না। বীরেনদা, দিলীপ আর বিশ্বদেব বাস থামা মাত্র ছবি তুলতে ছোটে। ধ্রুব আর সুকুমার ছোটে চায়ের সন্ধানে। বাকী থাকি আমি, ডাক্তার আর আজীবা। আমরা বেশীর ভাগ বাসের কাছাকাছিই থাকি। কখনও এ-দলে, কখনও বা ও-দলে গিয়ে জুটি।

দুটো অন্ধকারের ঘটনা কখনও ভুলব না। একটা ঋষিকেশ ছেড়ে ও একটা পিপুলকোটি ঢোকার মুখে ঘটেছিল। কলকাতা থেকে টিকে নিয়েছিলাম, টি-এ-বি-সি'ও নিয়েছিলাম। কিন্তু তাড়াহুড়োয় সার্টিফিকেট ফেলে গিয়েছিলাম কলকাতাতেই। শুনলাম, ঋষিকেশ থেকে বেরুবার মুখেই জনস্বাস্থ্য-দপ্তর খাপ পেতে বসে আছে। সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলেই সুঁই ভরে দিচ্ছে। ধ্রুব, নিমাই, দিলীপ আর আমি একটা মতলব আঁটলাম। প্রায় ফার্লংখানেক আগে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। তারপর মার্চ করে এগিয়ে গেলাম। ফাঁড়াটা নির্বিঘ্নে উতরে গেল।

পিপুলকোটি পেঁছুবার অনেক আগেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে হেড্ লাইট্ জেবলে বাস এগিয়ে চলেছে। একটা মোড় ফিরতেই দুজন লোকের উপর আলো পড়ল। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বাসটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই চিৎকার শুনলাম, "নন্দাঘুণ্টি পার্টি", মুখ বাড়িয়েই জবাব দিলাম, "হ্যাঁ।" আওয়াজ পেলাম, "থামাও, বাস থামাও।" বিশ্বদেব বলে উঠল, "আরে, এ যে মদন। নির্ঘাত মদন।" বাস থামল। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল মদন। পিছনে আঙ শেরিং।

মদন বললে, "যাক বাবা, এসে পড়েছ যে এই ঢের।"

"তার মানে?"

"মানে পিপুলকোটি পেঁছে বুঝবে। কাল থেকে ভাত নষ্ট হচ্ছে।"

"কিন্তু নষ্ট হল কেন? আমাদের তো আজই পেঁছবার কথা।"

মদন বলল, "তাই নাকি? তা হবে।" মদন চুপ করে গেল।

এখন রাত দশটা। একটা ধর্মশালার উপরের ঘরে আমাদের যাত্রার উদ্যোগ হচ্ছে। মালবাহকরা ওজন করে করে এক-একটা বোঝা বানাচ্ছে। ৮০ পাউণ্ডের বেশী কেউ মাল বইবে না। শেরপারা ওদের সাহায্য করছে। দিলীপ সব ব্যাপারটা পরিচালনা করছে। মদন মাঝে মাঝে এসে তাকে ধমক মারছে।

সুকুমার, নিমাই, আর ধ্রুব আমার কাছে বসে ম্যাপ খুলে শের সিংয়ের সঙ্গে রুট সম্পর্কে পরামর্শ করছে। শের সিং অভিজ্ঞ লোক। টিলম্যানের সঙ্গে নন্দাদেবী অঞ্চলে ঘুরেছে। নন্দকোটের পথও সে জানে। কিন্তু নন্দাঘুণ্টির এই পথ, আমাদের ম্যাপে যার নির্দেশ আছে, সে জানে না। ওদের কেউই জানে না। রিণি গ্রাম চেনে। তার উপরে আর-একটা গ্রাম আছে, নাম মোরনা। তাও অনেকে চেনে। বাস্, তার উপর আর না।

শের সিং বলে উঠল, "দেখ সাব্, যে পথ তোমরা চেন না, আমরা চিনি নে, সে পথে আমি কাউকে নিয়ে যেতে পারব না। জান্ আগে, পয়সা পরে। আমার বয়স অনেক হয়েছে সাব্, অনেক দেখেছি। পাহাড় বড় সাংঘাতিক জায়গা। আমি যেতে পারব না। আগেই বলে দিলাম।"

নিমাই বলল, "পথ আছে শের সিং। আমার নক্‌শা বলছে, জরুর আছে।"

"কে সে পথ চেনে?" শের সিং বলল, "যদি কেউ চেনে, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী থাকে তো তার পিছু পিছু যাব আমরা। নইলে এক পাও নড়ব না।"

॥ পঁচিশ ॥

শের সিং তার লিকলিকে হাত দুটো প্রবল বেগে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল।

উত্তেজিতভাবে বলল, "নেহি সাব্‌, হামসে নেহি হোগা।"

শের সিংয়ের দিকে ধ্রুব নিঃশব্দে ক্যাপস্টেন সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। শের সিং একটা সিগারেট বের করে ধরাল। প্যাকেটটা ধ্রুবকে ফেরত দিতে গেল।

ধ্রুব শান্তভাবে বললে, "ওটা তুমি রাখ শের সিং, ওটা তোমার।"

শের সিংয়ের উত্তেজনা একটু কমে এল। সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেলল। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে পুরে নিঃশব্দে টানতে লাগল।

সমস্ত হলটাই স্তব্ধ হয়ে গেল। মালবাহকেরা ওজন করে করে বোঝা ঠিক করে নিচ্ছে। কয়েকজন শেরপা তাদের সাহায্য করছে। দিলীপ, মদন আর বিশ্বদেব প্রত্যেক অভিযাত্রীর রুকস্যাক আর কিট্‌ব্যাগ থেকে মাল মেঝের উপর ঢেলে ফেলেছে। নতুন করে মিলিয়ে নিচ্ছে। দিলীপ ফর্দ পড়ছে আর ওরা দুজন সেই ফর্দের সংগে মাল মিলিয়ে নিচ্ছে।

দিলীপ বলল, "এবার ডাক্তারের পার্সোন্যাল কিট।"

বিশ্বদেব খুঁজে পেতে একটা কিটব্যাগ বের করল। দেখল এক কোনায় পেন্সিল দিয়ে নাম লেখা আছে—ডাঃ অরুণকুমার কর।

বিশ্বদেব বলল, হ্যাঁ, ডাঃ অরুণকুমার কর।

দিলীপ : কিট্‌ব্যাগ একটা?

বিশ্বদেব : কিট্‌ব্যাগ একটা।

দিলীপ : অ্যালকাথিন কভার?

বিশ্বদেব অ্যালকাথিন কভারটা কিট্‌ব্যাগের ভিতর ভরে দিল। ওয়াটারপ্রুফ হয়ে গেল কিট্‌ব্যাগ।

বিশ্বদেব : হ্যাঁ, অ্যালকাথিন কভার।

দিলীপ তালিকা দেখে আবার নামতা পড়তে শুরু করল।

—মাউন্টেনীয়ারিং বুট?

বিশ্বদেব একজোড়া মাউন্টেনীয়ারিং বুট কিট্‌ব্যাগে ভরল।

—হ্যাঁ, মাউন্টেনীয়ারিং বুট একজোড়া।

—ফেদার ট্রাউজার?

—হ্যাঁ ফেদার ট্রাউজার।

—ফেদার জ্যাকেট?

—হ্যাঁ ফেদার জ্যাকেট।

—উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার?

—না, উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার নেই।

"নেই কী রে!" দিলীপ ধমকে উঠল। "আলবাৎ থাকতে হবে। দেখ, কোথায় গেল?"

"এই মদনা", বিশ্বদেব বলল, "দেখ তো, কার কিট্ব্যাগে দুটো উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার ঢুকেছে।"

মদন কিট্ব্যাগ হাতড়াতে লাগল। আঙ ফুতার, খোকা-খোকা চেহারার এক শেরপা, কফি দিয়ে গেল। সুকুমার কফির মগটি মুখে তুলেছে অমনি শের সিং আবার চেঁচিয়ে উঠল।

"নেহি সাব্, হামসে নেহি হোগা। যে রাস্তার সঙ্গে আমার জান-পহ্চান নেই, সেই রাস্তায় আমি আমার এতগুলো আদমিকে নিয়ে যেতে পারব না। আমার সাফ কথা।"

শের সিং কথাটা এত জোরে বলল যে হলঘরের লোক মাত্রেই কথাটা শুনতে পেল। মালবাহকেরা কাজ বন্ধ করে শের সিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। দিলীপ, মদন, বিশ্বদেবও চুপ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘরটায় ক্ষণিকের জন্য দুটো পেট্রোম্যাক্স আলোর চাপা অবিশ্রান্ত গর্জন ছাড়া আর-কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। রাত এগারোটা বেজে গেল। বাইরে চাঁদের আলো কুয়াশার সঙ্গে মিশে মহা-নবমীর অদ্ভুত মায়া বিস্তার করেছে। দূরের পাহাড়গুলো কোনটা স্পষ্ট, কোনটা আবছা। মনে হয় যেন অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে বসেছে।

ধ্রুব, নিমাই, এমন কী সুকুমারও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। যদিও তারা কেউই মুখে সে ভাব প্রকাশ করল না। শের সিং লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ওরা। কী চায় শের সিং? মতলবটা কী ওর? সত্যিই পথ চেনে না? না, কী চাপ দিয়ে বেশী টাকা আদায়ের মতলব?

সর্দার আঙ শেরিং দেখল ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরাল হয়ে যাচ্ছে। সে প্রথমেই ধমক দিল মালবাহকদের।

"এই. কেয়া দেখতা তুমলোগ, চুপচাপ খাড়া হ্যায় কিউ, কাম কর, কাম কর। কাল জলদি জলদি নিকাল নে পড়েগা।"

ধমক খেয়ে মালবাহকেরা একবার শের সিংয়ের দিকে চাইল। আঙ শেরিং গর্জন করে উঠল।

"হাথ্ চালাও জলদি। ফুর্তি ফুর্তি কাম কর। সব কাম জলদি ফিনিস কর।"

মালবাহকেরা ধীরে ধীরে যার যার কাজে ভিড়ে গেল।

বিশ্বদেব হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "কী রে মদনা, জমে গেলি নাকি? ডাক্তারের উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার কই?"

মদন তাড়াতাড়ি করে উইণ্ডপ্রুফ খুঁজতে গিয়ে সমস্ত কিট্ব্যাগের মাল মেঝেয় ঢেলে ফেলল। দেখা গেল, একটা কিট্ব্যাগের ভিতর দুটো উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার ঢুকে গিয়েছে। মদন একটা বের করে দিল। মদনের এই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড দেখে বিশ্বদেব খুব চটে গেল।

বিশ্বদেব গরম হয়ে বলল. "এটা কী হল. মদন?"

মদন অম্লান বদনে বলল, "কেন. শর্ট কাট্।"

"বলি, এগুলো এখন আবার ভরবে কে?"

"কেন. তুই? তুই ভরবি।"

"সাধে কি তোকে জি মদন বলে।"

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল. "জি মদনটা কী?"

বিশ্বদেব বলল, "গাড়ু মদন।"

"গাড়ু মদন। গাড়ু কেন?"

"এই রকম গাড়ুর মত মাঝে মাঝে গড়ায় কী না, তাই।"

বিশ্বদেব হাসে। দিলীপ হাসে। মদনও হাসে।

দিলীপ বলে, "নে, নে, অনেক রাত হল। কাজগুলো সেরে ফেল্। মদন, কিট্-ব্যাগগুলো ভর্।"

দিলীপ আবার নামতা পড়ে। বিশ্বদেব জবাব দেয়।

—লেদার গ্লাভস্?

—না, নেই।

—থাক্, ওটা আর ডাক্তারের দরকার লাগবে না। মাত্র দু জোড়াই আছে।

—নাইলন গ্লাভস্?

—না, নেই।

—"আচ্ছা ওটাও ডাক্তারকে দেওয়া যাবে না। ওটা বেশী নেই। যে-কয় জোড়া আছে, হাই অলটিচ্যুডে লাগবে। দেখ্ তো উলেন গ্লাভস্ আছে কি না?"

বিশ্বদেব বলল, "আছে।"

—শিলপিং ব্যাগ?

—শিলপিং ব্যাগ।

—এয়ার ম্যাটরেস্?

—এয়ার ম্যাটরেস্।

—স্নো গগলস্?

—স্নো গগলস্।

"দেখ সাব্", শের সিং বলল, "নন্দাদেবী যেতে চাও, নিয়ে যাব। পথ চিনি। যোশীমঠ, তপোবন, রিংড়ি, লতা, লতাখড়ক, ধরাঁসি হয়ে চলে যাব। ত্রিশূল চল, নন্দকোট চল। নিয়ে যাব। পথ চিনি। কিন্তু নন্দাঘুণ্টির পথ চিনি নে। যে পথ চিনি নে, সে পথে আমার লোকেদের নিয়ে যাব না। পাহাড় বড় ভয়ংকর জায়গা। একা হতাম, পরোয়া করতাম না। কিন্তু এত লোকের দায়িত্ব নিয়ে—নেহি সাব্, হামসে নেহি হোগা।"

—আইস্ অ্যাকস্?

—আইস্ অ্যাকস্।

—উলেন ড্রয়ার?

—উলেন ড্রয়ার।

"দেখ সাব্" শের সিং বলল, "সব কথা, প্রথমে বলে নেওয়াই ভাল। মাঝ রাস্তায় গিয়ে এসব কথা তুললে, তোমরা বলবে, শের সিংটা পাজী বদমাশ। এ কথা আগে বল নি কেন?"

—"এই কেয়া করতা তুমলোগ। হাথ্ চালাও। ফুর্তি ফুর্তি কাম কর।"

—ফুল মোজা এক পেয়ার?

—ফুল মোজা এক পেয়ার।

—হাফ মোজা এক পেয়ার?

—হাফ মোজা এক পেয়ার।

"দেখ সাব্," শের সিং বলল, "টিলম্যান সাহেবের সঙ্গে আমি নন্দাদেবী গিয়েছিলাম। কেউ রাস্তা চিনত না। এত ভারি চটানে (পাহাড়ে) উঠে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেউ পথ চিনি নে। চারিদিকে শুধু বরফ। চার দিন তার উপর অন্ধের মত শুধু ঘুরপাক খেয়েছিলাম। আমাদের খাবারও ফুরিয়ে গিয়েছিল। দেখ সাব্, শের সিং নিজের জানের পরোয়া করে না। কিন্তু এত লোকের জিম্মাদারি নিয়ে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। সাফ বলে দিলাম।"

—ওয়াটার বটল্ একটা?
—ওয়াটার বটল্ একটা।
—অ্যালুমিনিয়মের থালা?
—হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়মের থালা।

॥ ছাব্বিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

৩০শে সেপ্টেম্বর। গুলাবকোটির ডাকবাংলো। পিপুলকোটি থেকে পৌঁছাতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। এদিন আমরা মার্চ শুরু করেছি দেরিতে। বেলা বারোটায়। দুপুরের খাওয়ার পাট পিপুলকোটিতেই চুকিয়ে নিয়েছিলাম। যে সব মালবাহকদের মাল বইবার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছিল, মদন তাদের মধ্য থেকে বেছেগুছে দুজনকে "কুক" বানিয়ে দিলে। হরি সিং হেড্ কুক আর লালু তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। প য়ষট্টি জন অপরিচিত ধোটিয়ালদের ভিতর থেকে দুজন "কুক" খুঁজে বের করা সহজ নয়। মদনের ক্ষমতা আছে।

প্রথম দিন "কুকের" রান্না খেয়ে তো আমরা থ বনে গেলাম। খাব কি, আমরা হেসেই বাঁচি নে। "অপূর্ব" এক স্বাদ সঞ্চারিত হল রসনায়। অবশেষে সর্দার আঙ শেরিং আমাদের কিচেনের খবরদারির ভার গ্রহণ করল। ভরসা পেলাম।

শের সিংয়ের সঙ্গে সারা সকাল আলোচনা হল আমাদের। রুট সম্পর্কে শের সিংয়ের ওই এক কথা। তোমাদের এই নক্শার রাস্তা আমার জানা নেই সাহেব। যে রাস্তা আমার অজানা অচেনা, সেই রাস্তায় এতগুলো লোকের দায়িত্ব নিয়ে আমি যেতে পারব না সাহেব। শের সিংয়ের হাতে ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের প্যাকেট গুঁজে দেওয়া হল, মগ-ভর্তি রম তুলে দেওয়া হল, বকশিশের আভাস দওয়া হল। শের সিং ওই এক কথা উচ্চারণ করল বার বার। হামসে নেহি হোগা।

আমি জানতাম, সুকুমাররা একটা নতুন রুটে নন্দাঘুণ্টি যাচ্ছে। নিমাই কয়েকবার আমাকে সেই রুটের ম্যাপও দেখিয়েছে। উড্ সাহেবের বিবরণও আমি পড়েছিলাম। আমার, পাহাড় সম্পর্কে যদিও কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, শের সিংকে সুবিধের লোক বলে মনে হল না। ভাবনা হল, আবার মালবাহকদের না বিগড়ে দেয়! এটা বুঝতে পেরেছিলাম, শের সিং বিগড়ে গেলে অভিযানের বারোটা বেজে গেল।

আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলাম, এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে! শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, শের সিং যতদূর পর্যন্ত যেতে রাজী, ততদূর পর্যন্তই আমরা যাব। যাবার পথে গাইড একজনকে সংগ্রহ করেই নিতে হবে, যে করেই

হোক। যদি শেষ পর্যন্ত গাইড না পাওয়া যায়, তখন মালবাহকদের ভরসা ছেড়ে, নিজেরাই রুটের সন্ধানে বের হব। এবং এ বছরকার মত নন্দাঘুণ্টির পথটাই আবিষ্কার করে আসতে হবে। এ ছাড়া আর উপায় কী? পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছবার পথ আবিষ্কার যে পাহাড়ে চড়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা কজন লোক বুঝবেন, আমরা সেই চিন্তাই করতে লাগলাম। শের সিং বলল, সে আমাদের রিনি গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর সেখানে যদি কোন শিকারী বা মেষপালক পাওয়া যায় যে রণ্টি হিমবাহ পর্যন্ত পথটা চেনে, তবে তাকে গাইড্ হিসাবে নেওয়া হবে। সেই গাইড্ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে শের সিং যেতে আর আপত্তি করবে না। আঙ শেরিং একটা কথা বললে, "সাব্, আর কখনও এমন সব লোকের সঙ্গে রুট্ নিয়ে আলোচনা কোর না। বলবে যে, পথ আমরা চিনি, বাস্।"

শের সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চুকলে যাত্রার তোড়জোড় শুরু হল। আমি পোস্টাফিসে গেলাম খবরটা কলকাতায় পাঠাতে। আমরা যে অনিশ্চিত এক অবস্থার মধ্যে পড়েছি, রুট নিয়ে, এ সংবাদ পাঠাব কি না তা নিয়ে আলোচনা হল। কেউ বললেন, এ কথা এখন জানানো ঠিক হবে না, লোকে আমাদের ভুল বুঝবে। আবার কেউ বললেন, এতে ভুল বোঝার কী আছে? পৃথিবীর সব দেশের পর্বতারোহীদেরই তো এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এমন নয় যে, আমাদের ঘাড়েই এ সমস্যা চাপল। শেষে সবাই মত করল, পাঠিয়েই দেওয়া হোক খবরটা।

অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে রিপোর্ট লিখতে বসেছিলাম। টেবিলের বদলে প্যাকিং বাক্সে ভর দিয়ে লিখতে হল। ঘরের মধ্যে পুরোদমে মালপত্র গোছগাছ চলেছে। সব ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কাল রাত একটা পর্যন্ত কাজ চলেছিল। আজ আবার অন্ধকার থাকতেই কাজ শুরু হয়েছে। অনবরত হাতুড়ির শব্দ কানে আসছে।

যেখানে বসে আমি লিখছিলাম, তার সামনেই তিনটে পাহাড় সুন্দর একটা জ্যামিতিক ত্রিকোণ সৃষ্টি করেছে। বাতাস একটা মিঠে মিঠে ঠাণ্ডা বিলি করে বেড়াচ্ছে। কী পরিষ্কার রোদ! আহ্লাদে যেন এখানে ওখানে ঢলে ঢলে পড়ছে। এত যে অনিশ্চয়তা, গাইড্ পাব কি না ঠিক নেই, পথ পাব কি না জানা নেই, তবু তা মনকে হতাশ করতে পারল না। এ আবহাওয়ার এমনি গুণ। এ পরিবেশের এমনি মায়া।

গুলাবকোটির পথে দল বেঁধে যখন যাত্রা করলাম, তখন পরিবেশের কোমল স্নিগ্ধতা অন্তর্হিত হয়েছে। মধ্যাহ্ন-গগনে সূর্যদেব তখন বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই প্রথম আমাদের হাঁটাপথে যাত্রা শুরু হল। কলকাতার পোশাক ছেড়ে আমরা গরম পোশাক পরেছিলাম। একমাত্র দিলীপ একটি সুতির শর্টস পরেছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেল দিলীপই বুদ্ধিমান। সেই গরমে গরম পোশাকে ঘেমে নেয়ে উঠছিলাম। তবু আমার ভালই লাগছিল। আমার পিঠে রুকস্যাক্। ওজন পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। দুটো কাঁধই টনটন করছিল। তবু ভাল লাগছিল। চড়াইয়ের পথ। ধীরে ধীরে চলছিলাম। সবার শেষে, সবার পিছে। সকলের আগে বেরিয়ে গেল দিলীপ আর বীরেনদা। ওরা ছবি তুলছে। ঘণ্টাখানেক চলার পর দেখা গেল, কী এক আশ্চর্য যোগাযোগে সব জোড়া বেঁধে গেছে। দিলীপ-বীরেনদা, বিশ্বদেব-মদন, সুকুমার-নিমাই, ধ্রুব-ডাক্তার আর আমি-আঙফুতার। আমার চলার স্টাইলটি যে দেখে, তারই খুব মজা লাগে। কিছুক্ষণের

মধ্যেই আমি "মোটা সাব্" নামে পরিচিত হয়ে গেলুম। মোটা সাব! বাব্‌বাবা!

সংসীতে এসে মালুম পেয়েছিলাম, পাহাড়ী পথে চলা কাকে বলে। এতক্ষণ আমরা মোটর-চলা সড়ক দিয়েই আসছিলাম। যোশীমঠ পর্যন্ত বাস-চলা রাস্তা তৈরি হচ্ছে। সংসীতে এসে মোটর-পথটা অনেকটা ঘুরে গেছে। শর্টকাট পথ যেটা, সেটা পাকদণ্ডির। আমি দেখলাম, আমাদের সব লোক পাকদণ্ডির পথ বেয়েই উঠে যাচ্ছে। আমিও ওদের অনুসরণ করলাম। সরু পথ, এমন সরু—এক-সঙ্গে দুটো পা রাখা যায় না। খাড়া চড়াই। একটু একটু করে উঠছি। খানিকটা ওঠার পর দম ফুরিয়ে গেল। বুকটা এত ধড়ফড় করছে, মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। গলগল করে ঘাম ঝরে ঝরে চশমা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। চশমা মুছব, সে উপায় নেই। হাত যে আশ্রয় ধরে আছে, তা ছেড়ে দিলেই গড়িয়ে পড়ে যাব নিচেয়। হাতের আইস-অ্যাক্স্‌টাকে তখনও পর্যন্ত রপ্ত করতে পারি নি। সুকুমার আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল সুচল দিকটা শরীর থেকে দূরে রাখতে, নইলে পেটের ভিতর ঢুকে যাবার সম্ভাবনা। আমি তাই যত রকমে পারি তুষার-গাঁইতির তীক্ষ্ম ডগাটা বাইরের দিকে রাখবার চেষ্টা করছিলাম, আর সেই ডগাটা ততই আমার তলপেটের দিকে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। আচ্ছা ফ্যাসাদ! এই রকম বিব্রত, অতিব্যস্ত অবস্থায় খাড়া চড়াইটার মাঝামাঝি উঠে আমার মনে হল, আমি বোধ হয় মাউণ্ট এভারেস্ট ছাড়িয়ে উঠেছি। আর আমার একটুও দম নেই। বুকে একটা ব্যথা টের পেলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম শেষ লোকটিও চড়াইটার উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিচে চাইবার সাহস হল না। কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মনে হল, আমি একাই পিছিয়ে পড়েছি। তাড়াতাড়ি করে কয়েক ধাপ উঠতে চেষ্টা করলাম। ঘাড়ের পাশ দিয়ে রক্তস্রোত মাথার দিকে বইছে বলে মনে হল। চোখে কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠতে লাগল। পা টলতে লাগল। একটা পাথর থেকে আর-একটা পাথরে—দূরত্বটা একটু বেশী ছিল—পা বাড়িয়ে দিলাম। বুঝলাম আমার পা সে-পাথরটার নাগাল পেল না। শরীরটা টাল খেয়ে গেল। গোঁত্তা খেয়ে পড়ছিলাম। কে যেন খপ্ করে আমাকে চেপে ধরল। নিশ্চিত পতনের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

পিছন ফিরে দেখি, আঙ-ফুতার। এক হাতে আমার জামার কলারটা চেপে ধরেছে। একগাল হেসে বললে, "নিচু নেহি মোটা সাব, আভি উপর যানে হোগা। থোড়া হ্যায়।"

কোথায় ছিল আঙ-ফুতার, কেমন করে আমাকে ধরে ফেলল ঠিক সময়মত, সে কথা ভাববার মত অবস্থা আমার তখন ছিল না। আচ্ছন্নের মত উঠতে লাগলাম। এক সময় দেখি উপরে উঠে পড়েছি। দু-পা এগুলেই এক ইস্কুল-বাড়ির বারান্দা। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম। তারপর বারান্দায় উঠেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ দুটো আপনিই বুজে এল। কতক্ষণ পড়েছিলাম জানি নে। আঙ-ফুতার ডাকল, "সাব্, মোটা সাব!" চোখ মেলে চাইলাম। আঙ-ফুতার একটা মগ এগিয়ে দিল। একগাল হেসে বললে, "পিও। লেমন পানি। আচ্ছা।" চোঁ-চোঁ করে এক মগ লেমন পানি খেয়ে নিলাম। আঙ-ফুতার খিল খিল করে হাসতে লাগল। আমিও হেসে ফেললাম।

গুলাবকোটি পেঁছিতে আমাদের পাঁচটা বেজেছিল। নয় মাইল এসেছি পাঁচ ঘণ্টায়। প্রথম দিন, তাই ধীরে ধীরে হেঁটেছে সবাই। মালবাহকেরাও খুব সচেতন হয়েছে আজকাল। এটা নাকি ওদের এক পড়াও (এক দিনের রাস্তা)। ডাক-

বাংলোয় উঠেছি। ভারি সুন্দর জায়গাটা। তীর্থযাত্রাপথের উপরই গুলাবকোটি। এখন মোটর-রাস্তা অনেক নিচে দিয়ে চলে যাওয়ায় এর আগের দিন নেই।

সবাই খুব ফুর্তিতে আছে। মাউণ্টেনীয়ারিং এক্স্‌পিডিশনে এসেছে, না বনভোজনে, এদের দেখে বোঝা যায় না। পথ চলছে হৈ-হৈ করে। গান করছে। মজার মজার টিপ্পনী কাটছে। একজনের পিছনে আর-একজন লেগেই আছে। এ-এক অদ্ভুত অভিযান।

আজ আবার বিজয়া-দশমী। বিশ্বদেব এন্তার চিঠি লিখে চলেছে। মদনের ধারণা, বিশ্বাসের যা নেচার, তাতে ও যদি ঠিকমত হাত চালাবার ফুরসত পায়, তবে এক দিনে এক জি-পি-ও পোস্টকার্ড ও লিখে ফেলতে পারে।

সন্ধ্যার পর এক অভিনব অনুষ্ঠানে বিজয়া-দশমী পালন করা হল। শেরপাদের নেমন্তন্ন করা হল। ওরা আসতেই ডাকবাংলোর আঙিনায় গোল হয়ে সবাই ঘিরে বসলাম। একজন উঠে বললে, আজ বিজয়া-দশমী, ভাই-ভাই পরব, এস আমরা কোলাকুলি করি। শুরু হল কোলাকুলি। তারপর ঘোষণা করা হল, এই-বার মিষ্টিমুখ। সেন মহাশয় আর কে সি দাসের টিনের রসগোল্লার সদ্‌গতি হল। শেরপাদের রম্‌ দেওয়া হল।

তারপরের অনুষ্ঠান সঙ্গীত। মূল গায়েন নিমাই আর বীরেনদা। নিমাইয়ের "লে লো সুরমা।" আর বীরেনদা'র শ্যামাসঙ্গীত মিলে যা এক বিচিত্র ভাবের ঢেউ বইয়ে দিলে সকলের মনে, তা আর কহতব্য নয়। দা তেম্বাও খান দুয়েক গান গাইলে। শেরপা সঙ্গীত।

নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে বিজয়া-দশমীর জলসা বন্ধ হল। রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা।

॥ সাতাশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

১লা অক্টোবর। সাড়ে বারোটার মধ্যেই যোশীমঠ পেঁছে গেলাম। সকাল সকাল রওনা দিয়েছিলাম গুলাবকোটি থেকে। পথ চলতে মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না। প্রথম দিকে চলতে বেশ ফুর্তিই লাগছিল। শেষের দিকে দুটো পায়েই ফোস্কা পড়ে গেল। বেশ খোঁড়াতে হয়েছে।

যোশীমঠে পেঁছে দেখি, বেজায় তৎপরতা। রাষ্ট্রপতি আসবেন। ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। তোরণ উঠছে। সরকারী অফিসার, মিলিটারী অফিসারেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। এখানে আরও কিছু রসদ কেনা হল। মালবাহকও আরও কয়েকজন নিতে হল। এক বিরাট বাহিনী।

সন্ধ্যার সময় মদন শের সিংকে নিয়ে ছাউনিতে গিয়েছিল ছোলদারি তাঁবু যোগাড়ের আশায়। মদন নন্দাঘুণ্টি পার্টির লোক, এ কথা জানতে পেরে কম্যান্ডাণ্ট সাহেব নাকি ওকে ডেট দিয়েছেন। আমাদের অপরাধ, আমরা পিপলকোটির সব 'কুলি' নাকি নিয়ে নিয়েছি। ফলে রাষ্ট্রপতির লটবহর বইবার লোকের অভাব পড়ে গিয়েছে। তাঁবু যোগাড় করতে পারল না মদন।

আমাদের ইচ্ছে ছিল যোশীমঠে একদিন থেকে রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করা। কিন্তু মদনের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। স্থির হল, আর দেরি করা নয়। যোশীমঠ থেকে কাল ভোরেই পিট্‌টান দিতে হবে। কী জানি,

আমাদের মালবাহকদের যদি 'রিকুইজিশন' করে নেয়।

আমরা যে রুটে যেতে চাই, সে পথ চেনে এমন কাউকে যোশীমঠেও পাওয়া গেল না। তবে একজন লোকের নাম তিন-চার জায়গা থেকে শোনা গেল, সে নাকি ও-অঞ্চল সম্পর্কে ভাল খোঁজখবর রাখে। তার বাড়ি রিনি গ্রামে।

ডাক্তার এখানে একচোট চিকিৎসা করে নিলেন। কারও গায়ে ব্যথা হয়েছে, ব্যথা সারার ট্যাবলেট দিলেন। ঠান্ডা লেগে গলা ব্যথা-ব্যথা হয়েছে কারও, তারও দাওয়াই দেওয়া হল। দাস্ত ঠিকমত যাতে হয়, সবাইকে সেই ওষুধ খাওয়ানো হল। আমাদের চিকিৎসা ডাক্তার তো করলেনই, শের সিংয়ের ফোঁপরদালালিতে পড়ে চটিওলার বউকেও চিকিৎসা করে আসতে হল তাকে। ভেবেছিলাম ভিজিট বাবদ ডিম কি মুর্গী, কিছু একটা পাঠাবে লোকটা, নিদেন-পক্ষে চটির ভাড়াটা মকুব করে দেবে। ও মা, সব ভোঁ-ভোঁ। অথচ লোকটার টাকায় নাকি ছাতা ধরছে।

ছোট্ট একটা ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছি। একজনের এয়ার ম্যাট্রেস আর-একজনের গায়ে গিয়ে লাগছে। মদন আর বিশ্বদেব পাশের একটা গুদোম ঘরে ঢুকে পড়ল। শেরপারা পাশের চটিতে আশ্রয় নিয়েছে। বেশ শীত লাগছে। পৌষ মাসের শীতের মত। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকতে আর বের হতে অর্ধেক এনার্জি খরচ হয়ে যাচ্ছে।

২রা অক্টোবর। তেরো মাইল মার্চ করে রিনি পেঁছেছি! সকাল সাতটায় তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তপোবনে পেঁছে দুপুরে ঘণ্টা তিনেক বিরতি। এখানে সুন্দর একটা আশ্রম আছে। আশ্রমে আশ্চর্য একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডটা উষ্ণ। এরা বলে তাতাপানি। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শীতল জলের একটা ধারাকেও কুণ্ডের বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে আনা হয়েছে। চৌবাচ্চায় তাই ঠান্ডা গরম, দুই রকম জলই পাওয়া যায়। আর ভারি পরিষ্কার সে জল। স্নান করলাম। ভারি আরাম হল। শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আমার পায়ের ফোস্কা বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। বেশ যন্ত্রণা দিয়েছে। তবে খানিকক্ষণ চলবার পর আমি আর আমল দিই নি তাকে। এসেছি শরীর মহাশয়ের সহ্যশক্তি কতটা তা যাচাই করার জন্য। এত সহজে হাল ছাড়লে চলবে কেন? চড়াইতে উঠবার চেয়েও ফোস্কা বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছিল উতরাইয়ের পথে। সকলের শেষে তপোবনে এসে পেঁছেছিলাম। সকলের আগে তপোবন থেকে রওনা দিলাম। রাস্তা খুব ভাল। কোন কোন জায়গায় আমার মুসৌরীর কথা মনে পড়ছিল। এবার ধ্রুব, নিমাই, সুকুমার, মদন, বিশ্বদেব আমার আগে-পিছে চলেছে। আঙ-ফুতার তো ছায়ার মত লেগে আছে সঙ্গে। দিলীপ পাহাড়ের পথে সুন্দর স্টাইলে হাঁটছে। বীরেনদা আর ডাক্তারও বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছে।

ধৌলি আর ঋষিগঙ্গার সঙ্গমেই রিনি গ্রাম। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা চায়ের দোকান। সেখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশ মেঘলা। শুনলাম আমাদের যাত্রা তখনও শেষ হয় নি। আরও মাইলখানেক এগিয়ে যেতে হবে। প্রায় শ পাঁচেক ফুট উপরে একটা ইস্কুলবাড়ি। শের সিং সেইখানেই আস্তানা ঠিক করেছে।

আবার উঠতে হবে! চড়াই ভাঙতে হবে! উপায় কী? অতি কষ্টে পাঁচ শো ফুট খাড়া চড়াই উঠে ইস্কুলে পেঁছালাম। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। বারান্দায় রুকস্যাকে ভর দিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

রাত্রে এক বৈঠক বসল। দুজন গ্রামবাসীকে নিয়ে এল শের সিং। অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। ওরা বললে, নন্দাঘুণ্টির পথ ওরা দুজনেই চেনে। এত সহজে গাইড পাওয়া যাবে ভাবি নি। জয় বাবা বদ্রিবিশাল! আমাদের মাথা থেকে বিরাট দুর্ভাবনা নেমে গেল। নিমাই আর সুকুমার ম্যাপ নিয়ে লোক দুজনের সামনে বসল। আমি নিমাইয়ের পাশে এসে বসলাম।

নিমাই ওদের জেরা করছে। ওরা জবাব দিচ্ছে। সাব্, আমাদের এখান থেকে প্রথমে যেতে হবে লতা। কতদূর? নিমাই জিজ্ঞাসা করল। থোড়া। দু মাইল। তারপর লতা থেকে লতা খড়ক। কতদূর? থোড়া। চার মাইল হবে। ওরা বলছে আর নিমাই মনোযোগ দিয়ে ম্যাপে কী যেন দেখছে। হ্যাঁ, তারপর? উস্‌কে বাদ যানে হোগা ধরান্সি। কতদূর? থোড়া। এই মাইল সাতেক হবে। নিমাই এবারে ম্যাপ বন্ধ করে ফেলল। ওরা দুজনে বলেই চলল : উস্‌কে বাদ ধুবরেগাট্টা। থোড়া। ছয় মাইল। উসকে বাদ ড়িউড়ি। থোড়া। ছয় মাইল। উসকে বাদ বিস-কেপ। থোড়া। আট মাইল। উসকে বাদ রামনি। থোড়া—বাস্ বাস্। চুপ কর। নিমাই অসহিষ্ণু হয়ে বলল, চুপ কর। এখন নন্দাঘুণ্টির রাস্তা বল। রিনি থেকে মোরনা। তারপর কী? ওরা বলল, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। পহলে জানে হোগা লতা। উসকে বাদ লতা খড়ক। উসকে বাদ ধরাসি। উসকে বাদ—

চুপ কর। চুপ কর। যাও তোমরা। নিমাই ধমক দিল। ওরা চলে গেল। নিমাই বলল, ও-সব রাস্তায় গেলে জীবনেও নন্দাঘুণ্টি যাওয়া যাবে না সুকুমার। ওরা নন্দাঘুণ্টির পথ জানে না।—কেন, এই যে এতক্ষণ বলছিল।—ঘোড়ার ডিম বলছিল। বলছিল নন্দাদেবীর কথা।

স্লিপিং ব্যাগে অনেকক্ষণ ঢুকেছি। ঘুম আসছে না। আর-একটা রাত্রি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটবে। কাল সকালে কী খবর পাওয়া যায় কে জানে?

৩রা অক্টোবর, সকাল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠতেই দেখি সকলের মুখ অন্ধকার। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি পড়ছে। বেশ শীত। ইস্কুল-ঘরের ভিতরে আমরা গাদাগাদি করে শুয়ে ছিলাম, শেরপারা বারান্দায়। আজীবা গতকালই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বার বার দাস্ত হচ্ছিল। কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে আজীবা! বেচারী! ও যে পুরো তাকতে চলতে পারছে না, ওকে যে অন্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে, এতেই মরমে মরে আছে। ট্রেন থেকে ওর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেছে আমার। আঙ-ফুতার ওরই পোষ্য। আজীবার কথামতই আঙ-ফুতার আমার পাহাড়ী পথের গার্জিয়ান বনে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই আজীবার খবর নিলাম। কেমন আছ আজীবা? রাত্রে আর দাস্ত হয়েছে কি? আজীবা বললে, হ্যাঁ, হয়েছে দুবার। পেট ব্যথাও করছে। ডাক্তার রাত্রে উঠে উঠে আজীবার খবর নিয়েছে। ওষুধ দিয়েছে। ম্লান হেসে আজীবা বলল, সাব্, হামসে কুছ নেহি হোগা। নসিব খারাব্ হ্যায়। ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল। মুখে হাসি টেনে এনে ওকে সাহস দিলাম। বললাম, কিচ্ছু ভেবো না আজীবা, সঙ্গে ডাক্তার যা আছেন একেবারে চাবুক। এমন দাওয়াই ওঁর কাছে আছে, যার একগুলি তোমাকে এখানে খাইয়ে দিলে তোমার দার্জিলিঙের ফ্যামিলি অবধি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আজীবার মুখে হাসি ফুটল।

জোর বৃষ্টি পড়ছে। দূরের পাহাড়গুলোর গায়ে বরফ পড়ছে। সুকুমার গম্ভীরভাবে সেদিকে চেয়ে আছে। শেরপারা ইস্কুলের পিছনে ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে ত্রিপল টাঙিয়ে 'কিচেন' তৈরি করেছে। জিনিসপত্র জলের ছাটে যাতে না ভেজে

—দিলীপ, মদন, বিশ্বদেব আগু শেরিংয়ের সঙ্গে তার ব্যবস্থা করছে। ডাক্তার আজীবাকে পরীক্ষা করছে। বীরেনদা যথারীতি গানের গলায় শান দিচ্ছে। নিমাই নির্বিকারভাবে শিস্ দিচ্ছে। ধ্রুব দা-তেম্বাকে নিচে গিয়ে ভেড়ার সন্ধান নিতে বলছে। পেম্বা নরবুকে ডাক দিয়ে লতার পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমার এখন অন্য ভাবনা মাথায় চেপেছে। অন্তত জনাতিনেক স্থানীয় লোক আমার চাই। আমার 'রানার' হবে। টেলিগ্রামই বল, আর চিঠিপত্রই বা ফোটো-ফিল্মই বল, এ সবই পাঠাতে হবে পোস্ট অফিসের মারফত। আর এ তল্লাটে পোস্ট অফিস হচ্ছে সেই যোশীমঠে। রানারই একমাত্র ভরসা। কিন্তু কোথায় রানার? ও-কাজ করতে কেউ রাজী হয় না।

রানার-সমস্যাও আবার চাপা পড়ে যায় গাইড-সমস্যার কথা মনে পড়লে। এখনও পর্যন্ত গাইডের দেখা নেই। শের সিং কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছে তার সন্ধানে।

দুপুর। আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে এল। কাছে বৃষ্টি আর দূরে বরফ সমানে পড়ছে, বিরাম নেই। পাহাড়ের গায়ে নতুন বরফ কত দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসছে। ঠাণ্ডা এমনই কনকনে, এমনই স্যাঁতসেঁতে যে গরম জামাকাপড় পরেও শানাল না, ভরদুপুরে আত্মরক্ষার্থে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হল। এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি। এমন একটা বাতাবরণ, এমন বোবা, এমন ভোঁতা যে, জীবনের স্বাদ বুঝি আলুনি-আলুনি লাগে। কী একটা ভাবতে চেষ্টা করছি, পারছি নে। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করছি, পারছি নে। দূর ছাই, চুপচাপ শুয়েই থাকা যাক।

রাত্রি। এখনও বৃষ্টি থামল না। কালও যদি না থামে? বেশ শীত পড়েছে। কোনক্রমে খাওয়াটা শেষ করেই সবাই স্লিপিং ব্যাগে এসে ঢুকেছি। স্লিপিং ব্যাগটা পুরনো। কয়েকটা ফুটো হয়ে গেছে। সরু সরু নরম নরম পালকগুলো এক-একটা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমি বিফল চেষ্টা করছি, ওগুলোকে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে।

দা-তেম্বা একটা খবর এনেছে, সন্ধ্যের সময়। খবরটা সুবিধের নয়। দা-তেম্বা বললে, মালবাহকরা এই বৃষ্টি দেখে গাঁইগুঁই শুরু করেছে। ওদের জুতো নেই, শীতবস্ত্র নেই, ওয়াটারপ্রুফ নেই। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, এসব শের সিংয়ের খেলা। হ্যাঁ, শের সিং তার পরিচিত এক অভিজ্ঞ শিকারীকে এনে হাজির করল। করম সিং নাম। করম সিং বললে, সে মোরনা, গোপা, রণ্টি, তম্বাখড়ক, থারগেট্টার রাস্তা চেনে। যৌবনকালে শিকার করতে দু-একবার গিয়েছে ওধারে। তবে থারগেট্টার ওদিকে আর যায় নি। রণ্টি হিমবাহ সে দেখে নি, নন্দাঘুণ্টি চেনে না। করম সিং আরও বললে, তার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ওসব পথে চলার ক্ষমতা তার নেই। সে যেতে পারবে না। তবে পথ আছে, সে জানে। থারগেট্টা পর্যন্ত যাওয়া যায়। শের সিংকে বলল, তুম যা সকোগে। যেতে পারবে তুমি। সুকুমার খুশী হয়ে বলল, শুনলে তো শের সিং। ও পথে যাওয়া যায়। অন্তত থারগেট্টা পর্যন্ত যাওয়া চলে। তবে আর কী, সেই পর্যন্তই চল। শের সিং খেঁকিয়ে উঠল, করম সিংকে বলল, মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজিও না করম সিং। আমাকে গাইড্ দাও। তুমি পথ চিনতে, তুমি তো যাবে না। এ তো আর বাঁধা সড়ক নয় যে তুমি এখান থেকে বলে দিলে আর আমরা সুট সুট করে পৌঁছে গেলাম। গাইড্ ছাড়া যেতে চেষ্টা করলে বিপদ-আপদ ঘটবে না, এমন কথা জোর দিয়ে তুমি বলতে পার? করম সিং শের সিংয়ের ধমকে থতমত খেয়ে

বলল, বাঃ, তা আমি কেমন করে বলব! শের সিং বলল, তোমার কথামত এগিয়ে গিয়ে যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে, তুমি তার জিম্মা নেবে? করম সিং ঘাবড়ে গেল। বলল, বাঃ, তা আমি কেমন করে নেব? শের সিং বলল, তা হলে বকবক করো না, চুপ করে থাক। শের সিং সুকুমারকে বলল, লীডার সাব্, করম সিং যদি গাইড্ দিতে পারে তো শের সিং আগে বাড়বে, নচেৎ এখান থেকেই ফিরবে। সুকুমার করম সিংকে বলল, আমাদের একজন বিশ্বাসী গাইড্ দেখে দিতে পারবে না করম সিং? করম সিং কী যেন ভাবতে লাগল। হঠাৎ মদন এগিয়ে এসে "শুনো করম সিং, শের সিং এবং—" বলে যেই না ভাষণ দেবার জন্য মুখ খুলেছে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেব ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দিল। বলল, মদন, প্লিজ। সব লোক কেটে পড়বে। এখন ওধারে যাও। মদন মুখ গোমড়া করে বলল, প্রাণ কা বাত বলতে দিলি না। ভুল করলি। করম সিং বলল, ঠিক হ্যায় লীডার সাব্, কাল আদমি লায়েগা।

আবার একটা অনিশ্চিত রাত্রি। কে জানে কেন, আজ ঘুমও আসছে না। একে একে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে এল। ভারী নিশ্বাস নিয়মিত পড়ছে, টের পাচ্ছিলাম। কারও কারও নাকও ডাকছে। একটা আবছা মূর্তি ও-পাশ থেকে উঠে গেল। সুকুমার। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল দূর পাহাড়ের দিকে। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরে এল আবার। জিজ্ঞাসা করলাম, বৃষ্টি থামল, ক্যাপ্টেন? সুকুমার সিগারেট ধরাল। বলল, না। বললাম, থামা তো উচিত। সুকুমার শুয়ে পড়ল। আর কি, এবারে আমিও শুয়ে পড়ি। বৃষ্টি পড়ছে। ঝপ ঝপ ঝপ। বৃষ্টি পড়ছে...

॥ আটাশ ॥

৪ঠা অক্টোবর। সকাল হল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। শেরপারা ভিজে কাঠ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে অতি কষ্টে রান্নার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় না, বৃষ্টি আজ থামবে। শের সিং একবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। কোন মালবাহকের দেখা নেই।

সুকুমার মনে মনে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। আসবে তো করম সিং? আসবে নিশ্চয়ই। এত দেরি করছে কেন করম সিং? তা হলে আর এল না বোধ হয়।

"সর্দার!"

সুকুমার ডাকে, "সর্দার!"

আঙ শেরিং কয়েকজন শেরপাকে নিয়ে দিলীপের নির্দেশে মালপত্র আবার নতুন করে প্যাক করতে শুরু করেছে। মাল প্যাকিং ওদের যেন আর শেষই হবে না। তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় মাল প্যাক করতে হয়েছিল। কোন্ প্যাকিংয়ে কী আছে তার হিসাব ভাল করে রাখতে পারে নি। তাই এখন যে জিনিসটাই খোঁজে চট করে আর পাওয়া যায় না। কোয়াটার মাস্টার নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলে সে উল্টোপাল্টা প্যাকিং দেখিয়ে দেয়। প্যাকিং খুলে খুলে দিলীপ হয়রান হয়ে যায়। বেজায় চটে যায় নিমাইয়ের উপর। নিমাই সু-উ-ই করে সিটি বাজিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ে। আঙ শেরিং আর দিলীপ প্যাকিং বাক্স খুলে ফেলেছিল। এখন ভরছে।

সুকুমার ডাকল, "সর্দার!"

আঙ শেরিং সুকুমারের কাছে এগিয়ে এল।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "করম সিং কেমন লোক সর্দার?"

আঙ শেরিং সুকুমারের উৎকণ্ঠা বুঝল।

"আচ্ছা হ্যায়। আচ্ছা হ্যায়।" আঙ শেরিং হাসল।

সুকুমার একটু যেন বুকে বল পেল। লালু মগ ভর্তি চা দিয়ে গেল। ওরা খেতে লাগল।

আজীবাকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করল ডাক্তার। অনেকটা ভাল এখন। আজ একটু ক্ষিধেও পাচ্ছে তার। কাল বার্লির জল খাইয়েছে আজীবাকে। আজ পথ্য কী দেবে? বার্লির জল শুধু খাওয়ালে দুর্বল হয়ে পড়বে আজীবা। সে চলতে পারবে না। তাই কপাল ঠুকে পেটের অসুখের রোগীকে, কালও যার ভালরকম দাস্ত হয়েছে, ডাক্তার পথ্য দিল ভাত আর ভেড়ার মাংস।

শেষ পর্যন্ত করম সিং এল একজন গাইড্ নিয়ে। শের সিংও এল। গাইডের নাম থেলু সিং। থেলু সিং থারগেট্টা পর্যন্ত গিয়েছে কখনও সখনও ভেড়া চরাতে। তার উপরে আর যায় নি। যাক, গাইডের সমস্যা মিটল। ওরা একটু নিশ্চিন্ত হল।

সুকুমার আর কালবিলম্ব না করে হুকুম দিল, মার্চ। বৃষ্টির জন্য মালবাহকেরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। শের সিং তাদের ডাকতে ছুটল। তাড়াতাড়ি ওরা কিছু খেয়ে নিল। তারপর শুরু হল মার্চ।

রিনি থেকে মোরনা দুই মাইল। বৃষ্টি মাথায় করে বের হল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মোরনাই শেষ লোকালয়। ওরা সেদিন আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। তাঁবু ফেলল ঘন্যাকুলে। এই প্রথম ওদের তাঁবুতে বাস। আকাশ আবার মেঘে ছেয়ে গেল। বৃষ্টি শুরু হল। জীর্ণ তাঁবু ভেদ করে সেই শীতল জলধারা অভিযাত্রীদের বিছানা পোশাক ভিজিয়ে দিতে লাগল।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

ঘন্যাকুল, ৪ঠা অক্টোবর। রিনি থেকে দুর্যোগ মাথায় করেই বের হয়েছিলাম। যখন মার্চ করে এগিয়ে চলেছি, তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এই বৃষ্টি, এই দুর্যোগ বড় ভাবনায় ফেলেছে আমাদের। কারণ উপরের দিকে ববফ পড়তে শুরু করেছে। এই নতুন বরফ বিপজ্জনক। এই বরফে চলা কষ্টকর। তার উপরে আবার অপরিচিত পথের নানা সমস্যা আছে।

আজ আমরা ঋষিগঙ্গার প্রবাহ ধরে চলেছি। চলেছি বেশ খানিকটা উপর দিয়ে। শুধু চড়াই আর চড়াই। বৃষ্টির জন্য পাহাড়ের গা কোথাও কোথাও খুব পিছল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আছাড় খেতে হচ্ছে। পথে ঘন জঙ্গল পড়ল। আগাছায় ভর্তি। খালি কাঁটা গাছ আর জলবিছুটি। এই সাত-আট হাজার ফুট উপরেও যে এত জলবিছুটি হয়, তা এই প্রথম দেখলাম। পৌনে বারোটায় মোরনা গ্রামে পৌঁছেছিলাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, আবার রওনা হলাম। প্রায় দুটোর সময় ঘন্যাকুল পৌঁছালাম। জায়গাটা ৮৫০০ ফুট উঁচু। আজ প্রায় দু হাজার ফুট ওঠা হল।

এখানেই তাঁবু ফেলা হল। পাহাড়ের গা কেটে জায়গা বানাতে হল তাঁবুর জন্য। ছোট ছোট সমতল আয়তক্ষেত্রে এক-একটা তাঁবু গাড়া হল। এখানে চাষ বাস হয়। মোরনা গ্রামের অধিবাসীরাই এখানে এসে চাষ করে।

বিকেল হয়ে এল। সূর্য আজ প্রায় সারাদিনই মেঘে ঢাকা। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ আমি ডিউটি অফিসার। ডিউটি অফিসারের অনেক কাজ। মালবাহকদের কাছ থেকে মালপত্র মিলিয়ে নেওয়া, প্রাতঃকৃত্য সারবার জায়গা খুঁজে বের করা (এই কার্যটির একটি ভদ্রগোছের নাম সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া হয়েছিল—'বনমালীবাবুর বাড়িতে যাওয়া'), রাত্রে কী রান্না হবে তা ঠিক করা, মালবাহকদের র‍্যাশন দেওয়া, রাতের এবং সকালের প্রার্থনা পড়ানো, ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ ডিউটি অফিসারকে করতে হয়। এমন ঘনঘোর বরষায় আমি ডিউটি অফিসার হলাম। ফলে আমাকে বিলক্ষণ ভিজতে হল।

রাত্রিতেও বৃষ্টির বিরাম নেই। তাঁবু ভেদ করে জল ঢুকছে। স্লিপিং ব্যাগের উপর টুপ টুপ করে জল পড়ছে। স্লিপিং ব্যাগ ধীরে ধীরে ভিজে উঠছে। এয়ার ম্যাট্রেস্ ভিজে গেল। সব টের পাচ্ছি। কিন্তু কী করব? অ্যালকাথিনের চাদর তাঁবুর উপরে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু যদি জল বাধা না মানে তো কী করতে পারি, চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া? তবু আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা অ্যালকাথিনের চাদর আই-সি-আই কোম্পানির কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তা নইলে এতক্ষণে তাঁবুর ভিতর বন্যা বয়ে যেত। আমার টেন্ট পার্টনার মদন। আমরা দুজনে অন্যান্যদের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

বিশ্বদেবও পরিশ্রান্ত হয়েছে। তবুও সেই ক্লান্ত শরীরেই দিনলিপি লিখতে বসল। মোমবাতির আলো স্থির থাকে না। তাঁবুর ফোকর দিয়ে সামান্য একটু বাতাস ঢুকলেই নিবে যাবার ভয়ে সেই ক্ষীণজীবী আলোটা যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে। তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ছে। শব্দ হচ্ছে পটর পটর।

লিখতে লিখতে নানাকথা মনে আসতে লাগল বিশ্বদেবের। বিশেষ করে ট্রেনিং পিরিয়ডের দিনগুলো এখন যেন মনে ভাসতে লাগল। পর্বতারোহণে ট্রেনিং নেওয়া আর নিজেরা অভিযান সংগঠন করা—এই দুটো কাজের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। ট্রেনিংয়ের কলাকৌশল সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান সে পেয়েছে। সেটা ছিল ছক-বাঁধা কাজ। কিন্তু তাতে কোনরকম দায়িত্ব ছিল না, কোন ঝুঁকি ছিল না। আর এখন, প্রতি পদে প্রতিবন্ধকতা। প্রতি রাত্রে দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য দুর্ভাবনা। এ অন্য জিনিস।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বিশ্বদেব। হঠাৎ মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ শীত করছে তার। ঠক ঠক করে সে কাঁপছে। দারুণ কাঁপুনি। স্থির থাকতে পারছে না বিশ্বদেব।

তবে কি তাকে ম্যালেরিয়ায় ধরল? দেশে থাকতে আগে তার ম্যালেরিয়া হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেই ভাল হয়ে গিয়েছে। তবে? বিশ্বদেব কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে বুকে পেটে পিঠে ব্যথা হয়ে গেল। হাত-পা ঝিনঝিন করতে লাগল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। বেদম কাশি শুরু হল তার। তবে কি এই ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হল তার? বেজায় ভয় পেয়ে গেল বিশ্বদেব।

"মদন, মদন!"

মদন সাড়া দিল না।

"মদন, এই মদন।"

"উঁ।" ক্ষীণস্বরে সাড়া দিল মদন।

"মদন, ডাক্তার ডাক্ শিগ্‌গির। ডাক্তারকে খবর দে। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

মদন মিনমিন করে বলল, "ফ্লাস্কে গরম জল আছে, খেয়ে নে। ভাল লাগবে। তাতেও যদি ভাল না হোস, তখন ডাক্তারকে ডেকে আনব।"

বিশ্বদেব চটে গেল মদনের উপর। কী স্বার্থপর! আমি মরতে বসেছি, বিশ্বদেব ভাবল, আর উনি ঘুমুচ্ছেন। পাছে উঠতে হয়, তাই গরম জল খাবার উপদেশ দিচ্ছেন।

মদন বলল, "তুই স্লিপিং ব্যাগের ভিতর নাক-মুখ ঢুকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর্ বিশ্ব। যদি না পারিস, বলিস, ডাক্তারকে ডেকে আনব। তুই ঘুমো বিশ্ব। ভয় নেই, আমি জেগে আছি।"

মদনের কপালে বিশ্বদেবের হাতটা পড়তেই বিশ্বদেব চমকে উঠল। আরে বাপ্, এ কী! মদনের কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে! বিশ্বদেবের হাতে যেন ছ্যাঁকা লাগল।

বিশ্বদেব ভয়-ভয় গলায় বলল, "এ কী রে মদন?"

মদন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমারও জ্বর এসেছে বোধ হয়। খুব কাঁপুনি হচ্ছে।"

"বোধ হয় কী রে, এ তো বেশ জ্বর। আমাকে ডাকিস নি কেন?"

"ভাবলাম সেরে যাবে। এত পরিশ্রমের পর ঘুমিয়েছিস, মিছে কেন কষ্ট দিই!"

"ডাক্তারকে ডাকি, কী বলিস?"

মদন শান্তভাবে বলল, "ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? এত পরিশ্রমের পর শুয়েছে বেচারা। এত রাত্রে আবার কষ্ট দিবি? তোর এখন কেমন লাগছে?"

একটু পরে বিশ্বদেব জবাব দিল, "ভাল। তোর?"

মদন বলল, "ভাল।"

দুজনের কেউই আর কথা বলল না। ভিজে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর সমস্ত শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি রোধ করার চেষ্টা করতে লাগল। আর আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল, কখন ভোর হবে!

॥ উনত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

ঘন্যাকুল ৪ঠা অক্টোবর। এখনও বিকাল চারটে বাজে নি, অথচ আমরা কেউ মার্চ করছি নে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বসে আছি। বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য কীই বা করতে পারতাম! তাঁবুতে বসে দিনলিপি লিখছি! এই চিন্তাটাও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর! আমাদের তাঁবুটা বেশ হাল্কা। হাই অলটিচ্যুড্ তাঁবু। সবুজ রঙ। একটু উঁচু। মাথা সোজা করে বসা যায়। সুকুমারকে ধন্যবাদ, এমন তাঁবুটাই আমাদের জন্য ছেড়ে দিলে! আমার তাঁবুর আর-একজন শরিক বীরেনদা। ওদিকে সুকুমার আর ধ্রুব, বিশ্বদেব আর মদন, দিলীপ আর নিমাই এক-একটা তাঁবুতে জায়গা পেয়েছে। ডাক্তার কর বললেন, অসুস্থ আজীবাকে তাঁর তাঁবুতে রাখতে। একটা ছোট তাঁবু ছিল, সর্দার আঙ শেরিং তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। দুটো ত্রিপল সঙ্গে ছিল। একটা দিয়ে মালপত্র ঢাকা হল। আর-একটা দিয়ে কিচেন বানান হল।

শেরপারা খুঁজে খুঁজে একটা পাথুরে খোঁড়ল বের করেছে। পাথরটা এমন-ভাবে হেলে আছে একদিকে, যেন একটা ছাত, যেখানে বেশ প্রশস্ত একটা গুহার মত হয়ে গেছে। শেরপারা গুহার মুখটার উপরে ত্রিপল দিয়ে ছাউনি করে দিলে।

এখন বৃষ্টি ঢোকে সাধ্য কি? এটা হল আমাদের কিচেন, ডাইনিং রুম আর বৈঠকখানা। বাকী শেরপারা এখানেই শোবার ব্যবস্থা করল। দিলীপ রেডিওটাও এখানেই বসিয়ে দিলে।

আমাদের তাঁবু যে জায়গায়, কিচেন সেখান থেকে একটু দূরে হল বটে, তবু বলতেই হবে, ধারে-কাছে এর চেয়ে আর ভাল জায়গা ছিল না। সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে। রেডিও সিলোন ধরে হিন্দী গান শোনা হল। সেই গানের সঙ্গে আমার আর নিমাইয়ের নৃত্যও হল খানিক। তারপর কফি খেয়ে গরম জলের বোতল নিয়ে যে যার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বিকালে বসে বসে খাতায় একটু আঁচড় কেটেছিলাম। আবার খাতাটা নিয়ে বসলাম।

তাঁবুতে ঢোকা আর সেখান থেকে বের হওয়া এক দারুণ কসরতের ব্যাপার। প্রথমত আমাকে তাঁবুর মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে উপুড় হয়ে, কিন্তু ভিতরে যাওয়া মাত্র শরীরটিকে উল্টে চিত করে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর ফেলে দিতে হবে। এই প্রথম কসরতের পর দ্বিতীয় কসরতের পালা শুরু হবে জুতো খোলার সময়। আমার ভুঁড়িটি এতদিন স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠেছে। পাহাড়ী পথে চলার সময় তার স্বাধীনতায় প্রায়শই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে তার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল। তাই, মাঝে মাঝে আমার বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভুঁড়িটি বিদ্রোহ করে আপন অস্তিত্বটি জানিয়ে দিত। বিশেষ করে জুতো খোলা বা পরার সময় আমার হাত এবং জুতোর মধ্যে বেশ ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখত। কী আর করব, হাঁসফাঁস করতে করতে জুতোর ফিতে খুলতে হল। তৃতীয় কসরতটি হল শরীরটাকে সেই সামান্য একটুখানি জায়গার মধ্যে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢোকানো এবং সেখান থেকে বের করে আনা। প্রায় জামাই-ঠকানো প্রক্রিয়া আর কী?

বীরেনদার শরীরটা আমার থেকে অনেক বেশী চটপটে। আমি যতক্ষণে জুতো খুলে পা দুটো ভিতরে এনেছি ততক্ষণে বীরেনদার স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢোকা সারা। •

যা হোক, তবু এই বিড়ম্বনাও আমার ভাল লাগছে। আমার আনাড়িপনায় বীরেনদা হাসে। আমিও হাসি। বেশ মজাই লাগছে। ঘন্যাকুল জায়গাটা ছবির মত। একটু দূরে বৃষ্টির জলে স্ফীত হয়ে একটি স্রোতোধারা প্রচণ্ড গর্জন করে প্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে নিচে। এই শব্দটা সেই অপরিসীম নির্জনতার মধ্যে অনেকগুণ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল ধোটিয়াল মালবাহকদের কথা। এই বৃষ্টিতে তারা কোথায় গেল? কোথায় আশ্রয় নিল? রিনিতে তবু লোকালয় ছিল। এরা সে সব জায়গাতেই আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এখানে?

শেষ লোকালয় ছেড়ে এসেছি মোরনা গ্রামে। আর লোকালয় নেই কোথাও। তবে ওরা এই বৃষ্টিতে আশ্রয় নেবে কোথায়? বেচারী সব! ভাবনা হল ওদের জন্য। বীরেনদা ভাবছে তার ক্যামেরার কথা। আক্কেল সিংয়ের পিঠে এই সব ক্যামেরা বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই রকম বৃষ্টি পড়লেই তো হয়েছে। একটু জল ঢুকলেই বারোটা বেজে যাবে ক্যামেরার।

তাঁবুর ভিতরে জল চুঁইয়ে পড়ছে। স্লিপিং ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস ভিজে উঠেছে। বীরেনদা ক্যামেরার জন্য উসখুস করছে। বেশ ঘুম পাচ্ছে আমার। আজ এই পর্যন্ত।

ডাক্তারের দিনলিপিতে লেখা ছিল :

৪ঠা সকালে এলাম ঘন্যাকুল। বৃষ্টি। কারোরই জামাকাপড় পর্যাপ্ত ছিল না। তাই অনেকেই সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে রক্ষা পায় নি। পথে, মোরনা গ্রামে চিকিৎসা করতে হয়েছে। গ্রামশুদ্ধ প্রায় সবাই রোগী। অধিকাংশেরই ব্যাধি হচ্ছে পেটের, গলার আর চোখের। এক যুবক চাষী এল। বেশ সুন্দর দেখতে। কিন্তু চলতে পারে না। দেখলাম হিপ জয়েণ্টে ব্যথা। ইনজেকশন দিতে হল। গুর্ণদিনের হিল ডায়ারিয়া হয়েছে। আজ একটু সুস্থ।

লেখকের দিনলিপি :

৫ই অক্টোবর। আবহাওয়া খুব খারাপ। সারাদিনেও আকাশ পরিষ্কার হল না। সত্যিই এবার ভাবিয়ে তুললে। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোতে বেশ বরফ পড়েছে। মেঘ আর কুয়াশা দলা পাকাতে পাকাতে অনবরত নিচু থেকে উপরে উঠে আসছে। জলভরা মেঘগুলো আমাদের তাঁবুতে এসেও যেন গুঁতো মারছে। ভেসে চলে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আমরা এখন সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে।

বিপদের উপর বিপদ। আমাদের গাইড্ থেলু সিং জানিয়ে দিলে, সে আমাদের সঙ্গে আর যাবে না। যেতে পারবে না। কী সর্বনাশ! আমরা চমকে উঠলাম। কেন থেলু সিং, কেন যাবে না তুমি? থেলু সিং বলল, দেখ সাব্, হাম বহোৎ বুড্ঢা হ্যায়। এই আবহাওয়ায় আমার মত লোকের সাধ্য হবে না, এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা। হাম বুড্ঢা হ্যায়, বহোৎ বুড্ঢা। সকেগা নেহি। তা সে কথা আগে বল নি কেন? এখন এই জঙ্গলে আমরা দুসরা আদমী কোথায় পাব? আমরা একটু গরম হয়ে উঠলাম। তোমাদের কি কৃতজ্ঞতাবোধ নেই থেলু সিং? এই যে আমরা মোরনায় এত লোকের চিকিৎসা করলাম, ওষুধ দিলাম তোমাদের! আর সেই তোমরা কিছুই করবে না আমাদের জন্য।

হাম বুড্ঢা হ্যায় সাব্। লেড়কা জওয়ান হ্যায়। লেড়কা যায়েগা। থেলু সিং এমন ভাবে কথা বলল, কেউ বুঝতে পারল না। লেড়কা জওয়ান হ্যায়। সব আচ্ছা জানতা। লেড়কা যায়েগা।

থেলু সিংয়ের কথা আঙ শেরিং বুঝল। বলে, কই তোমার লেড়কা? থেলু সিং বলে, আয়েগা। আলু লেকে আয়েগা।

আঙ শেরিং আমাদের বললে, ওর ছেলে আলু নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। সেই যাবে আমাদের সঙ্গে।

সত্যিই থেলুর ছেলে এল। মোরনাতে ওকে আমরা দেখেছি। লাজুক খুবই। বেশ সুন্দর চেহারাটি। নাম গোরা সিং। এইবার গাইডের সমস্যা মিটল। আর আশ্চর্য, এই জনমানবহীন প্রান্তরে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আমার রানার। বেশ চটপটে একটা লোক জুটে গেল আমার। নাম কেদার সিং। বিখ্যাত ভারতীয় পর্বতারোহী গুরুদয়াল সিংয়ের সঙ্গে খুব ঘুরেছে কেদার সিং।

বিশ্বদেবের দিনলিপি :

সকালে উঠেই আকাশের দিকে চাইলাম। আকাশ অপ্রসন্ন। মেঘ-মেঘ, কালো কালো মেঘ সারা আকাশ ছড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। সকালের খাবার কেউ যেন আর ভাল মনে মুখে তুলতে পারছি নে। মেজাজ নেই কারও। গতকালও যে সব পাহাড় পরিষ্কার ছিল, আজ দেখি সে সব বরফে ঢেকে গিয়েছে।

ওই বরফ যেন বিরাটাকার কোন জন্তুর ধারালো দাঁত। ভেংচি কাটছে, বিদ্রূপ করছে আমাদের অসহায় অবস্থাকে।

ঘন্যাকুলের পরের হল্ট ঠিক হয়েছে গোপাতে। কিন্তু গোরা সিং (আমাদের নূতন গাইড্) জানাল, গোপা পর্যন্ত বরফ পেঁৗছে গেছে বলেই তার মনে হয়। এই অবস্থায় আজ যদি আমরা এগোই তবে মালবাহকদের বিপদ হতে পারে। তাদের গায়ে তেমন গরম পোশাক নেই, পায়ে জুতো নেই; চোখের রঙীন চশমাও নেই। শীতের কষ্টের কথা ছেড়েই দিলাম, খালি পায়ে, খালি চোখে বরফের উপর দিয়ে হাঁটলে মালবাহকদের পা এবং চোখের ক্ষতি হবার আশংকা আছে। আঙ শেরিং পরামর্শ দিলে, আজ যাত্রা স্থগিত রাখ। আমরা সর্দারের পরামর্শ গ্রহণ করলাম।

আজ বৃষ্টি শুধু নেই, হাওয়ার ঝাপটাও আছে। এখানেই এই, উপরে ব্লিজার্ড হচ্ছে কি না, কে বলবে?

ত্রিপল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে কিচেন ভিজে যাচ্ছে। দুটো ত্রিপলে কুলোয় নি। আটা চাল চিনি আলু যদি ভেজে তবে তো চিত্তির! মনে হচ্ছে রান্নার সরঞ্জাম কমই আনা হয়েছে। আরও দুটো প্রেসার কুকার, কয়েকটা স্টোভ, কিছু বেশী করে কারি পাউডার আনলে ভাল হত।

লেখকের দিনলিপি থেকে :

আজও সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া চুকে গেল। ভাত আর ভেড়ার মাংস। গতকালের "ডিনারের"ও এই একই মেনু ছিল। ভেড়াটা মারা হয়েছিল রিনিতে দু দিন আগে। সেই মাংস কাঁচা অবস্থায় আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। একটু একটু করে আমরা সেটা গলাধঃকরণ করছি। আশ্চর্য, একটুও নষ্ট হচ্ছে না। মদনের জ্বর হয়েছে। ওকে একটু কাহিল লাগছে। তবে সে কাহিল হয়েছে দেহে। মনে সে এখনও তাজা।

দু দিন বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুর আশ্রয়ে কাটিয়ে দিলাম। আজও সকাল সকাল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভিতরকার বাতাস ভিজে-ভিজে, ভারী ভারী লাগল। আজ কেন যেন চট করে আর ঘুম আসতে চাইছে না। কতক্ষণ জেগে ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। অকস্মাৎ প্রচণ্ড হৈ-চৈ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বীরেনদাও দেখি তড়াক করে উঠে পড়েছে। বাইরে থেকে নিমাইয়ের গলা শোনা গেল। দিলীপও চেঁচাচ্ছে। "বাইরে এস, বাইরে এস জলদি।" কী হল রে বাবা, এত রাত্রে! জুতো-ফুতো এঁটে বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুর বাইরে। বেরিয়ে দেখি বিরাট জটলা। সবাই এসে গেছে। আকাশের দিকে আঙুল তুলে ওরা বললে, "দেখ, দেখ।"

দেখলাম, বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার চাঁদ মুখ বার করে হাসছে। কালো কালো মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। এক অপার্থিব আলোছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। এই পরিবেশে আমাদের ঘোর লেগে গেল। সবাই চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, গান করছে, নাচছে, কোলাকুলি করছে। সবাই যেন পাগলা হয়ে গেছি।

তাঁবুতে ঢুকে পর্দাটা বাঁধবার আগে আবার একবার আকাশের দিকে চাইলাম। আকাশে তখনও পূর্ণচাঁদের মায়া বিরাজ করছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আরে তাই তো, আজ যে কোজাগরী পূর্ণিমা। আমাদের বাড়িতে তো আজ লক্ষ্মীপুজো। ওরা নিশ্চয়ই আলপনা দিয়েছে। স্পষ্ট সব ভেসে উঠল চোখে। চাঁদের আলোটাকে, কেন জানি নে, আমার দস্যি মেয়ে ঝুমুরের দুষ্টু

দুষ্টু হাসির মতই মনে হল। মনে পড়ল, আসবার সময় সে কেঁদে গড়িয়ে পড়েছিল। সেই কান্না যেন যোজন যোজন ব্যবধান অতিক্রম করে পাহাড়ী নদীর আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আশ্চর্য, এতদিন বাড়ির কথা একবারও মনে হয় নি। পাহাড় কত স্বার্থপর! আর কারও কথা মনে পড়তে দেয় না।

॥ ত্রিশ ॥

নেচে কুঁদে গান গেয়ে, তারপর আবহাওয়া ভাল করে দেবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে ওরা ফের যখন তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকল, তখন বেশ রাত।

তারপর রাত পোহাল। অন্ধকার তখনও কাটে নি। তাঁবুর দরজা ঠেলে একখানা আবছা হাত সুকুমারের মাথার কাছে এগিয়ে গেল। "সাব্ চা, গুড্ মর্নিং লীডার সাব্, গুড্ মর্নিং ম্যানেজার সাব্, চা।" কুক হরি সিংয়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। সুকুমার অতি কষ্টে চোখ মেলল। অন্ধকার। তাঁবুর ভিতর বেশ অন্ধকার। চোখ দুটো রগড়ে নিল সুকুমার।

বলল, "গুড্ মর্নিং হরি সিং।"

হাত বাড়াল। দু হাতে দু মগ চা নিল। একটা হাত ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে দিল।

"ধ্রুব, এই ধ্রুব, চা।"

ধ্রুব একটু বিরক্ত হল। তার ঘুম পোরে নি। খুব চটে গেল হরি সিংয়ের উপর। সুকুমারের হাত থেকে মগটা প্রায় এক হেঁচকায় ছিনিয়ে নিল। এক চুমুক গরম চা পেটে পড়তেই মেজাজটা বশে এল। নাঃ, হরি সিং লোকটা কাজের আছে। ধ্রুব প্রফুল্ল মনে চায়ের মগটি খালি করে দিল। তারপর কালবিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল। এবারে ঘণ্টাখানেক নিদ্রা। সদ্য তার শরীরটি এলিয়ে এসেছে, অমনি "গুড্ মর্নিং, গুড্ মর্নিং সাব্" শুনে সে চমকে উঠল। এই রে, সেরেছে! আঙ ফুতার!

ধ্রুবর আন্দাজ মিথ্যে হবার নয়। সত্যিই আঙ ফুতার। হাতে মালটি-ভিটামিন ট্যাবলেট।

"গুড্ মর্নিং সাব্।"

"গুড মর্নিং ফুতার সাব্।"

"ট্যাবলেট্ সাব্।"

"দেও সাব্।"

ধ্রুব সুবোধ বালকের মত ট্যাবলেট দুটো নিয়ে নিল। না নিলে কী হয়, নিমাইয়ের অভিজ্ঞতার পর ধ্রুব আর তা যাচাই করতে ভরসা পায় নি। ডাক্তার আঙ ফুতারকে ভার দিয়েছিল, যতজন ক্লাইম্বার আছে, প্রত্যেককে সকালে দুটো বিকালে দুটো ভিটামিন ট্যাবলেট খাইয়ে যেতে। আঙ ফুতার অতি বিশ্বস্তভাবে তার দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল। নিমাইয়ের আবার ট্যাবলেট-ফ্যাবলেট মুখে রোচে না। ও তাই আঙ ফুতারের হাত থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আঙ ফুতারকে কর্তব্য-চ্যুত করা নিমাইয়ের কর্ম নয়। নিমাই 'বনমালীবাবুর বাড়ি'তে গিয়ে সবে বসেছে, হঠাৎ "গুড মর্নিং সাব্" শুনে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার তখন পুরোপুরি আন-রেডি অবস্থা।

আঙ ফুতারের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে দুটো ট্যাবলেট নিমাইয়ের দিকে

বাড়িয়ে দিল। একগাল হেসে বলল, "সাব্, ট্যাবলেট।" এবং নিমাইকে সেই অবস্থায় ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করতে হল।

এ-কাহিনী প্রচারিত হবার পর ফুতারের তো পোয়া বারো। কার সাধ্য রোধে তার গতি!

"গুড্ মর্নিং সাব্।"

"গুড্ মর্নিং ফুতার।" বিশ্বদেব তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল। "দে দো বাবা ট্যাবলেট।"

"গুড্ মর্নিং মণ্ডল সাব্।"

"বুঝা হ্যায় বাবা, বুঝা হ্যায়।" মদনের আত্মসমর্পণ কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল। "বিশ্বাস সাব্‌কো হাতমে দিয়ে দাও। হাম খা লেগা। উঃ, ডাক্তার মাইরি আর লোক পেল না!"

বিশ্বদেব সাড়া দিল না। সে তখন তাঁবুর বাইরে মাথা বের করে আকাশ দেখছে। বিশ্বদেবের মুখটা কালো হয়ে গেল।

মদন জিজ্ঞাসা করল, "কী রে, আবহাওয়ার অবস্থা কেমন?"

বিশ্বদেব গম্ভীরভাবে বলল, "একই রকম। কোন পরিবর্তন নেই।"

মদন বলল, "তা হলে উপায়! আজও হল্ট্ নাকি?"

বিশ্বদেবের মনেও এ-আশঙ্কা উঁকি মেরেছিল। আবার সে আকাশের দিকে চাইল। আকাশে তখন দুর্যোগের সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে। আজও কি আমরা এখানে আটকে থাকব? আর এইভাবে আটকে থাকা মানে কী? প্রতিদিন প্রায় ৮০০ টাকা লোকসান। তার চাইতেও বড় কথা, ঠিক সময়ে বেস্ ক্যাম্প স্থাপন করবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

শের সিং এসে সুকুমারকে বলল "সাব্, নন্দাদেবীর পুজো দাও তোমরা। একটা ভেড়া আর টাকা মানত কর। না হলে দুর্যোগ যাবে না।"

সুকুমার দশটি টাকা মানত করল। শের সিং কপালে লাল টকটকে ফোঁটা পরে উঁচু একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগল। সুকুমার হুকুম দিলে, তাঁবু ভাঙো। আজ মার্চ হবে।

মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। পাহাড়ের পর পাহাড় বরফের আস্তরণে ঢাকা। বৃষ্টির প্রশ্রয় পেয়ে পাহাড়ী নদীর স্রোত প্রপাতের গর্জন তুলছে। শের সিংয়ের লম্বা লিকলিকে চেহারাটা, লাল ফোঁটা সমেত, যেন একটি কাপালিক। মালবাহকেরা, শেরপারা, অভিযাত্রীরা মালপত্র গোছগাছ করে নিতে বড়ই ব্যস্ত। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল সেখানে।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

> বেরতে বেরতে সাড়ে নটা হল। তখনও ঘন মেঘে চারিদিক ছেয়ে আছে। আজ মার্চ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই চড়াই শুরু হয়েছে। আর, সে-চড়াই ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। গৌরদা, বীরেনদা, ডাক্তার পর্বতে এই প্রথম। ওঁদের জন্য ভাবনা হচ্ছিল। তবে ওঁরা বেশ চলেছেন। শম্বুক গতি বটে, তবে অগ্রগতিতে ভাঁটা পড়ছে না। আজও আমরা পুরো দল একসঙ্গে হাঁটছি। গৌরদার গতি সব থেকে ধীর। তাই দলটার গতিও ধীর। এতে অসুবিধে হচ্ছিল আমার, মদন আর দিলীপের। আমাদের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে থাকায় আমাদের পরিশ্রম বেড়ে যাচ্ছিল। অস্বস্তিও লাগছিল।
>
> চড়াই ভাঙতে প্রায় নয় হাজার ফুট উপরে উঠলাম। এখন জঙ্গল আরম্ভ

হয়েছে। খুব যে উ'চু গাছের জঙ্গল তা নয়। গাছগুলি নিচু নিচু, তবে খুব ঘন। আমার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে কোন জ্ঞান নেই। যা হোক, আমার কাছে যা ভাল লাগল, আশ্চর্য লাগল, তার কিছু কিছু নমুনা আমার পিঠঝুলিতে ভরতে লাগলাম। মালবাহকদের জিজ্ঞাসা করে করে সে সব জিনিসের গাড়োয়ালী নাম সংগ্রহ করতেও শুরু করলাম।

রোডোডেনড্রনকে এরা বলল চিমালা। ভূর্জপত্রের গাছ—বনসুর, এদিকে প্রচুর। বনসুরের ফল অনেকটা আঙুরের মত দেখতে, রঙটা কালো হয়। মালবাহকেরা তো বলল যে, এ-ফল ওরা খায়। এক রকম গাছের পাতা, খানিকটা ডুমুরের পাতার মত—তার নাম বললে, আঁইশালু। গাছটি মাথায় বাড়ে ছ-সাত ফুট। থোকায় থোকায় ফল হয়। একসঙ্গে আট-দশ থোকা। দেখতে এলাচের দানার মত। পাকলে লাল হয়। এ ফল ওরা খায়। আর-এক রকম গাছ দেখলাম, পাতা আমাদের দেশের তিতফলতা পাতার মত। নাম বললে, ফাঁপর। এ-গাছ পাঁচ-ছ ফুট উ'চু। এর পাতা ভেড়াতে খায়, ফল খায় মানুষে। চুথ্যো বলে যে-গাছ দেখাল, তা একেবারে আমাদের বৈ'চি ফলের গাছের মত। এর ফলও ওরা খায়। এ ছাড়া আলিয়া, দোলিয়া, চুলিয়া, ধূপপাতি, বন-রসুনের গাছও ওরা আমাকে দেখাল। শেরপারা বন-রসুনের গাছ সংগ্রহ করে নিল। বললে, চাটনি বানাবে। আট থেকে এগারো হাজার ফুটের মধ্যে এসব গাছ পেলাম।

বন-জঙ্গলের অবস্থা, বিশেষ করে ঘন আগাছার জঙ্গলই আমাদের জানিয়ে দিল, এদিকে বেশ বৃষ্টি হয়। বর্ষার প্রারম্ভ থেকে আর শীতের আগ পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ে এদিকে। সত্যি এদিকে এত বৃষ্টি যে, বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পচে গেছে। ধ্রুবকে কয়েকটা নমুনা দেখালাম। ধ্রুব বললে, শুধু গাছ কেন, ওই দেখ্, পাথর পর্যন্ত পচে গেছে।

প্রায় দশ হাজার ফুট উঠে দেখি রোডোডেনড্রনের জঙ্গল শুরু হয়েছে। সে জঙ্গল এত ঘন যে, গাছ কেটে মাঝে মাঝে আমাদের পথ বার করতে হয়েছে।

লেখকের দিনলিপি :

ফারাখড়ক, ৬ই অক্টোবর। আজ এখানে (১১০২৫ ফুট) [illegible] দেড়টায় এসে পৌঁছেছি। ঘন্যাকুল থেকে দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়েছিলাম। আশেপাশে মেঘের চক্রান্ত দেখে মনে হয়েছিল, আজ বিলক্ষণ ভিজোবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, একটুও বৃষ্টি পড়ল না মোটে! রোদও একটু উঠে পড়ল।

আজ বেশ চড়াই ভাঙতে হয়েছে। মাত্র মাইল তিনেক এসেছি। কিন্তু ছেদহীন চড়াই ভাঙতে গিয়ে দম বেরিয়ে গেছে। একে বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের গা পিছল, তার উপর খাড়া চড়াই, তবু এই বিপজ্জনক পথ চলতে আমার একটুও ভয় করে নি, খারাপ লাগে নি। একবার মারাত্মক আছাড় খেলাম। পা হড়কে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়লাম। বাঁ পাশে ছিল অতলস্পর্শী খাদ—সাক্ষাৎ মৃত্যু, ডান দিকে পাহাড়ের প্রাচীর—আশ্রয়। আর একচুল বাঁয়ে হেললেই খাদে পড়ে যেতাম। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে শরীরটা ডান দিকে মোচড় খেয়ে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। আমার দুর্গতি দেখে সবাই হাসল। আমার একটুও রাগ হল না। হাসতে লাগলাম। পিঠঝুলিটার টানে কাঁধে ব্যথা লেগেছিল। উপেক্ষা করলাম।

সত্যি বলতে কী, আজ আমার সামনে মদত, পিছনে মদত ছিল। আমি

যেন দার্জিলিঙের ছোট রেল। সামনে ইঞ্জিন, পিছনে ইঞ্জিন। সামনে সুকুমার, পিছনে আঙ ফুতার। ঠিক রাজার হালে পাহাড়ে চড়ছি।

প্রথমে ঠিক ছিল গোপাতে বিশ্রাম নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা আরও আধ মাইল এগিয়ে গেলাম। চারিদিকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ওরই মধ্যে একটু সমতল জায়গা বের করে তাঁবু খাটানো হচ্ছে। বীরেনদার এনার্জির আর শেষ নেই। ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে। আমার আর ডাক্তারের মাথা ধরেছে। কয়েকজন মালবাহকেরও মাথা টিপ টিপ করছে বলে জানা গেল। ডাক্তার জোলাপ খেল।

তারপর মালবাহকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা শুরু করল। একজন মালবাহককে খারিজ করে দিলে। সে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় ভুগছে। আবার আজীবা অসুখে পড়ল। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। ডাক্তার বেশ করে পরীক্ষা করে দেখে বললে, ভয় নেই, সেরে যাবে।

আমরা আর সবাই বেশ ফিট ছিলাম। খুব ফুর্তি আছে সকলের মনে। এখন 'বাবা' ওয়েদার প্রসন্ন থাকেন তবে হয়।

এই যে, বলতে-না-বলতেই কেলেঙ্কারি। এতক্ষণ বেশ আলো ছিল। এখন মোটে চারটে। দেখতে না দেখতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী মেঘ উপর থেকে ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসছে। চারিপাশের নিচু নিচু উপত্যকা থেকে সোঁ-সোঁ করে মেঘ উপরের দিকে উঠে আসছে। আলোর তেজ কমে এল। কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। আর-একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছিনে। নাঃ, তাঁবুতে ঢোকাই ভাল।

॥ একত্রিশ ॥

গত রাত্রে খাবার সময় ঠিক হল, এবার দলটা দু ভাগে ভেঙে দেওয়া যাক। নইলে অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। কেউ দ্রুত চলতে পারে, কেউ চলছে ধীরে। এতে দেখা গেল, দলের উপর অহেতুক একটা চাপ পড়ছে। তাই ঠিক হল, যারা দ্রুতগামী তারা এবার থেকে এগিয়ে যাবে। এ ছাড়া, অ্যাড্‌ভান্স পার্টি তৈয়ারি করার আর একটা কারণও ছিল। আমরা যতই উঠছি, ততই পাহাড়ী নদী আর ঘন জঙ্গলের প্রতিরোধ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করছে। ছোট্ট একটা নদী, কিন্তু তারই বা কী তেজ! পাথর কুড়িয়ে এনে নদীতে সেতু বাঁধতে হয়, তবে আমরা পার হতে পারি। আর জঙ্গলের কথা কী বলব! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, কথাটা এতদিন শুনেই এসেছি। ওর মর্মার্থ কী, এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এদিকে কঞ্চির ঝাড় এত বেশী আর এত ঘন যে প্রতি পদে শেরপারা কুকরি চালিয়ে পথ পরিষ্কার করেছে। তবু নাকি আমাদের ভাগ্য ভাল। দক্ষিণের পথে (রানীক্ষেত-সুতোল হয়ে যে পথ, যে পথে আগেকার অভিযানগুলো গিয়েছিল) কঞ্চির দৌরাত্ম্য নাকি আরও বেশী।

জঙ্গল কেটে পথ বানাতে, এক এক জায়গায় সেতু বাঁধতে তিন-চার ঘণ্টাও দেরি হয়। তাই ঠিক হল, যারা দ্রুত চলতে অভ্যস্ত, এবার থেকে তারা এগিয়ে যাবে। পথ বানাবে. সেতু বাঁধবে, তাঁবু ফেলবার জায়গা খুঁজে বের করবে।

প্রথম দিন যে অ্যাডভান্স পার্টি তৈয়ারী হল, তার নেতৃত্বের ভার দেওয়া হল বিশ্বদেবকে। বিশ্বদেব 'ড্যাম গ্লাড'। মালবাহক আর ক'জন শেরপা অ্যাডভান্স পার্টিতে যাবে। বিশ্বদেবকে বেশ তাজা লাগছে। সকাল সাতটার মধ্যে তাঁবু-টাবু গুটিয়ে

ফেলে 'ব্রেকফাস্ট' সারা হল। প্রার্থনা অন্তে "জয় বদ্রীবিশাল" বলে হুঙ্কার ছেড়ে বিশ্বদেব যেই যাত্রা করেছে, অমনি দেখা গেল মদন তার পিঠঝোলা তুলে নিয়ে বিশ্বদেবের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে। আমরা তো তাজ্জব। দিলীপ জিজ্ঞেস করল, "ও কী রে মদন, তুই ওখানে গিয়ে ভিড়লি কেন?" মদন দাঁড়ালও না। উঠতে উঠতে মুখ ফিরিয়ে বলল, "খানা ছোড়না, লেকিন সাথী নেহি ছোড়না। তা ছাড়া, বিশ্ব আমাদের কবি। বিশ্বকবি। এই বনজঙ্গলের ভিতর কোথায় কখন ময়ূর কি টিয়া দেখে ফেলুক, আর তারপর ওর ঠোকর খাওয়া হিয়াটা ভুল রাস্তায় পিয়া পিয়া করে ছুটে চলুক, তখন আমি ছাড়া ওকে সামাল দেবে কে?"

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

আজকের অ্যাডভান্স পার্টিতে আমি, মদন, সর্দার আঙ শেরিং, নরবু, গুণদিন আর টাসি ছিলাম। আর ছিল শের সিং তার বাহিনী নিয়ে। পথপ্রদর্শক গোরা সিং তো আছেই।

সোয়া সাতটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে সকালের খাবারটা বেশ পেট ভরে খেয়ে নিলাম। খাবারের মধ্যে দুখানা করে চাপাটি আর মগ-ভর্তি চা। এই হল ব্রেকফাস্ট। 'লাঞ্চ'টাও সঙ্গে নিলাম। লাঞ্চ মানে আলুর চাপাটি।

ফারাখড়ক থেকে যাত্রা করা মাত্র চড়াই শুরু হল। খুব যে খাড়া চড়াই, তা বলা চলে না। পাহাড়ের ঢাল থেকে আন্দাজ হল ১৪৫ অথবা ১৫০ ডিগ্রী কোণ হবে। তবে সোজাসুজি উঠতে হচ্ছিল বলে আজকে হাঁফ ধরে আসছিল। অবশ্য আজ আমরা অন্যদিনের তুলনায় দ্রুতই হাঁটছিলাম। শেরপাদের সঙ্গে সমান তালে। গত কয়েকদিন ধীরগতিতে এসেছি। হাঁটছি কি না, বুঝতেই পারি নি।

যাক, প্রথম চড়াইটা ওঠবার পর পাহাড়টা আরও একটু ঢালু হয়ে এল। চলতে একটু আরাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর-এক মুশকিল দেখা দিল। জঙ্গল ক্রমশ ঘন নিবিড় হয়ে উঠল। শেরপারা আগে আগে চলেছে। কুকরি দিয়ে তারা সমানে জঙ্গল কাটতে লাগল। রাস্তা বের হল। আমরা সেই রাস্তায় মালবাহকদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। এদিকে রোডোডেনড্রনের বন প্রচুর। কোথাও কোথাও মাইলের পর মাইল শুধু রোডোডেনড্রনের গাছ। ফুলের মরসুম নয়। এ বড় আফসোস। আরও একটু লক্ষ্য করে দেখছি, আরও হরেক রকম গাছগাছড়া রয়েছে। বিশেষ করে, এখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করছে কাণ্ড আর জলবিছুটি। এত উঁচু অলটিচ্যুডে জলবিছুটি এই আমি প্রথম দেখলাম। ভাগ্যি শেরপারা কুকরি এনেছিল!

এখন দেখছি সাত থেকে বারো হাজার ফুট উপরে হিমালয়ে চলতে গেলে কুকরি বা কুড়ুল অপরিহার্য। আমরা গাছ কেটে, আগাছা মেরে পথ করতে করতে ক্রমশ উঠছি। কাটা গাছগুলোই পথের নিশানা হয়ে থাকছে। পরের দলটা এই নিশানা দেখেই এগিয়ে যেতে পারবে। যেখানে গাছ কাটার প্রয়োজন নেই অথচ নিশানা রাখতে হবে, সেখানে শেরপারা গাছের গায়ে কোপ মেরে চাকলা তুলে দিচ্ছে। যেখানে গাছ নেই, শুধুই পাথর, সেখানে আমরা জায়গায় জায়গায় পাথর সাজিয়ে রাখছি। এই সাজানো পাথর, এই সব কাটা-কাটা গাছপালা আমরা তো রেখে যাচ্ছি পিছনে। মাঝে মাঝে ভাবনা হচ্ছে ওদের নজরে এগুলো যদি না পড়ে! পাহাড়ের পথ বড় গোলমেলে। একবার খেই হারিয়ে ফেললে উদ্ধার পাওয়াই দায়!

ক্রমশ চড়াই কঠিন হতে লাগল। কখনও পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি, কখনও বা

পাশ কাটিয়ে। সঙ্গের মালবাহকদের দল কখনও পিছিয়ে পড়ছে। বড় দলটা ভেঙে ক্রমশ ছোট ছোট দল তৈয়ারী হয়েছে। তাদের কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও তারা অদৃশ্য হয়ে পড়ছে।

আজ কী জানি কেন, বড় নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছিল। আমরা সারাক্ষণ মুখ বুজেই চলছিলাম। ক্বচিৎ আমি আর মদন মুখ খুলছিলাম। এতদিনের চলার সঙ্গে আজকের তফাতটা বেশ বড় হয়েই ফুটে উঠছিল। এতদিন সমস্ত দলটা এক সঙ্গে এগিয়েছে। গদাইলস্করী চালে এগিয়েছে। দেখে মনে হত, এদের বুঝি তাড়া নেই। যতক্ষণ খুশী হাঁটছে, যতক্ষণ খুশী বসছে। হাসছে। কলরব করছে। সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীটাই যেন পিকনিক করার। ফলে ক্ষতি কী হয়েছে জানি নে, তবে এটা বলতে পারি, পথের কষ্ট এ ক'দিন একেবারে টের পাই নি।

পাহাড়ে 'হাই অলটিচ্যুড্ এফেক্ট' বলে একটা কথা আছে। খুব উঁচুতে ওঠার পর মন খারাপ হয়, মেজাজ গরম হয়, স্নায়ুগুলো তিরিক্ষে হয়ে পড়ে, একটুতেই রাগ হয়, এমন কী, নিজেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়। এ আমরা পড়েছি, শুনেছি, দেখেওছি।

আর আমাদের 'হাই অলটিচ্যুড এফেক্ট' হল ঠিক এর উল্টো। আমরা অতিরিক্ত হেসেছি। অত্যধিক ঠাট্টা-তামাশা করেছি। মাঝে মাঝে আমরা এমন হাসি হেসেছি যে, সর্দার আঙ শেরিং ছুটে ছুটে এসেছে, বার বার সাবধান করেছে : সাব্লোগ্ হিঁয়াপর হাঁসো মৎ। পাথর বাহাৎ লুজ হ্যায়। পাথর গিরেগা। হেসো না, এখানে তোমরা জোরে হেসো না। এখানকার পাথর বড় আলগা। সামান্য শব্দেই গড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু সর্দার যাই বলুক (যদিও তার কোন কথাই আমরা কখনও অমান্য করি নি) আমার তো মনে হয়েছে পাহাড়ে এসে যে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে, পাহাড় তার কাছে কাবু। পাহাড়ের সকল অসুবিধা, সব কষ্ট, তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ওঠে।

যারা হেসে গল্প করে মাতিয়ে পথ চলত, তারা সব পিছনের দলে আসছে। এখন তাদের অভাব খুব বোধ করছি। দুজন খবরের কাগজের লোক সঙ্গে আছেন। এই প্রথম এসেছেন পর্বত অভিযানে। রস তাঁদেরই বেশী। চলতে চলতে দেখেছি পরিশ্রমে ও'দের কেউ কেউ কাতর হয়ে পড়েছেন। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁদের সহনশীলতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। চলতে পারছেন না, বসে পড়েছেন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। যেই বুকে দম ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে এমন এক কড়া মন্তব্য করে বসলেন যে, হাসির দমকে যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আজ আমাদের সঙ্গে তাঁরা যে নেই, প্রতি পদে সেটা টের পাচ্ছি। সত্যি বলতে কী, আজই প্রথম মনে হচ্ছিল, সত্যিই পাহাড়ে চড়ছি।

চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে আনমনা হয়ে পড়ছিলাম। সে বরং ভালই হচ্ছিল এক দিক দিয়ে। সর্বদা পথ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকলে পথের কষ্ট বেড়েই চলে। আনমনা হওয়া ভাল।

একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। সামনে একটা পাহাড়। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। পথটা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। পথের বাঁকে মোড় নিতেই আমার চোখের সামনে আর-একটা পাহাড় ভেসে উঠল। দু হাজার আড়াই হাজার ফুট খাড়া উঠে গিয়েছে। পাহাড়টা আগাগোড়া বরফে ঢাকা।

বেস ক্যাম্প। মানচিত্র দেখে উপরের পথ সম্পর্কে আলোচনা করছেন অভিযাত্রীরা। (বাঁ দিক থেকে) : দিলীপ, সুকুমার, ডাঃ কর, লেখক, ধ্রুব

ফটো : বীরেন সিংহ

প্রথম শিবিরের পথে রাক্ষুসী ফাটল

ফটো : নীরেন সিংহ

দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়াবহ। বিস্মিত নেত্রে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মদনের ধাক্কায় ঘোর কাটল।

মদন বলল, "বিশ্ব, ওদিকটায় দেখেছিস?" মদনের কথামত চেয়ে দেখি মালবাহকেরা সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। সর্দার আঙ শেরিং উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে। মালবাহকদের মেট শের সিং যে ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, তা এতদূর থেকেই আমাদের বুঝিয়ে দিল সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কী জানি কেন, আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেছে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে পেঁাছে সর্দার আঙ শেরিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ব্যাপার?"

সে জবাব দেবার আগেই শের সিং চিৎকার করে বলে উঠল, "কৈ কুলিলোগ হিঁয়াসে এক কদম নেহি উঠেগা।"

আমি আর মদন তখনও ধাতস্থ হই নি। হাঁফাচ্ছি।

শের সিং আবার চিৎকার করে উঠল, "আপলোগ রুপেয়া দিজিয়ে ইয়া নেহি, কৈ বাৎ নেহি. লেকিন হামলোগ নেহি মরেঙ্গে।"

এই আশঙ্কাই করছিলাম। এই ধোটিয়াল মালবাহকদের সম্পর্কে অনেক কথা পড়েছি সাহেবদের বিবরণে। লোককে অসুবিধায় ফেলতে এদের চাইতে দক্ষ আর-কেউ নেই, এমন মন্তব্য সাহেব অভিযাত্রীরা হামেশাই করেছেন। এমন কী, এ কথাও বলেছেন, এই ধোটিয়ালদের জ্বালায় অনেক অভিযান পণ্ড হয়ে গিয়েছে। এবার বুঝি আর-একটা হয়।

শের সিংকে থামতে বলে আঙ শেরিংকে পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম. "ব্যাপার কী সর্দার?"

আঙ শেরিংয়ের মুখ থমথম করছে। সে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "গোরা সিং বলছে আমাদের এই পথে এগুতে হবে। কিন্তু কুলিরা যেতে রাজী নয়। পাহাড়ে বরফ আছে। ওরা ভয় পেয়েছে। কিছুতেই ওদের রাজী করাতে পারছি নে।"

আঙ শেরিংয়ের স্বরও কাঁপছে। সেও কি ঘাবড়ে গেল নাকি?

॥ বত্রিশ ॥

সামনেই রয়েছে পাহাড়টা। বিরাট তার উঁচু আর বরফ-ঢাকা। তার একেবারে নিস্তব্ধ। মদন একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে ছিল। সূর্যের আলো সেই জমাট সাদার উপর আছড়ে পড়ছে। কী প্রখর দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে সেই পাহাড়ের গা থেকে! চোখে ধাঁধা লাগে। মাথা ধরে আসে। মদন রুকস্যাক থেকে একজোড়া স্নো-গগল্‌স্‌ বের করে চোখে আঁটল। হ্যাঁ. এতক্ষণে সে আরাম বোধ করল একটু।

আবার সে পাহাড়টার দিকে চাইল। সুদৃঢ় প্রতিরোধ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা। তার ভাবখানা যেন এই: আমাকে পরাস্ত না করে তোমরা নন্দাঘুণ্টির দিকে পা বাড়াতে পারবে না।

মদন ধীরে ধীরে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল। ওই যে ধোটিয়াল মালবাহকেরা, বোঝা নামিয়ে সব বসে রয়েছে। বিড়ি ফুঁকছে, গল্প করছে। মাঝে মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চোখ মেলে সামনের পাহাড়টাকে দেখে নিচ্ছে। আর ওই যে শের

সিং, ওদের মেট্, একটা ছোট পাথরের উপর একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহী নেতার ভঙ্গীতে। ওই যে নরবু, ওই যে টাসি, গুনদিন, ওরা বসে নি. দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক। কেউ কেউ তুষার-গাঁইতিটা দিয়ে আলতোভাবে জমি সমান করছে। বিশ্বদেব কোথায় গেল?

ওই যে ওরা—বিশ্ব আর সর্দার, একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে। এখনও ওদের বিশ্রামের সময় হয় নি। লাঞ্চের বিরতিরও দেরি আছে। তবু ওরা কেউ নড়ছে না। সমস্ত দলটারই গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। মদনের কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।

বিশ্বদেব ডাকতেই মদন তার কাছে এগিয়ে গেল।

আঙ শেরিং বলল, "মণ্ডল সাব্, কুলিলোগ যায়েগা নেহি। বরফ না পড়লে এ ঝামেলা হত না। ওরা বরফকে বড় ভয় করে।"

আঙ শেরিং শান্তভাবে কথাটা বলল। মদনের মনে হল জজ সাহেবের মুখ থেকে যেন ফাঁসির হুকুম শুনল। কার ফাঁসি? কেন. মদনের। মদন না ট্রান্সপোর্ট অফিসার? বেস ক্যাম্প পর্যন্ত মাল পৌঁছে দেওয়া তারই না দায়িত্ব? এখন. মালবাহকেরা যদি এখান থেকে ফিরে যায়, ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে এরা ফিরে যাবারই মতলব করছে. তা হলে তো অভিযান খতম হয়ে গেল। আর কার জন্যে এমন কাণ্ড হল? মদনের জন্য। মদন নিজের কাঁধেই দোষ চাপাল।

বিশ্বদেব বলল. "তা হলে এখন কী করা যায় মদন?"

মদনের কানে বিশ্বদেবের সশঙ্কিত প্রশ্ন ঢুকল না।

মদন ভাবছিল. ফিরে যাওয়ার অর্থ কী? আজ যদি ওরা ফিরে যায়, অভিযান এইখানেই পণ্ড করে দিয়ে তা হলে অবস্থা কী দাঁড়াবে? পরে কোন অভিযান ওদের পক্ষে সংগঠন করা সাধ্য হবে কি? অসম্ভব। তার মানে বাংলাদেশের পর্বতারোহণ সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহের অকালমৃত্যু ঘটবে। আর তার জন্য কাকে দায়ী করবে ইতিহাস? অবশ্যই ট্রান্সপোর্ট অফিসার মদন মণ্ডলকে।

"কী রে মদন, ভাম্ মেরে গেলি যে!" বিশ্বদেব বলল, "কী করা যায় বল্?"

মদন ভাবছে। হ্যাঁ, আমাকেই দুষবে সবাই। বলবে. কে ছিল ট্রান্সপোর্ট অফিসার? মদন? তাই বল। সঙ্গীরা বলবে, মদন, মালবাহকদের উপর এই তোমার প্রভাব! এই তোমরা মুরোদ। ছি মদন, আগে জানলে. এ ভার তোমাকে দিতাম না।

"মদন. এই মদন। কী রে! কী ইয়ার্কি হচ্ছে। অ্যাঁ! কথা কানে ঢুকছে না. নাকি?" বিশ্বদেব অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

না না অসম্ভব, এ হতে পারে না। এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি নে। দেব না।

মদন আবার পাহাড়টার দিকে চাইল। পাহাড়টা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি বিরাট আর উঁচু আর হিংস্র। সাদা বরফ যেন উপহাসের এক প্রচণ্ড অট্টহাসি। সে অট্টহাসি এই জমাট শীতল স্তব্ধতা ভেদ করে মদনের মর্মে গিয়ে আঘাত করল। ওর পৌরুষে ঘা দিল। মুহূর্তের মধ্যে মদন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অন্তর থেকে সে প্রেরণা লাভ করল। প্রতিজ্ঞায় ভীষণ হয়ে উঠল। প্রকৃতি যত বাধাই সৃষ্টি করুক আজ, সেসব তারা চুরমার করে দেবে। হয় সফল হবে, নয় মরবে। মদন ভাবল, একটি মৃত্যু কিছু না। কারণ এই মৃত্যু বাংলাদেশের শত হৃদয়ে প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দেবে। আমরা কাপুরুষ নই. আমাদের চরম সান্ত্বনা হবে তাই।

"কী রে মদন।" বিশ্বদেব চেঁচিয়ে উঠল। "ধ্যানে বসলি নাকি? বলিহারি যাই বাবা তোকে। শিরে যে সংক্রান্তি এসে পড়েছে. বলি সে খেয়াল আছে?"

মদন শান্তভাবে হাসল। বলল, "এত উতলা হচ্ছিস কেন বিশ্ব? ব্যস্ত হোস নে। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।"

মদনের স্বরে বয়স্ক বলিষ্ঠ এক প্রত্যয় ফুটে উঠল। মদনের কথায় প্রশান্ত এক অভয়। বিশ্বদেবের অস্থিরতা মুহূর্তে কেটে গেল। বিশ্বদেব বিস্মিত হয়ে মদনের দিকে চাইল। সেই মদন তবু যেন সে-মদন নয়।

বিশ্বদেব বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য কী, বল্ তো।"

মদন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, পাহাড়ের চূড়ার দিকে আঙুল তুলে, "ওই ওখানে গিয়ে পৌঁছনো। কর্তব্য এই একটাই।"

"কিন্তু মালবাহকরা যদি না যায়?"

"সেই চেষ্টাই তো করতে হবে। শোন বিশ্ব, ওরা যে ভয় পেয়েছে, সেই ভয়টা ওদের ভাঙতে হবে। আমি ঠিক করেছি, ওদের বুঝিয়ে বলব। আয় আমার সঙ্গে।"

আঙ শেরিংয়ের সঙ্গে ওরা পরামর্শ করল। সর্দার সব ব্যাপারেই রাজী। মদন তখন মালবাহকদের জটলার কাছে এগিয়ে গেল।

মদন উঁচু একটা পাথরের উপর উঠে গলাটা চড়িয়ে বলল, "ভাই সব, যারা এর মধ্যে মরদ আছ, যারা পাহাড়ী মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছ, আমি তাদের কাছেই আমার আবেদন রাখছি। যেসব জেনানা এই দলে মর্দানার পোশাক পরে এসেছ তারা আমার কথা না-শুনলেও আমার আফসোস নেই। এখন শোন। যারা তাদের বন্ধুদের মাঝপথে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে চায়, তারা চলে যাক। তাদের এক পয়সা মজুরি আমরা কাটব না। কিন্তু যারা নিজের ইচ্ছেয় যেতে চাইবে, তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়। মনে রেখো, টিপ-ছাপ দিয়ে কণ্ট্রাক্টে সই করেছ।"

বেঁটে খাটো কর্ণবাহাদুর হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "হুজুর, সাব্..."

মদন বলল, "ভাই সব, আমরা কেউ সাহেব নই। আমাদের মধ্যে হুজুরও কেউ নেই। তোমরা যে ভারতের লোক, আমরাও সেই ভারতের লোক। তোমরা পাহাড়ী, আমরা সমতলের বাসিন্দা। এই মাত্র তফাত।"

মদন থামতেই কর্ণবাহাদুর হাতজোড় করে আবার উঠে দাঁড়াল। "হুজুর, সাব্! তোমাদের সঙ্গে যেতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ওই বরফে আমাদের যেতে বল না। দোহাই তোমাদের। খতম হয়ে যাব।"

বিশ্বদেবের বুক দুরদুর করে উঠল। আঙ শেরিংয়ের মুখ শুকিয়ে গেল। নরবু, টাসি, গুণদিন নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। মালবাহকেরা উৎকর্ণ। সকলের দৃষ্টি মদনের দিকে। মদন একটুও চঞ্চল হল না। তার মুখে সুদৃঢ় প্রত্যয়, তার কণ্ঠস্বরে সুগভীর প্রশান্তি।

"আমি কাউকেই মরতে বলছি না।" নিরুত্তেজ অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে মদন বলতে লাগল। "ওই পাহাড়ে মৃত্যু যদি ওত পেতে থাকে তবে সেখানে কাউকেই যেতে বলব না। কিন্তু শোন ভাই সব, আমরা সেখানে যাচ্ছি। আমি, বিশ্বাস আর শেরপারা—এই ক'জন শুধু যাব। তোমরা এখানে বসে বসে শুধু দেখ। আমাদের দেশে পাহাড় নেই, বরফ নেই। তবু আমরা ওই বরফের উপর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি। যদি আমরা মরে যাই, তোমরা ফিরে চলে যেয়ো। তোমাদের মজুরি ম্যানেজার দিয়ে দেবে। আর যদি দেখ আমরা মরি নি, উঠে গিয়েছি তা হলে তোমাদের মধ্যে যে কয়জন মরদ আছ তারা আমাদের সঙ্গে এসো। আর জেনানারা ফিরে চলে যেয়ো।"

মদন শের সিংকে ডাকল, "শের সিং!"

"সাব্!" শের সিং হাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে এল।

মদন তার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে বলল, "তু তো শের হ্যায়। সাচ্চা শের শিয়ালকা মাফিক কাম নেহি করতা হ্যায়।"

"জী সাব্।"

মদন বলল, "তোমারই জিম্মায় এদের সবাইকে রেখে যাচ্ছি।"

"জী সাব্।"

মদন পাথর থেকে নামল। তারপর কোনদিকে না চেয়েই নিজের রুকস্যাক ঘাড়ে তুলল। স্ট্র্যাপ দুটো ঠিক করে এ'টে নিয়ে আইস-অ্যাক্স্ তুলে নিল।

তারপর বলল, "আয় বিশ্ব।"

'জয় বদ্রীবিশালজীকি' আওয়াজ তুলে ওরা তিনজন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেই প্রবল প্রতিরোধের দিকে।

অসম্ভব খাড়া উৎরাই। তার উপর বরফ। নতুন বরফ। কোথাও কোথাও দু তিন ফুট পর্যন্ত বরফের আস্তরণ পড়ে গেছে। বরফ খুবই নরম, খুবই আলগা। ওরা ছ'জন লাইনবন্দী হয়ে চলেছে। পাছে চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে, তাই ওরা দড়ি বাঁধে নি। আঙ শেরিং পিছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। টাসি সেই নির্দেশ অনুযায়ী সামনে সামনে পথ কাটতে কাটতে চলেছে। টাসি অধিকাংশ সময়েই লাথি মেরে মেরে ধাপ কাটছে। ক্বচিৎ সে তুষার-গাঁইতি কাজে ল্যাগিয়েছে।

বিশ্বদেবের বেশ কষ্ট হচ্ছে। মদনেরও। হাঁফ ধরেছে। বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে বোধ হয়। একটু বিশ্রাম চাই। একটু থামলে হত না। নিচে মালবাহকেরা চেয়ে আছে ওদের দিকে। থামলে চলবে না। বুক যদি ফেটে যায়, যাক।

বিশ্বদেব নিচের দিকে একবার চাইল। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। মালবাহক-দের খুদে খুদে কতকগুলো পোকার মত দেখাচ্ছে। না, ওদের কারও মধ্যে কোনরকম চঞ্চলতা ত দেখা যাচ্ছে না। তবে কি উঠবে না ওরা? ফিরে যাবে?

বিশ্বদেবের পা হড়কে গেল। তুষার-গাঁইতিতে ভর দিয়ে কোনরকমে সামলে গেল। নাঃ, অন্যমনস্ক হলে চলবে না। বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। কিন্তু আর কতটা উঠতে হবে! আর পারছে না বিশ্বদেব। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে। কানের ভিতর ঝিঁঝি পোকার গান শুরু হয়েছে। একটু বিশ্রাম চাই, এবার একটু বিশ্রাম চাই। ঘাম কলকল করে বেরিয়ে চোখে মুখে ঢুকে পড়ছে। পা আর তুলতে পারবে না বুঝি। শরীর থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। তবু ওরা এগিয়ে চলেছে। থামবে না, কিছুতেই থামবে না।

হঠাৎ বিশ্বদেবের মনে হল, এ বুঝি তার চোখের ভুল। আবার ভাল করে চেয়ে দেখল। না, ভুল নয় তো। সত্যিই এই সাদা বরফের উপর দিয়ে একটা পিঁপড়ের সারি এগিয়ে আসছে। এখানে এত ঠাণ্ডায় পিঁপড়ে উঠবে কোত্থেকে! না না, পিঁপড়ে নয়, ওরা মালবাহক।

বিশ্বদেব তুষার-গাঁইতির উপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মদন, মদন, উ লোগ আতা হ্যায়, উ লোগ আতা হ্যায়।"

বিশ্বদেবের চিৎকারে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সত্যিই পিঠের উপর ঝোলা তুলে ওরা অতি কষ্টে উপরে উঠেছে। সবাই আসছে। মদনের বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। "জয় বদ্রীবিশালজীকি।"

॥ তেত্রিশ ॥

এখনও খানিকটা পথ বাকী আছে। মদন একবার উপরের দিকে চেয়ে ভাবল। তবে পাহাড়টার প্রতিরোধ অনেক শিথিল হয়ে এসেছে। মদন তুষার-গাঁইতি বরফে পুঁতে তার উপর দেহের ভারটা ছেড়ে দিয়েছে। বেদম হাঁফাচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছে বেজায়। একটু জল খেতে পারলে ভালই হত। কিন্তু তবু জল খেল না মদন। যদি সর্দি-গর্মি হয়। আবার সে উপরের দিকে চাইল।

একটু উপরে বিশ্বদেব এই একই কায়দায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। শেরপারা আরও উপরে উঠে গিয়েছে। ওরাও বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের মত তারাও হাঁফাচ্ছে। শেরপাদের সঙ্গে প্রায় তাল রেখেই ওরা উঠছে। খুব পিছিয়ে পড়ে নেই। মদন খুশী হল।

এবারে সে নিচের দিকে চাইল। মালবাহকের দল ক্রমশ এগিয়ে আসছে। মদনের বুকের ভিতর একটা আবেগ আলোড়ন তুলল। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। তার কর্তব্য সে করেছে, করতে পেরেছে। ঈশ্বরকে প্রাণভরে সে ধন্যবাদ জানাল।

মালবাহকেরা মদন আর বিশ্বদেবের কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মদনের অদ্ভুত ভাষার ভাষণের অর্থ অনেকেরই বোধগম্য হয় নি। কিন্তু মদনের কাজটা তারা পরিষ্কার বুঝল। ওরা বসে বসে দেখতে লাগল বিশ্বাস সাব্ আর মণ্ডল সাব্ শেরপা সাব্দের পিছু পিছু সেই ভয়াবহ বরফের উপর দিয়ে কেমন তর তর করে উঠে যাচ্ছিল। প্রথমটা ওরা ভয় পেয়েছিল। নির্বাক তারা ওদের দিকে চেয়ে ছিল। ওরা অনেকটা উঠে গেছে। বসে থেকে ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। মাল-বাহকেরা একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক পাও কেউ নড়ল না। শুধু দেখতে লাগল তারা। সাদা বরফের ঢালু বেয়ে যে ছয়টা লোক উঠছে তারা ধীরে ধীরে কেমন ছোট হয়ে আসছে। আর আশ্বর্যের কথা, আজ সকালে ওই ছয়জন লোক তাদের সঙ্গেই যাত্রা করেছিল। রোজ যেমন হয়। সকলে এক সঙ্গে একটা আস্তানা থেকে বের হয়। একই সঙ্গে নতুন আস্তানায় গিয়ে পেঁছিয়। আজ ব্যতিক্রম হল। ওরা ছয়জন ওই উঠে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ওদের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর তারা নিজেরা পাথরের মত পর্বতের সানুদেশে বসে আছে। আর আশ্চর্যের কথা, মণ্ডল সাব্ বিশ্বাস সাব্, ওদের দেশে পাহাড় নেই, বরফ নেই, তবু তারা বরফের উপর দিয়ে কেমন দিব্যি উঠে যাচ্ছে! আর পড়ে থাকল কারা? পাহাড়ের দেশে যাদের জন্ম, বরফের দেশে যারা মানুষ, তারাই! কী তাজ্জব! ওদের কেউ কেউ মাথা চুলকোতে লাগল।

শের সিং একটা ঘাসের শিষ্ ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে লাগল। এতক্ষণে সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার আত্মসম্মানে ঘা দিয়েছে দুগ্ধপোষ্য দুই বাঙ্গালী-বাবু। শের সিং উপরের দিকে চাইল। ওই যে ওরা এখনও উঠছে। উঠেই চলেছে। শের সিং আড়চোখে একবার তার দলের সবাইকে দেখে নিল। কেমন সম্ভ্রমভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে সবাই উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে! শের সিংয়ের কানে মদন সাবের কথাটা ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল, "যে সব জেনানা এই দলে মর্দানার পোশাক পরে আছে..."

কাকে লক্ষ্য করে মদন সাব্ এ কথা বলেছে? শের সিংকে লক্ষ্য করে নয় তো? "শের সিং," মদন সাব্ যাবার সময় বলে গেছে, "তুম তো শের হো?" তাকে একটু যেন ঠেসই দিয়েছে মদন সাব্। তবে কি তাকেই জেনানার দলে ফেলে দিল? তার

দলের লোকেরা আবার এই কথা ভাবছে না তো? শের সিং অস্থির হয়ে উঠল। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে সর্দারি করে আসছে শের সিং। কেউ তার কর্তৃত্বের উপর কথা বলতে পারে নি। এতগুলো লোকের ভালমন্দের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। কারও কিছু মন্দ হলে লোকে তাকেই দায়ী করবে। তাই শের সিং কোন ঝুঁকি নিতে রাজী হয় নি। সে জানে সাহেবরা তার উপর বিশেষ খুশী নয়। তা না হোক। সাহেবদের নেকনজর পাবার আশায় সে তার সাথীদের গর্দান হাড়িকাঠে বাড়িয়ে দিতে পারে না। এই ভয়াবহ পথ অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার দলের অধিকাংশ লোকেরই নেই। সে একথা ভাল রকমই জানে। যে সব লোক তার সংগে এখানে এসেছে তাদের বেশীর ভাগই কেদার-বদ্রীর বাঁধা সড়কে যাত্রীদের বোঝা বয়। পর্বত অভিযানের মর্ম কী তা জানে না। ওরা না জানুক, শের সিং জানে। টিলম্যান সাহেবের সংগে বহু বছর আগে নন্দাদেবী অভিযানে গিয়ে সে যা নাকানিচুবানি খেয়েছিল সে কথা মনে পড়লে এখনও তার গা শিউরে ওঠে। "শের সিং, তুম তো শের হো?"

বিরক্ত হয়ে শের সিং মুখ থেকে ঘাসের শিষ্‌টা ছুঁড়ে ফেলে দিল। থুঃ করে খানিকটে থুথুও ফেলল। উপরে চেয়ে দেখল, ওরা সমানে উঠে যাচ্ছে।

এমন বিড়ম্বনায় আর কখনও পড়ে নি শের সিং। শের সিং জানে, আজ তার প্রতিষ্ঠা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সাব্‌রা যদি জোর করত, ধমকাত, তা হলে শের সিংয়ের সুবিধে হত। সে সবাইকে নিয়ে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু এখন যে অবস্থার মধ্যে সাব্‌রা তাকে ফেলে গেল, তাতে তার আর ফেরার কথা বলার মুখ রইল না। শের সিং জানে, যে মুহূর্তে দলের লোকেরা ভাববে সে কাপুরুষ, সে জেনানা, সে শের নয়, সেই মুহূর্তেই তার নেতাগিরির অবসান হবে।

হঠাৎ মনঃস্থির করে ফেলল শের সিং। দুটো দুধের ছেলে তাকে চোট দিয়ে যাবে, এ সে সহ্য করবে না কিছুতেই। সে যাবে।

শের সিং হাততালি দিয়ে সবাইকে ডাকল।

বলল, "শুনো, বরফকা উপর হাম কিসিকো যানে নেই বোলেগা। যো যায়েগা আপনা মর্জিমে যায়েগা। লেকিন হাম হিঁয়া ঠহ্‌রেগা নেহি। হম সাব্‌লোগোকো পাস্‌ যা রহা হ্যায়।"

শের সিং আর দেরি করল না। নিজের বোঝাটি তুলে নিয়ে উঠতে শুরু করল। শের সিংয়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া। বরফের উপর পা ঠেকানোমাত্র পা অসাড় হয়ে যেতে লাগল। সে গ্রাহ্য করল না। তার স্নো-গগল্‌স্‌ নেই। বরফের উপর ঠিকরে পড়া সূর্যের প্রখর রশ্মিতে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। শের সিংয়ের প্রতি পদে মনে হতে লাগল, সে বুঝি বিরাট এক ঠান্ডা আয়নার উপর দিয়ে চলেছে। প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি তার মুখের অনাবৃত অংশ যেন পুড়িয়ে দিতে লাগল। তার গালে, তার নাকে অসহ্য জ্বলুনি শুরু হল। সে উপেক্ষা করল। মনে মনে বলতে লাগল, "সাব্‌, ম্যয় জেনানা নেহি হুঁ। ম্যয় শের হুঁ, শের।"

শের সিং এগিয়ে যেতেই কর্ণবাহাদুর লাফিয়ে উঠল। সেই বেঁটে মানুষটা পুরো এক মণ বোঝা পিঠে নিয়ে বলে উঠল, "হাম ভি যাতা হ্যায়।"

আক্কেল বলে উঠল, "হুজুর কে লিয়ে সব কুছ কর্‌ সক্‌তা। জান ভি যায় তো পরোয়া নেহি।" উৎসাহের মাথায় আক্কেল একটা কথা ভুলে গেল, তার বোঝায় 'নক্‌শা সাবে'র (বীরেনদার) ক্যামেরা ফিলিম্‌ রয়ে গিয়েছে। নক্‌শা সাহেব তখনও এসে পৌঁছন নি।

আক্কেলের পিছু পিছু এক-এক করে সবাই সেই বরফে-আবৃত খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল। প্রত্যেকের পিঠে এক-এক মণ বোঝা। তার উপর এই-রকম বিপজ্জনক পথ। অতি কষ্টে এক পা এক পা করে ওরা এগুতে থাকল।

মাঝামাঝি যেতে-না-যেতেই একজন মুখ থুবড়ে বরফের মধ্যে পড়ে গেল। কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বোঝা বয়ে উঠবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। বোঝা ফেলে রেখেই সে উঠতে লাগল। একটু পরে আর-একজন পড়ল, তারপরে আর-একজন, তারপরে আর-একজন...

শের সিং যখন গিরিশিরার শীর্ষে উঠে এল, তখন তার সহ্যশক্তি শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। তার মুখখানা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। পায়ের তলা সম্পূর্ণ অবশ। তার দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছে। তবু সে টলতে টলতে মদনের কাছে এগিয়ে গেল। ইশারা করে বলল, সাব্, হাম আ গিয়া। মদন তার অতিক্লান্ত দেহটা নিয়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তারপর শের সিংকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শের সিংয়ের যন্ত্রণাকাতর মুখে এক ফালি হাসি ফুটে উঠল। সে ধপ্ করে বসে পড়ল। আঙ শেরিং তাকে লেমন-বার্লি খেতে দিল। চোঁ-চোঁ করে মগটা খালি করে শের সিং খানিকটা ধাতস্থ হল।

একটু পরে কর্ণবাহাদুর, আক্কেল, তারপর একে একে সবাই উঠে এল। দুজনের চোট লেগেছে। কুড়িজন বোঝা ফেলে এসেছে। আধ ঘণ্টা ধরে সবাই বিশ্রাম নিল। তারপর বকশিশ কবুল করে কুড়িজন মালবাহককে নিচে পাঠিয়ে মাল তুলে আনা হল। ব্যবস্থা শের সিং-ই করে দিলে।

এবার নামার পালা। মদন, বিশ্বদেব, আঙ শেরিং গিরিশিরার চূড়াটা থেকে পাহাড়টার গোড়ার দিকে চাইল। মদনের মনে হল, আগেকার সেই ঔদ্ধত্য আর একটুও নেই। তাদের অধ্যবসায়ের কাছে সম্পূর্ণ নত হয়ে গিয়েছে।

পরের দলটাকে দেখা গেল। তারা পাহাড়ের সানুদেশে এসে জড় হয়েছে।

আঙ শেরিংকে ভাবিত দেখা গেল।

বললে, "আমি ভাবছি নতুন যেসব সাব্ এসেছে তাদের কথা। নক্‌শা সাব্, ডগদর সাব্, বিশেষ করে মোটা সাবের কথা। এই ধকল সহ্য করতে পারলে হয়।"

॥ চৌত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

৭ই অক্টোবর। রণ্টি। বিশ্বাস করতে পারছি নে, আদৌ বিশ্বাস হচ্ছে না, আজ আমি ১৩২২৫ ফুট উঁচু এক পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। পাহাড়ের গা বরফে ঢাকা ছিল। জীবনে এই প্রথম বরফে পা দিলাম।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ঠিক দু ঘণ্টা আগে এখানে এসে পেঁৗছেছি। সকাল সাড়ে সাতটার সময় ফারাখড়ক থেকে রওনা দিয়েছিলাম। তার মানে আজ পাক্কা এগারো ঘণ্টা হেঁটেছি। বিরামবিহীন। এগারো ঘণ্টা!!

আজ আমরা দু দলে ভাগ হয়ে হেঁটেছি। প্রথম দলটা আমাদের আগে বেরিয়ে গেছে। আমরা যখন বরফ-ঢাকা পাহাড়টার গোড়ায় এসে পেঁৗছলাম, তখন প্রথম দল সেটা পার হয়ে গিয়েছে। এই বিরাট আর হিংস্র পাহাড়টা

ডিঙোতে হবে শুনে আমার অন্তরাত্মা অন্তরেই শুকিয়ে গেল। বাইরে কিছু প্রকাশ করলাম না।

পাহাড়ের গোড়ায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা 'জয় গুরু' বলে উঠতে শুরু করলাম। আঙ ফুতার আমার ছায়ায় ছায়ায় ছিল। সুকুমারের নির্দেশে দিলীপও আমার কাছে কাছে চলল। দা তেম্বা, আজীবা, সুকুমার আর নিমাই ডাক্তার আর বীরেনদার উপর নজর রাখল। বীরেনদার মেজাজ আজ শরিফ নেই। ওঁর পার্সোন্যাল পোর্টার শ্রীমান আক্কেল বেয়াক্কেলের মত ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে আগের দলের সঙ্গে কেটে পড়েছেন। তাই বীরেনদার ছবি তোলা হল না। বিশেষ করে মুভি ক্যামেরাটা নিয়ে যাওয়াতেই তাঁর মনটা বেশী খারাপ হয়ে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে উঠেছি। বরফে চলার জুতো আমাদের কারও পায়েই ছিল না। বরফের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ইংরেজীতে যাকে 'স্নো-লাইন' বলে, আমরা হিমালয়ের সেই হিমানী রেখা পার হই নি। তবু যে আমরা এখানে, এই তেরো হাজার ফুটে এসেই বরফ পেলাম, তা এই ক'দিনের দুর্যোগময় আবহাওয়ার জন্য। অনবরত ক'দিন ধরে তুষারপাত হয়েছে। তাই এই পর্বতেই বরফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটে গেল।

উঠে চলেছি একেবারে খাড়া। তাইতে কষ্ট বেশী হচ্ছে। এর আগে খাড়া চড়াই আমরা যথাসম্ভব এঁকেবেঁকে উঠেছি। ওতে বেশী পথ চলতে হয় বটে, কিন্তু দম লাগে কম। আজ যেন আর মায়া-দয়া করছে না কেউ, আমি যে আনাড়ী, আমি যে নতুন এসেছি, তা যেন ওরা ভুলেই গিয়েছে। ওরা সোজাসুজি একেবারে খাড়া পথ বেয়ে উঠে চলেছে। আমি কি ওদের সঙ্গে পারি?

এক ঘণ্টার উপর সমানে উঠছি। তবু পথ আর ফুরোয় না। উপরের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। নির্মেঘ আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য গনগন করছে। মনে হল, চূড়াটা বহু—বহু দূরে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। বরফের উপর দিয়ে হাঁটছি, তবু গরমে অস্থির হয়ে উঠেছি! পায়ে জঙ্গল-বুট, রবার সোলের জুতো। মোটা উলের মোজাও পরা নেই। পায়ের তলাটা ক্রমশ হিম হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অস্বস্তিকর এক যন্ত্রণার জন্ম হচ্ছে সেখানে। ফোস্কা পড়ল না কি?

যেমন বিপদ কখনও একা আসে না, তেমনি অসুবিধেও। পাহাড়ে চলার সময় বার বার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। অসুবিধেগুলো যেন ওত পেতে থাকে। একবার যদি দেখে কোন কারণে আমি কাবু হয়ে পড়েছি, অমনি ওরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। একেবারে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এখানেও আমার সেই দশা হল।

যে মুহূর্তে থেকে পায়ের যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করল, অমনি যেন সেই মুহূর্তে থেকেই টের পেতে লাগলাম আমার দৃষ্টিশক্তিও আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সব ঝাপ্‌সা দেখছি। সেই বিপদসংকুল খাড়া চড়াইয়ের পথে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে কথা মনে করে আমার বুক শুকিয়ে এল। প্রায় অন্ধের মত আমি এগিয়ে চললাম। আমার চোখে ঠুলি-বাঁধা রঙিন চশমা ছিল। সেই রঙিন চশমার কাঁচে কুয়াশা জমে যাচ্ছে। একেবারে কিচ্ছু দেখতে পারছি নে।

আমি চশমা ছাড়া চোখে ভাল দেখতে পাই নে। দুই চোখে টি. বি'র আক্রমণ হওয়ায় দৃষ্টি বজায় রাখবার জন্য সর্বদা পাওয়ার গ্লাস পরে থাকতে

হয়। বীরেনদা আর সুকুমারও চশমার দাস। আমরা তাই বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে স্নো-গগল্সের সঙ্গে পাওয়ার ফিট্ করে নিয়েছিলাম। বীরেনদা আর সুকুমার তাই পরেই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বেলায় পৃথক ফল হচ্ছে। কারণ আমার ঘাম। গলগল করে ঘাম আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে বের হচ্ছে। চোখ মুখ প্লাবিত করে নামছে লোনা জলের স্রোত। শাঁখ-ফোঁকা একটা ভগীরথকে যোগাড় করতে পারলে 'ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন' সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। এই ঘামের দরুনই ঠুলি-বাঁধা চশমার মধ্যে অনবরত কুয়াশার সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

অথচ অভিজ্ঞ সঙ্গীসাথীরা বার বার সাবধান করে দিচ্ছে, আগের দলের লোকেদের পায়ের চাপে চাপে যে পথ সৃষ্টি হয়েছে, সেই পথই নিরাপদ; খবরদার, আমি যেন সে পথের বাইরে পা না ফেলি। বিপথে পা বাড়ানো এখানে বিপদকে ডেকে আনা। কিন্তু প্রায়ান্ধ আমার কাছে পথ কোন্‌টা তা ঠাহর হচ্ছে না।

চশমা মুছে নিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়? কিন্তু চলতে চলতে মানে উঠতে উঠতে চশমা মুছি কী করে! চশমা মুছতে গেলে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সেই পলকা পথে দেহের ভার এক সেকেণ্ডের বেশী রাখতে মানা। নরম বরফ তা হলে আমাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে ধসে পড়বে। আর এই ধস শুধু আমারই বিপদের কারণ হয়ে উঠবে না, আমার নিচে যারা রয়েছে তাদের সর্বনাশও ডেকে আনবে। আমার সে এক কল্পনাতীত স-সে-মি-রা অবস্থা। ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। না পারছি চলতে, না পারছি দেখতে, না পারছি চশমা মুছতে, না পারছি দাঁড়াতে।

অবশেষে, প্রতি পদক্ষেপে যা ঘটবার আশঙ্কা করছিলাম, তাই ঘটল। বোধ হয় পথের বাইরে কোথাও আলগা বরফস্তূপে পা দিয়েছিলাম. সঙ্গে সঙ্গে পতন। মুখ গুঁজে পড়ে গেলাম। পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বোঝা ভর্তি রুকস্যাক্ আমার পিঠেরই উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুষার-গাঁইতির হাতলটা ডান পায়ের হাঁটুতে প্রবলভাবে ঠুকে গেল। ঝিন ঝিন করে উঠল ব্রহ্মরন্ধ্র। সমস্ত শরীরে সুতীব্র যন্ত্রণা প্রবল উল্লাসে যেন নৃত্য শুরু করল। পায়ের তলায়, হাঁটুতে, পেটে, দেহের কোষে কোষে, সমগ্র চেতনায় যন্ত্রণার ঢল নামল। গালে নাকে কপালে শুধু বরফের শীতল স্পর্শ সির সির করে উঠল।

যাক. এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। আর উঠব না। এবারে বিশ্রাম নেব। কারও কথা শুনছি না আর। ওদের কথা ঢের শুনেছি। ঢের উঠেছি। আর না। এখন শরীরটাকে বিশ্রাম দেব। যতক্ষণ খুশী, সারা জীবন, যতক্ষণ না শেষ নিশ্বাস পড়ছে, শুয়ে থাকব এইখানেই। যারা আমার আগে আছ, তারা আগে উঠে যাও। পিছনে ফিরে চেয়ো না। যারা আমার পিছনে আছ, তারা আমাকে ডিঙিয়ে যাও। আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। আর দোহাই তোমাদের, হে অভিযাত্রিগণ, হে বাংলার সাহসী বীরগণ, তোমাদের এই অশক্ত সঙ্গীটির অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করো না। মনে রেখো, এক মুহূর্তের জন্যও সে তোমাদের গলগ্রহ হয় নি, কখনও তোমাদের ভার বাড়ায় নি, কোন অভিযোগ করে নি। তার দেহে যতক্ষণ শক্তি ছিল হাসিমুখে তোমাদের অনুসরণ করেছে। এবার তাকে ছুটি দাও। সে এখন শ্রান্ত, বড় ক্লান্ত। সে এখন ঘুমুবে—এই শীতল, এই নরম বরফের হিমস্নেহ শয্যায় সে তার গতিহীন দেহভার লুটিয়ে। আঃ, এখানে কী অপরিসীম শান্তি!

আমার ঘুম পাচ্ছিল। শরীর ঝিমঝিম করছিল। হৃদ্‌পিণ্ডের অতি দ্রুত স্পন্দন যন্ত্রণার সূচ হয়ে বার বার বিঁধছিল।

"সাব্‌, সাব্‌..."

কানের ভিতর অজস্র ঝিঁঝিপোকা ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ।

"সাব্‌, সাব্‌, মোটা সাব্‌..."

দারুণ ঝড়ের রাতে ভরা নদীর পুলের উপর দিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌।

"মোটা সাব্‌, মোটা সাব্‌..."

অকস্মাৎ কান পরিষ্কার হয়ে এল। বুকের ধুকপুকুনি শান্ত হয়ে এল। শ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। এক কুচি বরফ মুখের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। তার তীব্রতা জিভকে সচেতন করে দিল। এতক্ষণে অনেকটা ক্লান্তি ঝরে পড়ল।

"মোটা সাব্‌, মোটা সাব্‌, উঠো, উঠো, জল্‌দি।"

আঙ ফুতার ডাকছে।

"জল্‌দি উঠো, জল্‌দি উঠো, আউর থোড়া হ্যায়।"

খুব ভাল লাগল আঙ ফুতারকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। আঙ ফুতারকে ঝাপসা লাগল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললাম।

বললাম, "ফুতার, কুছ নেহি দেখাই দেতা। চশমা খোল্‌ দো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্‌," ফুতার চটপট জবাব দিল। "দেখো মৎ। বহোৎ ধুপ হ্যায়। অন্ধা হো যায়গা। দেখো মৎ সাব্‌।"

"ঠিক হ্যায় ফুতার। তুম্‌ খোল দো চশমা।"

আমি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফুতার চশমার ফিতে খুলে ফেলল।

বললাম, "ফুতার, উস্‌মে পানি হ্যায়। সাফা করো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্‌। আভি সাফা হোগা। আঁখ্‌ বন্ধ্‌ রাখো।"

বললাম, "ফুতার, চশমা লাগা দো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্‌।"

ফুতার চশমা পরিয়ে দিল। সমস্ত পাহাড়টা পরিষ্কার ফুটে উঠল চোখে। ঘামও কমে গেছে। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শীত করতে লাগল। এও এক তাজ্জব ব্যাপার! দুপুর রোদে বরফের উপর দিয়ে হাঁটলে গরম লাগে, ঘাম ঝরে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে না নিতেই আবার শীত করে। ফুতার ঠিকই বলেছিল। চূড়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তবে এখনও বেশ খানিকটা উঠতে হবে। আর খাড়া চড়াই। আমাকে উপরের দিকে বিপন্নভাবে চাইতে দেখে আঙ ফুতার হাসল। এটা ওর অভয়। আমিও হাসলাম।

বললাম, "ফুতার, লেমন-পানি?"

"ঠিক হ্যায় সাব্‌। লো, থোড়া থোড়া পিও। থোড়া।"

লেমন-জল খেয়ে ধাতস্থ হলাম। পুরনো বল এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। ইশারা করলাম, আঙ ফুতার, চল।

আঙ ফুতার বলল, "সাব্‌, রুকস্যাক্‌ দে দো।"

আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল।

হেসে বললাম, "না, ফুতার। ওটা আমার কাছেই থাক্‌। তুমি চল।"

কখনও ধাপ কেটে কেটে, কখনও বা হাত ধরে টেনে আঙ ফুতার আমাকে

বাকী পথটুকু পার করে দিল। চূড়ায় উঠে দেখি পাহাড়টা ওপিঠে একটু ঢালু হয়ে সোজা দক্ষিণে নেমে গিয়েছে। ওদিকে বরফ খুব বেশী নেই।

ধ্রুব, সুকুমার, নিমাই, দিলীপ আর বীরেনদা একদৃষ্টে দক্ষিণ দিকে চেয়ে আছে। নিমাই খুশীমনে শিষ দিয়ে "লে লো সুরমা, লে লো" ভাঁজছে। ম্যাপ দেখছে। আর দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে, "ওই যে বেতারথলির পুচ্ছ, ওই যে রণ্টি পর্বতের মাথা। ওই যে দেখছ, এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা নদী নেমে এসেছে, ওইটে হচ্ছে রণ্টি গড়্, রণ্টি নদী, যা খুশী বল না কেন। ওই নালা ধরেই আমাদের পেঁাছতে হবে রণ্টি হিমবাহে। ওই পথই নন্দাঘুণ্টির পথ। ক্লিয়ার? সুউই।"

বীরেনদা ছবি তুলছিল।

বললে "হ্যাঁ রে নিমাই, ও-নদীটা যে বিশ্বনাথের গলি।"

নিমাই সিটি মেরে বললে, "রাইট্।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এ পাহাড়টার নাম কী?"

নিমাই ম্যাপ দেখে বলল, "এটা একটা গিরিপথ। কিন্তু এর নাম তো ম্যাপে নেই।"

আমার মনে তখন রোমাণ্টিসিজমের পুলক জেগে উঠেছে। যেন কলম্বসের মত নতুন কোন দেশ আবিষ্কার করেছি।

বললাম, "তা হলে এর একটা নামকরণ করলে হয় না?"

সবাই হৈ-হৈ করে সমর্থন করল। শুধু তাই নয়, নামকরণের সম্মান দলপতি সুকুমারকেই দেওয়া হল।

সুকুমার একটু ভেবে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "যে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙালীদের প্রথম পর্বতারোহণের উদ্যোগ করেছে তার নামের সঙ্গেই আমি এই গিরিপথটির নাম যুক্ত করতে চাই। আজ থেকে এর নাম হোক 'আনন্দধুরা'।"

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেস ক্যাম্প (থারগাট্টা), ৯ই অক্টোবর। কাল এখানে এসে পেঁৗছেছি। পেঁৗছতে সন্ধ্যে ঘোর হয়ে গিয়েছিল। এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ডায়েরি পর্যন্ত লিখতে পারি নি। আজ সকলের বিশ্রাম।

এখন, এই দুপুরে, রোদে পিঠ দিয়ে বসে লিখতে গিয়ে দেখি, গত দু দিনের কোন ঘটনাই ভাল করে মনে করতে পারছি নে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটু একটু করে ছবিগুলো ভেসে উঠছে। কাল সকালেও একটা অ্যাডভান্স পার্টি বের হয়েছিল। এর নেতা ছিল সুকুমার। সঙ্গে সর্দার আঙ শেরিং আর নিমাই। ওদের কাজ ছিল বেস ক্যাম্পের জন্য নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করা।

নিমাই, সুকুমার আর সর্দার হিসেব করে বলল, রণ্টি থেকে থারগাট্টা দূরে বেশী নয়। এক ঘণ্টা মার্চ করলেই পেঁৗছে যাওয়া যাবে। তাই ঠিক করা হল সকালের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরেই রওনা দেওয়া হবে। দুপুরের খাওয়া আমরা বেস ক্যাম্পে পেঁৗছেই সারব। তাই অ্যাড্ভান্স পার্টি বের হবার একটু

পরেই আমরা সমস্ত মালবাহকদেরও রওনা করে দিলাম। আজীবা ছাড়া সমস্ত শেরপা তাদের সঙ্গে গেল। সবার পিছনে চলল আমাদের পার্টি—দিলীপ, বিশ্ব, মদন, এই তিন তেজী ঘোড়া, বীরেনদা, ডাক্তার কর, আমি, এই তিন বেতো ঘোড়া আর আজীবা।

আগের দিন আনন্দধুরা পার হয়ে রণ্টি পেঁছতেই আমাদের দম বেরিয়ে গিয়েছিল। একটা দিন বিশ্রাম নিলে ভাল হত। কিন্তু রিনি আর ঘন্যাকুলে বৃষ্টির জন্য আটকে পড়ায় দুটো দিন নষ্ট হয়েছে, তাই বিশ্রাম নেবার কথা আর মুখে আনলাম না।

আমরা যাত্রা শুরু করেই রোডোডেনড্রনের বন পেলাম। জানি না কেন, আমার চলতে ভাল লাগছিল না। শরীরটা খারাপ-খারাপ লাগছিল। তার উপর আঙ ফুতারও সঙ্গে নেই। সে এগিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে আমি কোন রকম উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বরং কষ্টটাই বেশী করে বাজছিল। চলতে চলতে বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যাচ্ছিল। রোদের তেজ বড় ভয়ানক। ঘাম হচ্ছিল খুব। জল তেষ্টা ঘন ঘন পাচ্ছিল। রণ্টি থেকে আধ ঘণ্টার রাস্তা যেতে-না-যেতেই হাঁফাতে শুরু করলাম। বীরেনদারও, মনে হল যেন, আগের সেই ফুর্তি আর নেই। মুখ শুকিয়ে এসেছে। দেখলেই মনে হয় তাঁর স্নায়ুর উপর কী অসম্ভব চাপই না পড়েছে! ডাক্তারবাবুও খানিকটা কাবু হয়ে পড়েছেন। দিলীপ, মদন আর বিশ্ব প্রতি পদে আমাদের সাহায্য করেছে।

রোডোডেনড্রনের বনটা পার হতে খুব বেশী সময় আমাদের লাগে নি। বড় জোর পনেরো মিনিট। আগে যারা গিয়েছে তারা বন জঙ্গল কাটতে কাটতে গিয়েছে। সেই নিশানা ধরেই আমরা এগোচ্ছিলাম। তারপর খোলা জায়গায় এসে পড়তেই সে নিশানা হারিয়ে গেল। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই হারানো সূত্র খুঁজে পেলাম। একটা উৎরাইয়ের মুখে এসে পড়লাম। পাহাড়ের গাটা ঢালু হয়ে চার-পাঁচ শো ফুট নেমে গিয়েছে। একটা ছোট্ট স্রোতোধারা পূবে-পশ্চিমে বয়ে সম্ভবত রণ্টি নদীকেই সমৃদ্ধ করেছে। আবার একটা ঝরনা এসে ওই স্রোতোধারায় পড়েছে। আমাদের পথ এই ঝরনা ডিঙিয়ে সেই ছোট্ট নদীতে গিয়ে মিশেছে। এখানে পাহাড়ের গায়ে খালি আলগা মাটি আর আলগা পাথর। অতি সাবধানে এগুতে হচ্ছে।

আমরা একে একে সাবধান হয়ে ঝরনার স্রোত ডিঙিয়ে নদীর খাতে নেমে পড়লাম। নদীর বুকে বড় বড় পাথর ফেলে সেতু বানানো হয়েছে। তার উপর দিয়ে ডিঙ্গি মেরে পার হয়ে গেলাম।

কী জানি কেন, এখন লিখতে বসে শেরপাদের 'সেতু-বন্ধনে'র দৃশ্যটা বার বার মনে পড়ছিল। অন্যান্য সকলে পাথর কুড়িয়ে এনে নদীতে ফেলছে। ফেলামাত্র স্রোতের বেগ সেগুলোকে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে শেরপাদের সে কী হাসির ধুম! যেন নদীটা ওদের সঙ্গে মস্ত রসিকতা করছে! টাসি আর নরবু—এই দুজন শেরপার হিসেব কিছু সোজা। অন্যেরা যখন ছোটখাট পাথর সংগ্রহে ব্যস্ত তখন ওরা দুজন গন্ধমাদন নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ভাবখানা এই, কী বার বার খুচরো পাথরের জন্য ছুটোছুটি করছ, তার চেয়ে এস এই পাহাড়ের আধখানা বসিয়ে দিই। একবারেই কাজ চুকে যাবে। আর তা ওরা করেও ছেড়েছে। পেল্লায় পেল্লায় পাথরের চাঙড় ওরা পিঠ দিয়ে ঠেলে ঠেলে নদীতে এনে ফেলেছে। আঙ ফুতার, টাসি আর নরবুর গায়ে দৈত্যের মত বল।

যতটা নেমেছিলাম প্রায় ততটাই আবার উঠতে হল নদীর ওপারে গিয়ে। জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের মত খাড়া গা বেয়েও উঠতে হয়েছে। আমার সব থেকে কষ্ট হয়েছে এই রকম চড়াই উঠবার সময়। দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেব, সে অবকাশ মিলত না। কারণ গতি বন্ধ হয়ে গেলেই শরীরের ভারে আলগা মাটি ধসে পড়তে পারে। আর একবার যদি পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় তবে আমার নিচে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে নিচে খসে পড়ব। তাই দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। যাক্ প্রাণ থাক্ মান—এই পণ নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠছিলাম। শেষ ধাপটা দিলীপ এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে তুলে দিল। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। থপ করে বসে পড়লুম। তারপর রুকস্যাকে ভর দিয়ে শরীরটাকে মাটির উপর এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ এমনিভাবে পড়ে থাকার পর বুক-ধড়ফড় একটু কমে এল। লেমন-জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম, আমার পায়ে আগের মত আর জোর পাচ্ছি নে। পা দুটোকে ক্রমেই ভারী লাগছে। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, এইদিন আমি হাল্কা জঙ্গল-বুটের বদলে ভারি মাউণ্টেনীয়ারিং বুট পরেছিলাম। এই বুটজোড়া পরা ইস্তক আমার চলার স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে চলে গিয়েছিল, অথচ বুটজোড়া যে পালটে নেব, সে উপায় ছিল না। কারণ আমার হাল্কা বুটজোড়া রয়েছে কিটব্যাগে। কিটব্যাগ আছে মালবাহকের পিঠে। এবং মালবাহক আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

কারণটা যাই হোক, পদযুগল আমার নির্দেশ আর পালন করছে না, এটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই খানিকটা ভয়ে ভয়ে চলেছি। ওরা বলেছিল এক ঘণ্টার রাস্তা। দু ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু চলার বিরাম নেই। আবার একটা খাড়া উৎরাইয়ে নামতে হল। আবার হাঁচড়পাচড় করে উঠতে হল পাঁচ-ছ শো ফুট উঁচু একটা খাড়া চড়াইয়ে। আবার প্রাণ বেরিয়ে যাবার যো হল। গোরা সিং বলেছিল, আজকের রাস্তা 'ময়দান-ই-ময়দান', চলতে কিছু তকলিফ হবে না। কিন্তু এই যদি তার ময়দান হয়ে থাকে, তবে পাহাড় না জানি কী! দেখলাম কারও কারও মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মেজাজ কি আমারই ভাল আছে?

বার কয়েক এই রকম খাড়া চড়াই আর উৎরাই ভাঙার পরও যখন রাস্তা ফুরল না, বেস ক্যাম্পের একটা খুঁটিও নজরে পড়ল না, তখন আর কারোর মেজাজই শরিফ রইল না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য যেন আগুন ঢেলে দিচ্ছে। এমন কী, সঙ্গের জলের বোতলগুলোও খালি হয়ে গিয়েছে। তেষ্টা মেটাব, সে উপায়ও নেই। একমাত্র নির্ভর করে আছি কোলে কোম্পানির লজেন্সগুলোর উপর। কিন্তু গুগুলোও দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কী, আমরা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পথ হারাই নি তো? এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বেস ক্যাম্পে পেঁছিবার কথা। সাড়ে তিন ঘণ্টার পরও আমরা সেখানে পেঁছাতে পারলাম না। ব্যাপার কী?

কিন্তু আমরা তো সতর্ক হয়েই চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে এসেছি। পথ হারাবার তো কথা নয়। তবে?

মনে পড়ল আগের দিনের কথা। আনন্দধুরা পার হবার পর কাতর হয়ে পড়ায় আমরা খুব ধীরে ধীরে পথ হাঁটছিলাম। বিশ্বদেব আর মদন আমাদের অবস্থা অনুমান করে, রাণ্টি শিবির থেকে চা আর বিস্কুট লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পথের মধ্যে গরম চা আর বিস্কুট আমাদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ

বলে মনে হয়েছিল। এই দিন স্বয়ং লীডার অ্যাড্‌ভান্স-পার্টির নেতৃত্ব করছে। সে কি আমাদের কথা ভুলে গেল? তাজ্জব!

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ক্ষিধে, তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। খালি পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ যাবার পর সামনে একটা বিরাট বন পড়ল। রোডোডেনড্রনের ঘন জঙ্গল। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। কিছুক্ষণ চলবার পর, রোডো-ডেনড্রনের একটা দো-ডালের মধ্যে বসে পড়লাম। আর-এক পাও চলতে পারব, এমন মনে হল না। দিলীপ সেই অবস্থায় আমার একটা ছবি তুলল।

পাহাড়ে এসেছি, চলব না বললে ছাড়ে কে? আবার উঠতে হল। টলতে টলতে একসময় বনটা পারও হলাম। তারপরই একটা সমতল জায়গা চোখে পড়ল। প্রাণে জল এল। এরই কোথাও বেস ক্যাম্প আছে। নিশ্চয়ই।

কিন্তু আতিপাঁতি করে খুঁজেও আমরা সেখানে বেস ক্যাম্প বের করতে পারলাম না। ক্রমশ আমরা সেই টেবিলের মত সমতলের এক কোণায় এসে পড়লাম। আর এগিয়ে যাবার পথ নেই। পাহাড়ের গাটা ওখান থেকে একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া নেমে গিয়েছে প্রায় হাজার-দেড়হাজার ফুট। নিচেই রণ্টি নদী। উপর থেকে একটা সরু রুপোলী ফিতের মত দেখাচ্ছে। আর নদীর ওপারে আমাদের ঠিক সামনেই আর-একটা পাহাড়, ঠিক অমনিই খাড়া, প্রায় হাজার দুয়েক ফুট উঠে গিয়েছে। কিন্তু বেসক্যাম্প কোথায়?

আমরা দস্তুরমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেখানেই বসে পড়লাম। দিলীপ অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল। সামনের পাহাড়টায় আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই দেখ, আমাদের মালবাহকরা। ওই যে ওরা উঠছে।"

সত্যিই তাই। ঠাহর করে চেয়ে দেখি পিঁপড়ের সারির মত ওরা উঠছে। তার-পর পাহাড়টা ডিঙিয়ে আবার ডান দিকে এগিয়ে একে একে নেমে যাচ্ছে অনেক নিচুতে। ওদের এই বিভ্রান্তিকর কাজের আমরা কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলাম না।

ডাক্তারের চোখে শিকারী বাজের ধার। সে বলল, "ওই নিচু জায়গাটাতেই আমাদের বেস ক্যাম্প। তাঁবু খাটানো হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওখানে ওরা ওই উঁচু পাহাড়টা ডিঙিয়ে যাচ্ছে কেন? নদীর ধার ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই তো পারে। তা হলে অনেক কম উঠতে হয়।"

এই এতটা পথ নেমে আবার ওই উঁচুতে উঠতে হবে, এই কথা ভাবতেই আমার চোখ অন্ধকার হয়ে এল। আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে শীতল রক্তের একটা ঘন স্রোত নামতে লাগল। অসম্ভব। আমার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে আমার দ্বারা আর এক পাও এগোনো সম্ভব হবে না।

সবাইকে সে কথা বললাম। ওরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। বসে পড়লাম সবাই। বেলা তখন আড়াইটে হবে। বসে বসে দেখছি মালবাহকেরা উঠছে। যাদের বোঝায় কেরোসিনের টিন ছিল, সেই টিনের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ায় তাদের বোঝাগুলো মাঝে মাঝে চিকচিক করে উঠছে।

হঠাৎ দেখি গোরা সিং এল। গোরা সিং জানাল যে ক্যাম্পের ভাল জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সাহেবদের এখন সেখানে যেতে হবে। এ কথা শুনে সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। আমি সেরেফ বলে দিলাম, আমার দ্বারা আর এক পাও চলা সম্ভব হবে না। আমাকে এখানে রেখে তোমরা চলে যাও। গিয়ে চা খাবার আর একটা তাঁবু পাঠিয়ে দিও। বীরেনদা আর ডাক্তারেরও এই একই মত।

ধ্রুব, দিলীপ, বিশ্ব আর মদন—ওদের সম্ভবত যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবেই বোধহয় ওরাও থেকে গেল। গোরা সিংয়ের হাতে সুকুমারের কাছে এস-ও-এস পাঠানো হল। আমরা পরিশ্রান্ত। চলবার ক্ষমতা নেই। খাবার পাঠাও। জল পাঠাও। তাঁবু পাঠাও।

গোরা সিং হরিণের গতিতে সেই বিপদবার্তা বয়ে নিয়ে বেস ক্যাম্পে রওনা দিল। আমরা চুপ করে বসে রইলাম। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। বেশীর ভাগ বিরক্তিই নিজের জন্য। আমি বুঝতে পারছিলাম, সুকঠিন পরীক্ষা আমার সামনে। এই ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সেই পরীক্ষায় পাস করতে পারব কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আমি জানি, এখন দাঁড়াতে গেলেই আমার পা কাঁপবে। আগের দিন এগারো ঘণ্টা আর এবারে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা একটানা হাঁটার ধকল আমার পদযুগল যদি সহ্য করতে না পারে তো তাদের আমি দোষ দিই কী করে? আবার এ-ও আমি চাইছিলাম না যে, আমার জন্য ওরা আটকে থাক্। কিন্তু আমাকে এখানে একলা ফেলে ওরা যদি চলে যেত, তা হলেই কি আমি খুশী হতাম? নিশ্চয়ই না। সমস্তটা মিলে সমাধানহীন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম।

আমার মনে হতে লাগল, সুকুমার আজ শুরু থেকেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাত্র এক ঘণ্টার পথ বাকী—এ কথা যে-ই তাকে বলে থাকুক, পথ যেখানে একেবারে অপরিচিত, সেখানে তার পক্ষে ও কথার ওপর এতটা নির্ভর করা ঠিক হয় নি। অন্তত লাঞ্চটা তৈরি করে বের হওয়া উচিত ছিল। একে পথের ক্লান্তি, তার উপর পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। কাহিল হয়ে পড়া আমাদের মত অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তারপর যখন দেখল, পথের হিসেবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তখন কি সুকুমারের উচিত ছিল না, আমাদের খাবার একটা ব্যবস্থা করে রাখা? অনায়াসে সে এখানে কয়েক প্যাকেট বিস্কুট আর ফ্লাস্ক-ভর্তি চা রেখে যেতে পারত?

"গুড্ মর্নিং সাব্।"

পিছন থেকে আচমকা সম্বোধন শুনে চমকে উঠলাম। আরে এ যে কেদার সিং! আমার রানার। ঘন্যাকুল থেকে ওর হাত দিয়ে ডেস্প্যাচ্ পাঠিয়েছিলাম। যোশী মঠে গিয়ে তার লাগিয়ে এরই মধ্যে এসে সে আমাদের ধরে ফেলল। বাহাদুর বটে!

কেদার সিংকে দেখে আমি মনের জোর ফিরে পেলাম। আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, এ পথ আমি পাড়ি দিতে পারব। দূরে দেখা গেল, কয়েকজন লোক দ্রুতবেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ধ্রুব আর দিলীপ নিচে নামতে লাগল। মদন আর বিশ্ব আমাদের কাছে থাকল।

টাসী সকলের আগে এসে পৌঁছাল। তারপর আঙ ফুতার। তারপর গোরা সিং। তারপর কয়েকজন মালবাহক। তাঁবু আনে নি, চা আর বিস্কুট এনেছে। ওরা আমাদের নিতে এসেছে।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আমরা যখন উঠলাম তখন আলোর জোর কমে এসেছে। আঙ ফুতারের হাত ধরে আমি আর টাসীর হাত ধরে বীরেনদা সেই বিপজ্জনক পথে অকুতোভয়ে অবতরণ করতে শুরু করলাম। ডাক্তার কারও সাহায্য নিতে রাজী হল না।

অন্ধকার ঘন হয়ে এল। তখনও আমরা নামছি। আঙ ফুতার কখনও আমার সামনে এগিয়ে গিয়ে ধাপ কেটে দিচ্ছে, কখনও পিছন থেকে আমার

পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলছে। অন্ধকারে ওর দেহটা একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। ওকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি নে। শুধু ওর স্বরটা শুনতে পাচ্ছি। আমার কানে সেটা অনবরত বাজছে : "উতারো সাব্, উতারো। হাম কভ্‌ভি নেহি ছোড়েঙ্গে।"

এ দিনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার কমিক দিয়ে শেষ হল। হাজার ফুটের বেশী খাড়া উৎরাই খতম করে, রণ্টি নদীর উপল আস্তরণ আধ মাইল মাড়িয়ে, পাথরের উপর ডিঙি মেরে মেরে খর স্রোত পেরিয়ে আবার দু-তিনশো ফুট খাড়া চড়াই ভেঙে যখন বেস ক্যাম্পে পৌঁছালাম তখন ছটা বেজে গিয়েছে। নিমাই আর সুকুমার একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এল।

সুকুমার বীরেনদার কাছে গিয়ে বললে, "বহোৎ আচ্ছা।"

সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা বিভীষণ মূর্তি ধরে তেড়ে গেল সুকুমারের দিকে। হাঁফাতে হাঁফাতে বীরেনদা বললে, "আবার রসিকতা হচ্ছে! মারব আইস্‌-অ্যাক্‌সের এক বাড়ি..."

বলেই মাথার উপর বীর বিক্রমে আইস্‌-অ্যাক্‌স্‌টা বন বন করে ঘোরাতে গিয়ে বীরেনদা আর টাল সামলাতে পারলে না। একেবারে পপাত ধরণীতলে। সুকুমার এই আচমকা আক্রমণে থতমত খেয়ে গেল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে যেই না সে বীরেনদাকে তুলতে গেছে অমনি নিমাই হাঁ-হাঁ করে তাকে টেনে ধরল।

বললে, "তফাত যাও, তফাত যাও। আহত সিংহ। কাছে যেতে নেই। ডেঞ্জারাস।"

নিমাইয়ের কাণ্ড দেখে সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। বীরেনদাও।

বীরেনদাকে হেসে উঠতে দেখে নিমাই চেঁচিয়ে উঠল, "লাইন ক্লিয়ার। হরি সিং, নক্‌শা সাব্ কো কফি পিলাও।"

॥ ছত্রিশ ॥

বেস ক্যাম্প, ১০ই অক্টোবর। বলতেই হবে সর্দার আঙ শেরিং-এর পছন্দ আছে। বেছে বেছে খাসা জায়গাটা বের করেছে বেস ক্যাম্পের জন্য। জায়গাটা নিরাপদই শুধু নয়, ছবির মত সুন্দর। চারদিকেই পাহাড়ের আড়াল। কাজেই ঝড়ো হাওয়া খুব বেশী উৎপাত করতে পারবে না। এক পাশ দিয়ে রণ্টি নদী বয়ে চলেছে। আর-এক পাশ দিয়ে আর-একটা স্রোতোধারা লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়ে রণ্টির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সোজা উত্তর থেকে দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে রণ্টি। তার এক পাশে বেতারথলি, অন্য পাশে রণ্টি পর্বত। বেস ক্যাম্প থেকে দেখলে বেতারথলি রণ্টি নদীর বাঁ পাশে পড়ে আর ডান পাশে পড়ে রণ্টি পাহাড়। হিমানী রেখার নিচে বেস ক্যাম্প করা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্দারের পরামর্শই আমরা মেনে চলেছি। সর্দার বলেছে, বেস ক্যাম্প গরম জায়গাতেই করা ভাল। বরফে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে এখানে এসে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

কাল পঞ্চাশ জন মালবাহককে আমরা ছুটি দিয়ে দিয়েছি। শের সিং তাদের সঙ্গে চলে গেছে। যাবার সময় প্রত্যেকের চোখে জল দেখা দিয়েছিল।

কী আশ্চর্য মানুষের মন! ওরা সকলেই আমাদের সাফল্য কামনা করেছে। নিরাপদে যাতে ফিরতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। ওদের সংগে কেদার সিং-ও চলে গেল ডাক নিয়ে। আর আটজন মালবাহককেও পাঠানো হল রসদ আনবার জন্য।

কাল সারা দিন জিনিসপত্র প্যাক করা হয়েছে। দেখা গেল কয়েকটি আবশ্যকীয় সামগ্রী আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে। জুতোয় মাখানো গ্রিজ্ আনা হয় নি। বরফে জুতো শক্ত লোহা হয়ে উঠবে যখন, তখন তা নরম করা হবে কী দিয়ে কে জানে? কোয়ার্টার মাস্টার মাথা চুলকোতে লাগল। স্টোভও মারাত্মক কম আনা হয়েছে। যেখানে কম করেও পাঁচটা আনার কথা, সেখানে স্টোভ আনা হয়েছে তিনটে। তাও একটা বিকল হয়ে পড়েছে। বাড়তি পার্টস্ আনা হয় নি। সারানো গেল না। বাধ্য হয়েই দুটো স্টোভ দিয়ে কাজ চালাতে হবে। কোয়ার্টার মাস্টার দাড়ি চুলকোতে লাগল। এইভাবেই সে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে।

রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। মদনের প্রশ্নটা তোলা হল। দেখা গেল, দলে ক্লাইম্বারের সংখ্যা বড় কম। ধ্রুবকে ক্লাইম্বার হিসেবে ধরা হল না। ঠিক হল ধ্রুব প্রধানত বেস ক্যাম্পে থাকবে। সাপ্লাই পাঠাবার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপানো হল। মদনকে বাদ দিলে থাকে আর চারজন—সুকুমার, বিশ্ব, নিমাই আর দিলীপ। এর মধ্যে একজন কি দুজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে? চিন্তার কথা। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর সকলে একটা বিষয়ে একমত হল, মদনকে বাদ দেওয়া যায় না। সে যেভাবে নিজের দক্ষতা বার বার প্রমাণ করেছে, তাতে মদনকে বাদ দিয়ে রাখলে দলেরই ক্ষতি হবে। সর্বসম্মতিক্রমে মদনকে দলভুক্ত করা হল। কিন্তু তাতেও সমস্যা দেখা দিল। পোশাক কই? সরঞ্জাম কই? জুতো?

জুতোর সমস্যা মিটল সহজেই। বীরেনদার জুতো তার পায়ে ফিট করছিল না। মদনকে দিতেই তার পায়ে লেগে গেল। আমার জুতো জোড়া বীরেনদার পায়ে খাপ খেয়ে গেল। মদনের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম শেরপাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে আর আমাদের কাছ থেকে বাকীটা দিয়ে কোনরকমে সংগ্রহ হয়ে গেল।

আজ সকালে প্রথম দল যাত্রা করল অ্যাড্ভান্স বেস স্থাপন করতে। দলে ছিল তেরোজন। অশুভ তেরো। যাত্রা কেমন হবে কে জানে? আমি ছিলাম ডিউটি অফিসার। আমার ঈশ্বর নেই। তবু যাত্রার আগে প্রার্থনা পড়ালাম আমিই। শুরুটাই হল গোঁজামিল দিয়ে, শেষ কী হয় কে জানে?

বীরেনদা পরশু রাত থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনবরত কাশছে। রাত্রে ভাল করে ঘুমতে পারছে না, খাবারে রুচি নেই। চোখ গর্তে বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে। ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বীরেনদাকে চাঙ্গা করে তুলতে। আজীবা এখনও দুর্বল। পঁচিশজন মালবাহক আর আমরা চারজন বেস ক্যাম্পে পড়ে থাকলাম। আর রইল হরি সিং আর লালু।

"জয় বদ্রী বিশাল" বলে রওনা দিল ওরা তেরোজন—সুকুমার, ধ্রুব, নিমাই, দিলীপ, বিশ্ব, মদন, আঙ শেরিং, পেম্বা নরবু, দা তেম্বা, গুণদিন, টাসী, আঙ ফুতার আর গোরা সিং। প্রত্যেকে মালের বোঝা বেশ চাপিয়েছে।

আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার। ওরা সার বেঁধে রওনা দিল। আজ বের

হতে একটু দেরিই হয়ে গেল ওদের। আমি আর ডাক্তার ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেলাম। ওরা ধীরে ধীরে স্রোতোধারার খাতে নেমে গেল। তারপর নালাটা পার হয়ে একটা ছোট্ট চড়াই বেয়ে উঠে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে রণ্টি নদীর বুকে নেমে গেল।

ক্রমশ বড় বড় মানুষগুলো ছোট ছোট হয়ে আসতে লাগল। ডাক্তার হঠাৎ এক সময় জানাল, ওরা নদী পার হতে পারছে না। ওরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ওরা বসে পড়ল। এই ওরা ঘোরাঘুরি করছে। ওরা ওখানে কী যেন করছে? পুল বানাচ্ছে না কি?

দেড় ঘণ্টা পর ডাক্তার বলল, ওরা এগোচ্ছে। ওই যে একে একে একটা বড় চড়াইয়ে উঠছে।

এবার আমিও দেখতে পেলাম, কালো কালো কতকগুলো বিন্দু উঠছে, নামছে, নড়ছে। তারপরে একে একে ওরা পাহাড়ের বাঁকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই পাহাড়ী নদীর খাতে নামতে হল। তারপর স্রোতটা পায়ে পায়ে পার হয়ে আবার ওঠা। বেশ খানিকটা উঠলে একটা পাহাড়ের ঢালু গা মিলবে। সেইটে ধরে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে যাও। খানিকটা। তখনও কিন্তু বেস ক্যাম্পটা দেখা যায়। তারপর যে মুহূর্তে রণ্টি নদীর নুড়ি আর পাথর-ভরা বুকে নেমে গেলে সেই মুহূর্তে দেখলে, পিছনে আর-কিছু নেই। না মানুষ, না তাঁবু, না কিছু। আছে শুধু পাহাড়ের সারি।

এই তো দিলীপ মুখ ফিরিয়ে চাইল। দেখল বেস ক্যাম্প থেকে হাত নাড়ছে ওরা। দিলীপও হাত নাড়ল। ওরা দেখতে পেয়েছে তাকে। ওই যে ঘন ঘন হাত নাড়ছে। তারপর দিলীপ মাত্র কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছে, কয়েক ধাপ মাত্র নেমেছে, আর অমনি বেস ক্যাম্প উধাও! এ তো এক আশ্চর্য ভোজবাজি! দিলীপের অবাক লাগে। আর এই যে পাহাড়ী পথের প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়, ক্ষণে ক্ষণের চমক, পাহাড়ে চলার এইটাই সব চাইতে বড় পাওয়া। অন্তত দিলীপের তো তাই ধারণা।

· দিলীপের পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। একটা আগ্ফা আইসোলেট, আর-একটা ছোট্ট 'রোলি'—রোলিফ্লেক্স। আর আছে ছোট্ট এক আট মিলিমিটারের মুভি ক্যামেরা। সবগুলোই রেডি। দিলীপ দলের মধ্যে সব থেকে লম্বা। এর দেহের গঠন সব থেকে ভাল। ভাল ছবি তুলতে পারে। সংগঠনক্ষমতা অসাধারণ। বয়েসে সকলের ছোট। ইচ্ছে করলে দিলীপ জনা চার-পাঁচের খাবার একাই সাবড়ে দিতে পারে। এবং অমন ইচ্ছে তার প্রায়ই হচ্ছে।

দিলীপ আগে আগে যাচ্ছিল। আজ বীরেনদা নেই। কাজেই ছবিগুলো তাকেই তুলতে হবে। রুকস্যাকে গুচ্ছের মাল ভর্তি করেছে। ওজন পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড তো হবেই। কাঁধে বেশ চাপ পড়ছে। দিলীপ দাঁড়াল। রুকস্যাকের ফিতে দুটো একবার ঠিক করে নিল। পিছন ফিরে চাইল। না, বেস ক্যাম্পের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। ওই যে ওরা পিছনে আসছে সবাই। একে একে রণ্টি নদীর বুকে নেমে পড়ছে। ধ্রুবর চলা দেখে দিলীপের মনে হল, আজ তার কষ্ট হচ্ছে। ওর ছোট্ট

রোগা শরীরের উপর মালের চাপ কম পড়ে নি! কিন্তু নিমাইদার কী হল আজ? এরই মধ্যে সে কাতর হয়ে পড়ছে কেন?

দিলীপ চলতে শুরু করল ফের। ওরা চলেছে রণ্টি নদীর বাঁ দিক ঘেঁষে। স্রোতটা পার হতে হবে। নিমাই মানচিত্রের কনটুর রেখা দেখে নির্দেশ দিয়েছে ডান ধারের পাহাড়ের উপর দিয়ে এগোতে। বাঁ ধারের পাহাড় সাক্ষাৎ শমন। শেরপারা, বিশেষ করে আঙ শেরিং পাহাড়ের চেহারা দেখে নিমাইয়ের কথাই সমর্থন করেছে।

বাঁ দিকে বেতারথলি। মাথায় বরফের স্তূপ। ডান দিকে রণ্টি পর্বত। মূল রণ্টি নয়, ওরই জ্ঞাতিগুষ্ঠি। এ দুই কঠিন প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেঁকেচুরে রণ্টি নদী কোনমতে বেরিয়ে এসেছে। রণ্টি পাহাড়ের পিছন দিকটায়, যে দিক দিয়ে ওরা এগিয়ে চলেছে, বিশেষ বরফ নেই। তবে পনেরো-ষোল হাজার ফুট ওপর থেকে ওর গা ভেঙে গিয়েছে। সমস্ত পাহাড়টা শিথিল মাটি আর পাথরের প্রকান্ড বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। বেতারথলিও শান্ত নয়। সারাদিন তার গায়ে রোদ লাগে। তার সারা গায়ে, মাথায় আলগা তুষারের নৈবেদ্য সাজানো। রাতদিন ভীষণ আওয়াজ তুলে তা খসে খসে পড়ছে। ধস নামছে তুষারের।

সমস্ত পরিবেশে কেমন এক ক্রূর হিংস্রতা। সমস্ত পাহাড় যেন নীরব ষড়যন্ত্রে মগ্ন। গোপনে মারাত্মক সব ধারালো অস্ত্রে ওরা যেন অনবরত শান দিচ্ছে। ওরা যেন তৈরী। বাগে পেলেই ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে অভিযাত্রীদের উপর।

অভিযাত্রীরাও আবহাওয়ায় এই চক্রান্তের আভাস যেন পেয়ে গেল। অভিজ্ঞ শেরপা সর্দার আঙ শেরিং সবাইকে বার বার সতর্ক করে দিল।

"শুনো সাবলোগ, ইয়ে পাহাড় বহোৎ খতরনাক হ্যায়। হুঁশিয়ারি সে যানা হোগা। পাথর বহোৎ লুজ হ্যায়। হাসো মৎ, কাশো মৎ, জোরসে বাৎ ভি মৎ বোলো। বহোৎ হুঁশিয়ারি সে যানা হোগা। মালুম।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক ওরা রণ্টি নদীর বাঁ ধার ঘেঁষেই চলল। নদী পার হবার সুবিধেমত জায়গা আর খুঁজে পায় না। অবশেষে এক জায়গায় এসে আঙ শেরিং বলল, এখানে পুল বাঁধতে হবে। বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

পুল সেই খরতর গতিস্রোতের উপর বাঁধা কি সোজা! শেরপাদের অমানুষিক পরিশ্রমে অবশেষে নদী পার হবার ব্যবস্থা হল। অভিযাত্রীরা যখন নদী পার হয়ে ডান ধারে গিয়ে পেঁছুল তখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়। তারপর শুরু হল কষ্টসাধ্য চড়াই। একটানা ওঠা। আধ ঘণ্টা অবিরাম উঠে ওরা পাহাড়ের উপর কাছিমের পিঠের মত একটা ঢালু পেল। ধ্রুব আর নিমাই ধপ করে সেখানে বসে পড়ল। ওদের দম ফুরিয়ে গিয়েছে। ধ্রুব আজ মাউণ্টেনীয়ারিং বুট পরেছে। পায়ে তার অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্চয়ই ফোস্কা পড়েছে। ধ্রুব পা আর পাততে পারছে না। নিমাইয়ের যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে। নাভিকুন্ডের কাছটায় এমন মোচড় দিয়ে উঠছে যে, সে অস্থির হয়ে উঠছে। 'বনমালীবাবুর বাড়ি'তে এক ছুটে যেতে পারলে সে বোধ হয় স্বস্তি পেত। অসহায়ভাবে নিমাই চারিদিকে একবার চাইল। এ অতি ভয়াবহ স্থান। কোন আবদার এখানে চলবে না। নিমাই ভিতরের তাগিদকে প্রশ্রয় দিল না। শুধু মনে মনে নিজের মুণ্ডপাত করতে লাগল। কাল থেকে তার ভয়ানক আমাশা হয়েছে। কেন সে-কথা ডাক্তারকে জানাল না সে? কেন সে অসুস্থ শরীরে এল আজ? কিন্তু এ ভুল এখন আর শোধরাবার সময় নেই। সঙ্গীরা তাদের জন্য থেমে পড়েছে। একটু দম ফিরে পেতেই তুষার-গাঁইতিতে ভর দিয়ে নিমাই উঠে দাঁড়াল। ধ্রুবও।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "রেডি?"

নিমাইয়ের পেটটা সেই মুহূর্তেই আবার খামচে উঠল। নিমাই কথা বলল না। বুড়ো আঙুলটা তুলে শুধু একটা সিটি দিল, সুঁ-উ-উ-ই।

অতি সাবধানে ওরা চলেছে। পাহাড় সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। একটি পাথর গায়ে বা মাথায় পড়লে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সাঙ্গ। একবার একটা বিরাট পাথর হুড়মুড় করে গড়িয়ে এল। ওদের মাথার কাছাকাছি এসে এক লাফ মেরে নিচে নেমে গেল। ঝুরো মাটি ঝুরঝুর করে বৃষ্টিধারার মত ওদের মাথায় এসে পড়তে লাগল।

দিলীপ বিরক্ত হয়ে উঠল। এমন ছবিটা সে তুলতে পারল না। দাঁড়াবার জায়গা নেই। তার মনে হল, বিপজ্জনক কোন ছবিই সে এ পর্যন্ত তুলতে পারে নি। কেউ পারে কি? এমন সব জায়গায় নিজেকে বাঁচাতেই সময় চলে যায়। নিজে বাঁচলে তবে বাবার নাম। ছবি তো তার অনেক পরের জিনিস। দূর ছাই, তবে আর এই যন্তরগুলো বয়ে মরা কেন? হঠাৎ ওর তুষার-গাঁইতির সুঁচলো মুখটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দিলীপ সাবধান হবার আগেই সেটা ঢুকে গেল তার বাঁ হাতের তর্জনীতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সে আঙুলটা মুখে পুরেই উঠতে লাগল।

বিশ্বদেব বলল, "কী রে দিলীপ, কী হল রে?"

দিলীপ জবাব দিল, "কিছু না। একটু ভিটামিন খাচ্ছি।"

প্রথমে বোঝা ফেলে দিল ধ্রুব। পা আর পাততে পারে না, ফোস্কার এমন যন্ত্রণা। ধ্রুবর বোঝায় মাল কম ছিল। সবাই ভাগ করে তুলে নিল। তারপর মদন। সেও বসে পড়ল। ওর পায়ে খিল ধরে গিয়েছে। তারপর বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে বসে পড়ল নিমাই। তার দুর্বল শরীর না পারল বোঝার ভর সইতে, না পারল নিজের ভর সইতে। বোঝা নামিয়ে ফেলায় ধ্রুব তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। মদনও। কিন্তু নিমাইয়ের একেবারে অচল অবস্থা।

ওরা এখন আবার নেমে এসেছে রণ্টি নদীর বুকে। পাথরে নুড়িতে ভর্তি চারিদিক। মাঝে মাঝে বালি। নিমাই বড়সড় এক পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। দু সপ্তাহ দাড়ি কামানো হয় নি। এরই মধ্যে চাপদাড়ি গজাবার উপক্রম হয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে আসছে। একটু লেমন-বার্লি খেয়ে নিল সে। চা খেতে ইচ্ছে করছিল তার। ওদের সঙ্গে ফ্লাস্ক আছে। চা আছে। কিন্তু গরম কিছু খেতে সে ভরসা পাচ্ছে না। এই শরীর নিয়ে তার আসাই অন্যায় হয়েছে। পাহাড়ের পথে সঙ্গীর দাম অনেক। কিন্তু অসুস্থ সঙ্গী অভিশাপ-বিশেষ।

নিমাই ঠিক করল, এখানে এই নদীর বুকে সে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করবে। ওরা তাকে এখানে রেখে বরং এগিয়ে যাক। ফেরার পথে ওরা যেন তাকে নিয়ে যায়। নিমাই প্রস্তাবটা করল। আঙ শেরিং বললে, তা হয় না। প্রথমত এই নির্জনে একা বসে থাকলে নিমাইয়ের খারাপ লাগবে। দ্বিতীয়ত, এ জায়গা একেবারে অপরিচিত, এর ঘাতঘোত কিছুই জানা নেই। যে-কোন সময় যে-কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। কোয়ার্টার মাস্টারকে ফেলে রেখে যাওয়ার সে পক্ষপাতী নয়।

অগত্যা নিমাইকে উঠতে হল। তার মালের বোঝা সেখানেই ফেলে রাখা হল। তারপর তারা এক সঙ্গে চলতে শুরু করল। এবার চড়াইটা তত বেয়াড়া নয়। ধীরে ধীরে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা জায়গা বেশ খাড়া। তবে উচ্চতা বেশী নয়।

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর সেই রহস্যময় দৃশ্যটির উপর সকলের নজর

পড়ল। প্রথমে অবশ্য আঙ শেরিং দেখল সেটা। আঙ শেরিংয়ের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তে চেহারা বদলে গেল তার। তাকে দেখে মনে হল সে প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দিলীপকে ডাকল আঙ শেরিং। দা তেম্বাকে ডাকল। গুণদিনকে ডাকল। টাসী এল। আঙ ফুতার এল। ওরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সবাই এগিয়ে গেল একটা বড় পাথরের দিকে। সন্তর্পণে বালির উপর সতর্ক দৃষ্টি বুলাতে লাগল। এদিক ওদিক চাইল। নিজেদের মধ্যে স্বভাষায় আলোচনা করতে লাগল। দিলীপ ওরা সে ভাষার এক বর্ণও বুঝতে পারল না। শুধু যে শব্দটা শেরপারা সকলেই বার বার উচ্চারণ করছে, সেইটাই বার বার ওর কানে বাজতে লাগল।

"ইটি ইটি ইটি ইটি—"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা দিলীপের লেগেছিল শেরপাদের মুখে "ইটি ইটি" চিৎকার শুনে। ইটি—ইটি—ইয়েতি! সেই ইয়েতি, যার সন্ধানে হিলারি দলবল নিয়ে খুম্বু উপত্যকা চষে বেড়াচ্ছেন! সেই ইয়েতির সাক্ষাৎ ওরা পেয়ে যাবে নাকি!

আঙ শেরিং উবু হয়ে বালির উপরকার কতকগুলো ছাপ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। দিলীপ তার পাশে বসে পড়ল। এতক্ষণে তার দেহে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। ভিজে বালির উপর যে চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে, তাকে অনায়াসে পদচিহ্ন মনে হতে পারে। এমন কী, যদিও ছাপগুলো খুব স্পষ্ট নয়, তবু চট করে মানুষের পায়ের ছাপ বলেই মনে হবে।

এমনও তো হতে পারে, কোন লোক, কাঠুরে কি শিকারী, এদিকে এসেছে আমাদের আগে? প্রশ্নটা দিলীপের মনে উঁকি দিল। গোরা সিংকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, নেহি সাব্, হিয়াপর কোই আদমি নেহি আতা। শেরপারা সমস্বরে বললে, এ আর কেউ না, ইটি ইটি ইটি—

দিলীপ ছবি নিল।

নদীর বুক থেকে ওরা আবার উঠতে শুরু করল। নদী পেরিয়েই খাড়া চড়াই। প্রায় এক শো ফুট উঠে পাহাড়ের গাটা খানিক ঘুরে যেতে হল। আঙ শেরিং আগে আগে যাচ্ছে। বিপজ্জনক জায়গাগুলো সতর্কভাবে পার হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে ওদের এক-একজনকে ডাকছে, ওরা একে একে পার [illegible]চ্ছে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট এইভাবে চলার পর ওরা আবার পাহাড়ের গা থেকে নদীর বুকে নেমে এল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর কিছুটা এগিয়ে যেতেই একটা সুন্দর দৃশ্য ওদের সামনে ভেসে উঠল। পুরনো বরফের গুহার মধ্য থেকে জলের স্রোত বেরিয়ে এসে রণ্টিতে পড়ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সেখানে। তারপর গুহাটাকে ডান পাশে রেখে ওরা এগিয়ে চলল।

এবারে ওরা পেঁজা বরফের বিরাট একটা স্তূপ পার হল। রণ্টির শাখা থেকে কবে এক প্রচণ্ড তুষার-ধস নেমেছিল সেইটাই এখন ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ বরফের রঙ কিন্তু সাদা নয়। দেখলে মনে হয়, হাজার হাজার মণ চুন কেউ বুঝি পাহাড়ের মাথা থেকে ঢেলে দিয়েছে।

রণ্টি নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এতক্ষণ দিলীপরা রণ্টি নদীর ডান ধার দিয়ে যাচ্ছিল। এবার নদীটা পেরিয়ে বাঁ ধার দিয়ে চলতে লাগল। আবার একটা খাড়া চড়াই সামনে পড়েছে। প্রায় দেড় শো ফুট হবে। ওরা ক্রমশ আমাদের তেরো-তলা সেক্রেটারিয়েটের মত উঁচু চড়াইয়ের উপরে উঠে গেল। দিলীপ, দা তেম্বা আর টাসী প্রথমে পৌঁছল। বেলা তখন সওয়া দুটো। আঙ শেরিং এসে বলল, বাস্, এইখানেই মাল ডাম্প্ কর।

॥ আটত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

ডাক্তার বলল, চারটে বাজে। এবার ওদের ফেরার সময় হল। আমরা সবাই, যেদিক দিয়ে আজ সকালে ওরা অ্যাড্ভান্স বেস্ ক্যাম্পের জায়গা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছে, সেইদিকে চাইলাম।

আকাশ এতক্ষণ একেবারে পরিষ্কার ছিল। প্রচুর রোদ। সূর্যের আলো এখনও উজ্জ্বল। এতক্ষণে বহু দূরে বেথারতলির ছোট্ট গম্বুজ থেকে একটা শ্বেত বাষ্পীয় ফোয়ারা—ঠিক যেন ধোঁয়া—আকাশে উঠতে শুরু করল। আমার মনে হল, অনাদি অনন্ত সাগরে একটা অতিকায় তিমি বুঝি জল ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে। সেই সাদা ফোয়ারা আকাশে উঠতে লাগল। একটু একটু করে জমতে লাগল। এক এক টুকরো মেঘ হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেখানে হাল্কা মেঘের মেলা বসে গেল।

আজীবা আজ বড় বিষণ্ণ। প্রথম দলে সে যেতে পারে নি। বিষণ্ণ চোখে সে চেয়ে রইল রণ্টি নদীর উজান পথের দিকে। ওই পথেই সবাই ফিরে আসবে।

বীরেনদা হামাগুড়ি দিয়ে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ভূতের মত চেহারা হয়ে গেছে তার। আজ কাশি একটু কম।

"ওদের আসবার সময় হয়ে এল, কী বলিস?" বীরেনদা একটু একটু কাশল।

হরি সিংকে চা বানাতে বললাম। বিস্কুট লেমন-পানি তৈরি রাখতে বললাম। তারপর বেস্ ক্যাম্পের উপর নজর বুলিয়ে নিলাম। ওই যে আমাদের সবুজ তাঁবুটা। সেই সারিতেই আরও দুটো তাঁবু—সাদা আর্কটিক টেণ্ট। আমাদের পাশেরটাই সুকুমারের আর ধ্রুবর, তার পাশেরটা মদনের আর বিশ্বদেবের। এই সারির এক ধাপ নিচে আরও দুটো তাঁবু। একটা নিমাইয়ের আর দিলীপের, অন্যটা ডাক্তারের আর আজীবার। এই সারের বাইরে ছোট্ট ওই তাঁবুটা আঙ শেরিংয়ের। আরও খানিকটা নিচে ত্রিপল খাটিয়ে বানানো হয়েছে রসুইখানা। হরি সিং, লালু আর দা তেম্বা ওর মধ্যেই শোয়। রেডিওটা ওখানেই রাখা হয়েছে। তার এক ধাপ নিচে আর-একটা ত্রিপল খাটানো—সেখানে শোয় পেম্বা নরবু, গুর্ণদিন, টাসী আর আঙ ফুতার। মালবাহকরা বেস্ ক্যাম্পের তিন শো ফুট উপরে আর-একটা জায়গায় পাথরের খোঁড়ল খুঁজে বের করেছে। সেখানে ওরা গুহাবাসী হয়েছে।

এখন বেস্ ক্যাম্প ফাঁকা। আমরা পাঁচজন মাত্র আছি। ওই যে উপর থেকে মালবাহকেরা নেমে আসছে। আজীবা তার তাঁবুর বাইরে বসে বসে সেলাই করছে। আজ সারাদিন সে সেলাই করেছে। কিচেনের খুঁটিতেও দুটো ভেড়ার রাং ঝুলছে। এখানে কিছুই পচে না।

"ওই যে, ওই যে ওরা আসছে।" দূরবীনচোখ ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল। "ওই যে, ওই বরফের উপর চেয়ে দেখুন। একজন, দুজন, পাঁচজন, সাত, আট... সবাই আসছে।"

বুকটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম, প্রথমটা কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো। হ্যাঁ, ওই যে দূরে, একটা বরফের পাহাড় আছে বটে। ডাক্তার বলেছিল, ওরা নাকি যাবার সময় সেটা পেরিয়ে গিয়েছে। বরফের উপর তীক্ষ্ম নজর দিলাম। হ্যাঁ, এতক্ষণে

সচল কালো বিন্দুগুলো নজরে পড়ল।

আজীবা গম্ভীরভাবে বলল, "মালুম হোতা, রাস্তা খারাপ হ্যায়। আচ্ছা নেই লাগতা।"

আমি চটপট তৈরী হয়ে নিলাম। আমার সংগে লালু, আক্কেল, কর্ণ বাহাদুর চা বিস্কুট লেমন-পানি নিয়ে যেতে রাজী হল। আমরা যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পথটা যেখানে রণ্টি নদীর বুকে নেমে গিয়েছে সেইখানে দেখা হল দা তেম্বা আর আঙ ফুতারের সংগে। ওরা দারুণ বেগে এগিয়ে এসেছে। ওদের ছবি তুললাম। চা খেতে দিলাম। ওরা চলে গেল। আমরা আরও খানিক এগিয়ে পুরো দলটার সাক্ষাৎ পেলাম। ফোটো তোলার আলো ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে।

আমাকে ওরা আশা করে নি। দেখে খুব খুশী হল। ওখানেই সব বসে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে চা খেয়ে চাংগা হল। দিলীপের হাতে লেগেছে। ধ্রুব আর নিমাই অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু নিমাই আমাকে দেখেই সু-উ-ই করে একটা সিটি দিল।

সুকুমার জানাল, অ্যাড্‌ভান্স বেসের জন্য সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে। হিমবাহের একেবারে নাকের ডগায়। রণ্টি নদী ওখান থেকেই বেরিয়ে আসছে। আমরা পাথরের উপরই তাঁবু ফেলতে পারব। কোন দিক থেকেই পাথর কি তুষার-ধস নামার উপায় নেই। সেদিক থেকে জায়গাটা নিরাপদও।

সুকুমার থামলে নিমাই বলল, "আসলে জায়গাটা আছে একটা মিডিয়াল মোরেনের উপর। ওর নিচে কিন্তু বরফ, হিমবাহ। হিমবাহের উপর পাহাড় ধসে ধসে এত পাথর পড়েছে যে, বরফ আর দেখাই যায় না। এদিককার পাহাড়-গুলো যে আন্দাজে ভাঙছে, তাতে কিছুকাল পরে ওগুলোর চেহারাই বদলে যাবে।"

দিলীপ বলল, "এদিকে তুষার-মানব আছে। আমরা তার পায়ের ছাপ দেখেছি রণ্টি নদীর ভিজে বালির উপরে। বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখেছি।"

কী জানি কেন খবরটা আমাকে চমক দিতে পারল না। এমন কী, আঙ শেরিং বার বার ওগুলোকে 'ইটি'র (ইয়েতি কথাটা ওদের মুখে এই রকমই শোনায়) পায়েরই ছাপ বলে জোর করা সত্ত্বেও আমি বিশেষ আমল দিলাম না। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, তুষারমানবের পায়ের ছাপ বালির উপরে পড়তে পারে না। দিলীপ বলল, সে ছবি তুলেছে। তাতেও আমি বিশেষ বিচলিত হলাম না।

চা পান শেষ করে, যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়ে, ধীরে ধীরে দলটা বেস্‌ ক্যাম্পে ফিরে এল। এবার শুরু হল ডাক্তারের কাজ। ধ্রুবর জুতো খুলে দেখা গেল মারাত্মক ফোস্কা পড়েছে তার পায়ে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। দিলীপের আঙুলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেটা ড্রেস করা হল। নিমাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে বিশ্রাম দেওয়া হল।

রাত্রে খাবার সময় আবার পরামর্শ-সভা বসল। যেখানে আজ মাল ডাম্প্‌ করে আসা হয়েছে, আঙ শেরিংয়ের মতে সেই জায়গাটাই অ্যাড্‌ভান্স বেসের পক্ষে সব থেকে নিরাপদ। অ্যাভালান্স ঘাড়ে পড়বে না, পাথরও মাথায় পড়বে না। তবে ওখানে জল নেই, লকড়ি নেই। জল না থাকুক, বরফ আছে। বরফ গলিয়ে এন্তার জল পাওয়া যাবে। সমস্যা শুধু লকড়ির। আর সে সমস্যা সমাধানের

একমাত্র উপায় বেস্ ক্যাম্প থেকে লকড়ি ভেঙে অ্যাড্ভান্স বেসে পাঠিয়ে দেওয়া। ঠিক হল, তাই দিতে হবে। আর, এ কাজের ভার পড়ল আমার আর ধ্রুবর উপর।

১১ই অক্টোবর। সুন্দর আবহাওয়া। এইমাত্র ওরা চলে গেল অ্যাড্ভান্স বেসের দিকে। আজ নিমাই আর ধ্রুব বেস্ ক্যাম্পে থেকে গেল। ওরা বিশ্রাম নেবে। বিশ্বদেব, মদন, আঙ শেরিং আর টাসী আজ থেকে যাবে অ্যাড্ভান্স বেসে। কাল ওরা ওখান থেকে প্রথম শিবিরের স্থান নির্বাচনে বের হবে। সেই রকমই প্ল্যান হয়েছে গতকাল। হরি সিং ওদের সঙ্গে চলে গিয়েছে। সে অ্যাড্ভান্স বেসেই থাকবে।

নিস্তব্ধ এই পরিবেশে বসে দিনলিপি লিখছি। নিমাই আর ধ্রুব কিচেনে বসে রেডিও চালাচ্ছে। বীরেনদা ক্যামেরা ঝাড়পোঁছ করছে। আজীবা কার যেন একটা ঘড়ি মেরামতে ব্যস্ত। এই লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে না।

একটা হিমালয়ের ঈগল ডানা মেলে আমাদের মাথার উপর অনবরত উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার শরীরও বেশ খারাপ। আমাশা হয়েছে। ডাক্তারের দাওয়াইয়ের ক্রিয়া সহজে নিমাইয়ের উপর হচ্ছে, তেমন ক্রিয়া আমার উপরেও হচ্ছে না কেন, ভেবে অবাক হচ্ছি।

এদিক ওদিক চাইছি। মদন আর বিশ্বর তাঁবুটা যেখানে ছিল, আজ সেখানটা শূন্য। সর্দারের ছোট্ট তাঁবুটা নেই। একটা ত্রিপলও আজ উপরে উঠে গিয়েছে। বেস্ ক্যাম্প ফাঁকা হতে শুরু করেছে।

বেলা প্রায় দেড়টা। হঠাৎ হাওয়া শুরু হল। আকাশ মেঘে ছেয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আবহাওয়া ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। একটু আগেই কেমন রোদ ছিল। এখন চেয়ে দেখি, তা পালিয়েছে। আলো ছিল কত, তাও দেখি পালিয়েছে। এই তো ঈগলটা উড়ছিল ডানা মেলে। আবহাওয়ার ভ্রূকুটিতে ভয় পেয়ে সেও পালিয়েছে।

ভীষণ ঠান্ডা পড়ল। বাইরে বসে থাকতে পারলাম না। তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। হঠাৎ চড়চড় চড়চড়, তাঁবুর উপর তুষার পড়তে লাগল। স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতায় আশ্রয় নেবার আশায়, বৃথা বিলম্ব না করে, তার ভিতরে ঢুকে গেলাম।

বিশ্বদেবের দিনলিপি :

অ্যাড্ভান্স বেস, ১১ই অক্টোবর। আমাদের এখানে পেঁছে দিয়ে ওরা চলে গেল। একটা উঁচু পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম আমি আর মদন। ওরা বেশ দ্রুত নেমে যাচ্ছে। অদৃশ্য হবার পূর্বমুহূর্তে দিলীপ ফিরে চাইল। আমরা হাত নাড়তে লাগলাম। সে দেখতে পেল। হাসল। হাতটা তুলে একবার নাড়ল। তারপর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনও বেশ রোদ। বেশ আলো।

ফিরে দেখি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছেঁড়া-ছেঁড়া হাল্কা মেঘ জমতে শুরু করেছে। বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না। মালগুলো উন্মুক্ত জায়গাতেই পড়ে আছে। এগুলো তুলব তুলব-ভাবছি। তার আগে অ্যাড্ভান্স বেসের চারদিকে চোখটা বুলিয়ে নিতে লাগলাম। পাথরের চাঙড় সরিয়ে সরিয়ে বা সাজিয়ে তাঁবু খাটানোর জায়গা করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের পশ্চিমে রয়েছে রণ্টির

প্রসারিত দেহের পশ্চাদ্ভাগ। বিরাট উঁচু, উলঙ্গ পাথুরে গিরিশিরাটা দেখা মাত্র মনে সম্ভ্রম জাগে। ওই পাথুরে গিরিশিরা থেকে চোখ ধীরে ধীরে দক্ষিণে ঘুরিয়ে আনলে দেখা যায়, এই গিরিশিরাটাই কিছুটা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার পশ্চিমে মোড় নিয়েছে। এটারই শেষ প্রান্তে রণ্টির শিখরকে নাকি পাওয়া যাবে।

আমাদের পূবে রয়েছে বিরাট এক খাদ। একটু এগিয়ে উঁকি মারলে দেখা যায়, হিমবাহের শেষ প্রান্ত থেকে রণ্টি নদী বেরিয়ে যাচ্ছে। বিরাট খাদটার পূব পাড় থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। ওটা বেথারতলি হিমালেরই লেজুড়। এই পাহাড়টা পাথুরে নয়, ছাই-ছাই মাটি আর পাথরে গড়া। তার উপর শ্যাওলার শ্যামল পলেস্তারা। সেই মাটি আর পাথর এত আলগা যে, মিনিটে মিনিটে ধস্ নামছে। সব সময় পাহাড় ধসার ভীষণ গর্জনে চারিদিক মুখরিত। পূবদিকের গিরিশিরাটি দক্ষিণে এগিয়ে মূল বেথারতলি হিমালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

শিবির থেকে ৩০।৪০ গজ দক্ষিণে এক ভয়াবহ বরফের ফাটল হাঁ করে চেয়ে আছে। নজর পড়লেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে। চারটে প্রায় বাজে। সূর্যের তেজ কমে আসছে। মেঘ জমছে দ্রুত। এখন বরফের ফাটলটার মুখে কিছু আলো, সেখানটা সাদা দেখাচ্ছে। ভিতরটায় ছায়া পড়েছে, ভীষণ কালো হয়ে উঠেছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুললাম।

হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হল। দৌড়ে কিচেনে এসে আশ্রয় নিলাম। ত্রিপল খাটিয়ে, পাথর সাজিয়ে পাঁচিল গড়ে কিচেনে সুরক্ষিত এক আশ্রয় গড়ে তোলা হয়েছিল, তাই রক্ষে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। তুমুল তুষারপাত হতে লাগল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। শীত, কী প্রচণ্ড শীত! হরি সিং ভয় পেয়ে গেল। ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে। ফ্যালফ্যাল করে চাইছে। আর তারস্বরে ঈশ্বরকে ডাকছে। শেরপা দুজন, মদন একটু আগেই খোলা মালগুলো কিছু তাঁবুতে পুরে, কিছু কিচেনে এনে বাঁচালে।

আমাদের তাঁবুর উপর পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। বড় ভাবনা হল। তাঁবু-গুলো ওয়াটার-প্রুফ নয়। আর এমনই দুর্দৈব, অ্যালকাথিনের শীটগুলো বেস্ ক্যাম্পে ফেলে এসেছি। ফলে, অবস্থা যা দাঁড়াবে, সে কথা ভেবে শরীর আরো হিম হয়ে গেল। আমরা আগুনের দিকে সরে বসলাম।

আর ভাবতে লাগলাম ওদের কথা, যারা কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে বেস্ ক্যাম্পে রওনা দিয়েছে। জানি, ও-পথে বিন্দুমাত্র আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। জানি, ওদের কারও কাছে উইণ্ড-প্রুফ নেই। এই দুর্যোগে যে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। ওদের কথা ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তা বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু কী করব? কী করতে পারি? কাল দুপুরের আগে কোন খবর পাবার সম্ভাবনাই নেই। একটা ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের অভাব বড় হয়ে দেখা দিল। আহা, ওরা নিরাপদে পেঁছাক, এই প্রার্থনাই মনে মনে জানাতে লাগলাম।

॥ ঊনচাল্লিশ ॥

অ্যাডভান্স বেস্‌ থেকে নেমে, নদীর বুকে দাঁড়িয়ে দিলীপ একবার পিছনে ফিরে চাইল। না, তাঁবুগুলো আর দেখা যায় না। সামনের ঢিবিটা আড়াল রচনা করেছে। একটা মাত্র নিদর্শন দিলীপের চোখে পড়ল, লাল টকটকে একটা পতাকা, যা বলে দিচ্ছে ওই উঁচু ঢিবিটার অন্তরালে গোটাকতক মানুষ অস্থায়ী এক আস্তানা গেড়েছে। এত জিনিসের মধ্যে শুধু ওই লাল পতাকাটাই দিলীপের নজরে পড়ল। ওটা 'বনমালীবাবুর বাড়ি'র ধ্বজা। দিলীপ মনে মনে হাসল। ঘড়ি দেখল। তিনটে বাজে। বেশ আকাশ। বেশ রোদ।

বেশ দ্রুতই নেমে চলেছে ওরা।

দা তেম্বা হঠাৎ বলল, "সাব্‌, আউর জলদি চল। বরফ গিরেগা। 'স্নো-ফল' হোগা।"

দিলীপ আকাশের দিকে চাইল। ছেঁড়া-ছেঁড়া কতকগুলো হাল্কা মেঘ ভেসে ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠছে। একটু শীত শীত করছে যেন।

দিলীপ সুকুমারকে বলল, "জোরে চল রায়। দা তেম্বা বলছে তুষারপাত হতে পারে।"

সুকুমার মুখ তুলে আকাশের চেহারাটা দেখে নিল। এরই মধ্যে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সুকুমার মনে মনে বললে, ভোগাবে দেখছি।

ওরা আরো দ্রুত নেমে যেতে লাগল। এইটাই একমাত্র আশার কথা যে, পথটা বেশীর ভাগই এখন উৎরাই। তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা চোখে-মুখে লাগছে। তুষার-গাঁইতির ইস্পাতের ফলাটায় আর হাত রাখা যাচ্ছে না, এমনই ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে ঠাণ্ডায়। আরো মুশকিল এই যে, আজ ওরা উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেটটা পর্যন্ত সঙ্গে আনে নি।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই ওরা অ্যাভালান্সটার কাছে গিয়ে পেঁছাল। এতক্ষণ নেমে আসছিল পথটা। এবার খানিকটা চড়াই। ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে উঠতে লাগল চড়াই ভেঙে। আকাশ ততক্ষণে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছে। জমাট মেঘ হাওয়ার প্রশ্রয় পেয়ে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে নেমে আসছে। দিলীপের মনে হল, ওগুলো যেন ছোঁ মেরে ঠোকরাতে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াইটার মাথায় উঠতেই ওদের দম বেরিয়ে গেল। ওরা ধপ ধপ করে সেখানেই বসে পড়ল।

আকাশ বুঝি এতক্ষণ এই সুযোগই খুঁজছিল। ওরা শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে সে এখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। ওরা অসহায়ভাবে চেয়ে দেখল তুষারবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ওদের ব্যগ্র চোখগুলো আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হল। একটা গুহা, একটা বড় পাথরের আড়াল কি একটা ফাটল—কোথাও কিছু নেই। শুধু ন্যাড়া পাহাড়।

তুষারপাত শুরু হল। প্রথমে ছোট ছোট দানা, দুধের মত সাদা, কেউ যেন ঝুড়ি ঝুড়ি, কোটি কোটি সাদা সাদা এলাচদানা আকাশ থেকে ঢেলে দিচ্ছে। হাওয়ায় এদিক-ওদিক উড়ে চলেছে। গায়ে পড়ছে, পায়ে পড়ছে, মাথায় পড়ছে। পাহাড়ে পাথরে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। দেখতে দেখতে দানাগুলো আকারে বড় হতে লাগল। যেন মেসিনগানের গুলী। মুখে মাথায় হাতে নাকে যেখানে লাগে মনে হয় বুঝি ফুটো হয়ে যাবে।

ওরা উঠে পড়ল। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। এমন কী, এ কথাও ভুলে গেল, ওরা পাহাড়ে এসেছে; পাহাড়ের পথ, বিশেষ করে এই পথটুকু ভয়ানক

বিপদে ভরা। ভুলে গেল, পা যদি একবার হড়কে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হাজার ফুট নিচে গিয়ে আছাড় খেতে হবে। এ জীবনে আর সাবধান হবার সুযোগ মিলবে না।

সেসব কোন কিছুই ভাবছে না ওরা। ওরা এখন প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন তুষারপাত ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, ওরা পথ দেখতে পাচ্ছে না। ভিজে নেয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে আসছে। ওরা শুধু ছুটছে। একটা মাত্র লক্ষ্যে—বেস ক্যাম্প। বেস ক্যাম্প। সেখানে আশ্রয় আছে। বেস ক্যাম্প। সেখানে উষ্ণতা আছে, শুকনো পোশাক আছে।

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বীরেনদার নাক ডাকতে শুরু করেছে। এখন বেলা সাড়ে চারটের বেশী হবে না। সমানে তুষারপাত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তাঁবুর কাপড় আর্তনাদ করে উঠছে। কারও কোন সাড়া নেই। নিমাই, ধ্রুব, ডাক্তার কী করছে কে জানে? দিলীপ, সুকুমারের ফিরে আসার কথা। কী করছে কে জানে? হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসঙ্গে বেজে উঠল। বীরেনদার নাকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এবারে ঢাকের আওয়াজ বেজে উঠল। নিশ্চিন্ত মনে ধরা গলায় বীরেনদা আওয়াজ ছাড়লেন, "বল বাবা বদ্রী-বিশালজী কী—" অন্যান্য তাঁবু প্রকম্পিত করে সাড়া জাগল, "জয়!"‚ সঙ্গে সঙ্গে ডাকে হাঁকে সেই নিস্তব্ধ বেস ক্যাম্প মুখরিত হয়ে উঠল।

দিলীপরা ভিজে পোশাক বদলে শুকনো পোশাক পরল। আগুনে হাত-পা সেঁকলে আরাম পেত। কিন্তু আগুন নেই। তাই সবাই একে একে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব চুপচাপ হয়ে গেল। ঝিমিয়ে পড়ল বেস ক্যাম্প।

সন্ধ্যের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ নেই, তুষারপাত নেই, হাওয়া নেই। তবু কী কনকনে ঠাণ্ডা। গরম পোশাক ভেদ করে শীত যেন মেরুদণ্ডের উপর ঠাণ্ডা আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু, আকাশে তারা দেখে মনটা হাল্কা হয়ে উঠল।

সাতটা সাড়ে-সাতটায় আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। দা তেম্বা শেরপা-স্টাইলে স্টু রেঁধেছিল। স্টু মানে মাংসের সঙ্গে আটার পুলি তৈরি করে তার লপসি। মাংস শক্ত শক্ত, পুলিগুলো কাঁচা কাঁচা। আমাশার পথ্য হিসেবে এর বোধ হয় জুড়ি নেই। পেটের অবস্থা কাল যা দাঁড়াবে তা মনশ্চক্ষে দেখে নিয়ে চমৎকৃত হলাম। 'জয় গুরু' বলে সেই স্টুই খানিকটা খেয়ে নিলাম। খাওয়ার সময় সুকুমার জানাল, আগে যে প্ল্যান ছকা হয়েছিল সে তার একটু পরিবর্তন করতে চায়। তার ইচ্ছে, আগামীকাল শুধু শেরপারাই উপরে যাবে। মাল পেঁছে দিয়ে আসবে। অন্য সবাই বিশ্রাম নেবে। দিলীপ, নিমাই, ধ্রুব পরামর্শ দিল, শুধু শেরপাদের না পাঠিয়ে, ওই সঙ্গে ওদের একজনকেও পাঠানো হোক। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সুকুমার আর দিলীপ বিশ্রাম নেবে, আর নিমাই শেরপাদের সঙ্গে যাবে। দিলীপের অবশ্য বিশ্রাম নেবার দরকার ছিল না, সে চায়ও নি। কিন্তু নেতার নির্দেশে তাকে নিরস্ত হতে হল।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

অ্যাডভান্স বেস্। প্রায় আধ ঘণ্টা মুষলধারে তুষারপাত হল। দেখলাম

ছ-সাত ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে। ত্রিপলের উপর, তাঁবুর কাপড়ে বরফ জমে আছে। সেই বরফ চেঁছে নিয়ে, তাই আগুনে গালিয়ে জল তৈরি করা হল।

তুষারপাতের পর প্রচণ্ড শীত পড়ল। সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। আঙ শেরিং চমৎকার মাংস পোলাও রেঁধেছিল। খেতে খুব ভাল লাগল। ঠিক হল, কাল সকাল নটার সময়ই আমরা ১নং শিবিরের জায়গা দেখতে বের হব। সঙ্গে কী কী নেওয়া হবে? আঙ শেরিং বললে, প্রথম দিন আমাদের রাস্তা তৈরি করতে হবে। কাজেই খুব বেশী মাল নেওয়া চলবে না। রেশন নেব, দড়ি নেব, পিটন নেব, আর নেব পার্সন্যাল কিট্। আঙ শেরিং বললে, আমাদের তাঁবু কম আছে। কাজেই ক্যাম্পগুলো বেশ তফাতে তফাতে স্থাপন করতে হবে। সর্দারের ইচ্ছে, ১নং শিবিরটা অন্তত মাইল পাঁচেক দূরে হয়।

আমরা সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। তাঁবুর কাপড়ের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। উপায় কী, ওই ঠাণ্ডায় সেই ভিজে ভিজে স্লিপিং ব্যাগেই ঢুকতে হল। আমাদের ক্যাম্পে, কিচেনে পেট্রোম্যাক্সের আলোটা জ্বলছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগছে।

তুষারপাতের পর থেকেই মনে হচ্ছিল; আজ যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন কী কথা বলতে গিয়েও দেখি, একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ছি। শুয়ে শুয়ে অস্বস্তি লাগছে। ঘুম আসছে না।

আমাদের টেণ্ট-লণ্ঠন ছিল না। আমরা মগের মধ্যে মোমবাতি জ্বালালাম। আমি লিখছি। মদন বাতি ধরে আছে। আর মনে মনে আমার মুণ্ডপাত করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে কোথাও ঝরনা আছে নিশ্চয়ই, তার একটানা জল পড়ার শব্দ কানে এসে বাজছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণ শব্দ করে অ্যাভালান্স নামছে!...

॥ চল্লিশ ॥

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

অ্যাডভান্স বেস। ১২ই অক্টোবর। ঘুম ভাঙল হরি সিংয়ের "সাব্ চা, সাব্ চা" ডাকে। ঘড়িতে দেখি সাড়ে আটটা। হাত বাড়িয়ে চা নিলাম। উঃ, কী শীত! চা খেতে লাগলাম। এই প্রথম চায়ের সঙ্গে মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেটের অভাব অনুভব করলাম। কারণ, আজ আর আঙ ফুতার নেই। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। একে শীতে রক্ষে নেই, হাওয়া তার দোসর। কাঁপতে কাঁপতে কিচেনে গিয়ে ঢুকলাম। হরি সিং ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে। ব্রেকফাস্ট মানে চাপাটি আর চা। সেখানে বসে তাই খাচ্ছি আর আগুন পোয়াচ্ছি।

সেখান থেকে খানিক পরে বেরুতেই চারদিকে দৃষ্টি পড়ল। সব-কিছু বরফে ঢেকে গিয়েছে। যেদিকে চাই—সাদা, শুধু সাদা। তবে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নয়। তারই মাঝে উঁচু উঁচু পাথরগুলো কালো কালো মাথা জাগিয়ে বসে আছে।

কাল ঠিক করেছিলাম, আজ নটায় মার্চ শুরু করব। কিন্তু বেরুতে বেরুতে একটি ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। রোদই উঠল নটায়। যেন প্রাণ এল ধড়ে। একটু গরম হয়ে, তাড়াতাড়ি রুকস্যাক গুছিয়ে নিলাম।

আগের দিন যদিও সর্দার বলেছিল, বোঝা বেশী নেব না, তবু দেখা গেল তার ওজন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ পাউণ্ডের কম হল না। সবই আবশ্যকীয় জিনিস, কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না। যাত্রা করার আগে আমি আর মদন সব জিনিস পরীক্ষা করে নিলাম। জল, চা, বিস্কুট, উইণ্ড-প্রুফ জ্যাকেট নেওয়া হয়েছে কি না, দেখে নিলাম। উইণ্ড-প্রুফ ট্রাউজার্সটি পরেই নিয়েছি।

আজ আমরা মাত্র চারজন। আমি, মদন, আঙ শেরিং আর টাসী। আঙ শেরিং সকলের আগে আছে। প্রথম মিনিট কুড়ি আমরা পাথরের উপর দিয়ে চললাম। চলেছি দক্ষিণে। এই পাথরের উপরকার রাস্তাটুকু খুব বেগ দিল। কাল বরফ পড়েছে। পাথরগুলো পিছল হয়ে আছে। কোন-কোনটাতে পা দেওয়ামাত্র হড়কে যাচ্ছে। কখনও দুটো পাথরের ফাঁকে পা ঢুকে পড়ছে। যে কোন মুহূর্তে পাটা মচকে যেতে পারে। কোন কোন পাথর আবার এত আলগা যে পা রাখা মাত্র সেটা খসে পড়ছে। আবার কোনটা একেবারে নড়বড়ে। পা দেওয়া মাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সব পাথর সাবধানে এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে।

আকাশ আজ একেবারে পরিষ্কার। চলতে চলতে বেশ গরম লাগছে। বাতাসও কমে এসেছে। আমরা মোরেন থেকে এগিয়েই হিমবাহের উপরে গিয়ে হাজির হলাম। সামনেই এক চড়াই। বেশ খাড়া। বরফের সেই চড়াইটার মাথায় উঠতে আমাদের বেশ কষ্ট হতে লাগল। উপরে উঠে আমরা বিশ্রাম না নিয়ে পারলাম না।

আঙ শেরিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর আমাদের বলল. আমি আর টাসী এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আমাদের পিছনে পিছনে এস। আমরা যেখানে যেখানে পা দিয়ে যাব, তোমরাও সেখানে সেখানে পা দেবে। খবরদার অন্যখানে পা দিয়ো না।

খানিকটা এগোবার পর আমাদের দড়ি বের করতে হল। দড়ি আমরা কোমরে বাঁধলাম না বটে, তবে হাতে নিয়ে রাখতে হল।

এবারে টাসী এগিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আঙ শেরিং দড়ি হাতে সদ্য-প্রস্তুত ভাবে টাসীর পিছনে পিছনে যেতে লাগল। আমরা [illegible] পা টিপে টিপে চলছিলাম। আশেপাশে অজস্র বরফের ফাটল। কোনটা বড়. কোনটা ছোট। কোন কোনটা আবার চৌবাচ্চার মত।

যে ফাটল প্রকাশ্য. চোখে দেখা যায়. তাকে কায়দা করা সোজা। পা টিপে টিপে এড়িয়ে যাও. ঘুরে ঘুরে সেটা পার হও। তাতে সময় বেশী লাগবে. পরিশ্রম বেশী হবে. কিন্তু বিপদে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু চোরা ফাটলের চেয়ে বড় শত্রু আর বুঝি কিছু নেই। এ ফাটল চোখে দেখা যায় না. বরফের নিচে লুকিয়ে থাকে। চোরা ফাটলে পা পড়ামাত্র কোথায় তলিয়ে যাবে. কেউ বলতে পারে না। বরফের রাজ্যে বাইরের চেহারা দেখে ধরার উপায় নেই. কোথায় চোরা ফাটল আছে। অন্তত বিশ্বদেব আর মদন তা বুঝতে পারছিল না।

বুঝতে পারছিল আঙ শেরিং আর টাসী। আমরা যেমন সহজে বইয়ের পাতায় চোখ বুলিয়েই তার মর্ম গ্রহণ করে যাই. শেরপারা তেমনি অক্লেশে বরফের উপর চোখ বুলিয়েই ধরে ফেলে, কোথায় কী আছে। মরুভূমিতে উট ছাড়া যেমন গতি নেই. তেমনি পাহাড়ে শেরপা ছাড়া এক পাও চলা যায় না।

আঙ শেরিং ওদের নির্দেশ দিচ্ছিল—"সাব্. সিধা নেহি. আভি দাহিনা যাও.

আভি বাঁয়া ঘুমো সাব্, কারভিজ (ক্লিভাস অর্থাৎ ফাটল) হ্যায়"—আর মদন আর বিশ্বদেব সেই নির্দেশ নতমস্তকে মেনে যাচ্ছিল।

আজ ওদের এত ধীরে যেতে হচ্ছে, এত ঘুরতে হচ্ছে যে ওরা খুব বেশী এগুতে পারছে না। বরফ এত আলগা যে প্রতি পদক্ষেপে ওদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। ওইভাবে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে ওদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মদন আর বিশ্বদেব ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ বিশ্বদেব আছাড় খেল। একটু গড়িয়ে গেল নিচের দিকে। অকস্মাৎ এইভাবে পড়ে যাওয়ায় বিশ্ব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিল। দুপায়ে ভর দিয়ে যেখানে দেহভার সামলে নেবার চেষ্টা করল, দেখল সেখানে পায়ের তলায় ভর দেবার মত কিছু নেই। বিশ্ব ক্রমশ বরফস্তূপের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল। যতই বিশ্ব আঁকুপাকু করে উঠতে চেষ্টা করে, ততই সে ভিতরে ঢুকে যায়। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব এক কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেল।

মদন প্রথমে বুঝতে পারে নি। বিশ্বদেবের হাবভাবে তার মজাই লাগছিল। সে হাসছিল খিলখিল করে। একটু পরেই সে বিশ্বদেবের বিপদটা বুঝে ফেলল। তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে এসে বিশ্বদেবের দিকে সে নিজের তুষার-গাঁইতিটা বাড়িয়ে দিল। এতক্ষণে বিশ্বদেব যেন একটা বড় রকমের অবলম্বন পেল। জোর করে সে মদনের তুষার-গাঁইতিটা চেপে ধরল।

মদন তার গাঁইতিটাতে টান দিতেই নিজেও আলগা বরফের মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেল। বিশ্বদেবের টানে ক্রমশ সেও তলিয়ে যেতে লাগল সেই চোরা বরফের মধ্যে। এবার বিশ্বদেব সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। মদন বিব্রত বোধ করতে লাগল। নিজেকে মুক্ত করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমশই বুঝতে পারল, সে চেষ্টা অসম্ভব।

আঙ শেরিং আর টাসী একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে ওরা দূরে সরে যাচ্ছে। যদি একেবারে আড়ালে চলে যায়? যদি ওরা একবারও পিছনে না তাকায়?

মদনের ভয় হল। তা হলে ওরা উঠবে কী করে? কে ওদের উদ্ধার করবে?

মদন কালবিলম্ব না করে হাঁক ছাড়ল, "দাজু!"

মদনের গলা শুকিয়ে ছিল। আওয়াজটা হয়তো পেঁছাল না। আঙ শেরিং আর টাসী ফিরেও চাইল না। বেশ অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে ওরা। একটা ঢিবির কাছাকাছি পেঁছে গিয়েছে। ঢিবিটার ওপাশে নেমে গেলেই ওরা আর দেখতে পাবে না এদেরকে।

"দাদা—দাজু—"

মদন আবার হাঁক ছাড়ল, "দা—জু!"

বিশ্বদেব হাঁক ছাড়ল, "দাজু, দাজু—"

ওরা দুজনে সমানে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল।

দাজু—দাজু—দাজু—দাজু—ওদের ডাকটা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

এতক্ষণে আঙ শেরিং আর টাসী ফিরে দাঁড়াল। ওদের বিপদটা বুঝতে পেরে আঙ শেরিং ত্বরিত গতিতে ফিরে এল। তারপর নিজে একটা শক্ত জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দড়ি এগিয়ে দিল। সেই দড়ি ধরে ওরা অতি কষ্টে উঠে এল। আঙ শেরিং ওদের বকাবকি করতে লাগল। এত করে সাবধান করা সত্ত্বেও কেন ওরা পথ ছেড়ে বাইরে গিয়েছে? মদন মাথা চুলকাতে লাগল। ভুলটা সেই করেছে। এত

তড়বড় না করে ভেবেচিন্তে বিশ্বকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেই পারত। খুব শিক্ষা হল বটে।

ওরা একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে লাগল। একটু দূরে আর-একটা বরফের ঢিবি নজরে পড়ল। সোজা গেলে, দূরত্ব ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের বেশী হবে না। মদন আর বিশ্বদেব লজেন্স চুষতে চুষতে দেখল আঙ শেরিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরের ঢিবিটার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবছে। মাঝে মাঝে টাসীর সঙ্গে কী সব পরামর্শ করছে।

মদন জিজ্ঞাসা করল, "কী দাজু, কী ব্যাপার?"

আঙ শেরিং বলল, "রাস্তা দেখ রহা হ্যায়।"

মদন বলল, "কেন, সামনে এগোতে বাধা কী?"

আঙ শেরিং বলল, "উধায় আচ্ছা নেহি, কারভিজ হ্যায়।"

আবার সে চারদিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে টাসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

বলল, "সাব্ তুমলোগ ইঁহা ঠাহ্‌র যাও। যব্ বোলেগা তব্ যায়েগা।"

তারপর আঙ শেরিং আর টাসী নেমে গেল। ওরা সোজা গেল না। এক পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল। আর আশ্চর্য, যেদিক দিয়ে ওরা নেমে গেল, সেদিকটা বেশ খারাপ। উপর থেকে দেখে মদন আর বিশ্বর সেই ধারণাই হল। এদিককার বরফও আলগা, খুব ভসভসে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আঙ শেরিং ইশারায় ওদের ডাক দিল। ওরা দুজনে আঙ শেরিংয়ের পথ ধরেই এগিয়ে চলল। আঙ শেরিং আর মদনের কাছে পথ-নিশানী লাল পতাকা ছিল। সে জায়গায় জায়গায় পতাকা পুঁতে পুঁতে এগিয়ে চলল। ধবধবে বরফের উপর লাল টকটকে পতাকাগুলো উড়ছে। সুন্দর দেখাচ্ছে।

সেই ভসভসে বরফের উপর দিয়ে ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে, একটু গিয়েই বিশ্রাম নিতে নিতে ক্রমাগত এগোতে লাগল। চড়াই আর উৎরাই, চড়াই আর উৎরাই। একবার কষ্ট করে ওঠো, নামো, আবার ওঠো। এই একমাত্র কাজ। পরিষ্কার আকাশ থেকে সূর্যের আলো মহাতেজে বরফের উপর এসে সোজা আছড়ে পড়ছে। কী তীক্ষ্ণ প্রতিফলন! আয়নার গায়ে ঠিকরে পড়া আলোর মত তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ভাগ্যিস, চোখে কালো কালো চশমার ঠুলি ছিল, তাই রক্ষে, নইলে চোখ কানা হয়ে যেত। মুখের, গালের অনাবৃত অংশগুলোতে জ্বলুনি ধরছে। প্রচণ্ড ঘাম হচ্ছে। প্রবল পিপাসা। ওরা একে একে সোয়েটার খুলে ফেলল। বার বার চা খেতে লাগল।

বেলা সাড়ে বারো। বিশ্বদেব ঘড়ি দেখল। চশমায় বেশ অসুবিধে হচ্ছে। জিনিসগুলো ভাল নয়। নড়বড়ে বস্তাপচা মাল। বড়বাজারের পুরনো মাল বিক্রির দোকান থেকে কিনেছে। বিশ্বদেবের নাকে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। চশমার ব্রিজটা চেপে বসেছে। রোদের তাতে, ঘামে বেশ জ্বলছে নাকটা। চশমা আর নাকে রাখতে পারছে না বিশ্বদেব। শেষ পর্যন্ত সে খুলেই ফেলল। আঙ শেরিং বুঝল। সে টয়লেট কাগজ বের করে তাই দিয়ে বিশ্বদেবের নাকে একটা প্যাড করে দিল। এতক্ষণে সে একটু আরাম পেল।

আবার ওরা চলতে শুরু করল। আজকের রাস্তা এত খারাপ, বরফ এমনই নরম যে, যে-সব ধাপ ওরা কাটছে তা একজন দুজনের বেশী আর কারও ভর সইতে পারছে না। ভেঙে যাচ্ছে। কাজেই আবার নতুন করে ধাপ কাটতে হচ্ছে। দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ওরা সকলেই প্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

বেলা দুটো বাজতে বিশ মিনিট বাকী। টাসী বলল, সাব্, আর এগোবে নাকি? এখনও অনেকটা রাস্তা বাকী।

এখনও বাকী আছে রাস্তার! অনেকটা বাকী! বিশ্বদেব করুণ চোখে দিগন্তে চাইল। আজ টাসী, অসুরের বল যার গায়ে সেও জানতে চাইছে আর এগোনো হবে কি না! এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আজকের পথ যে কত দুর্গম, তা টাসীর কথাতেই ওরা বুঝতে পারল।

বিশ্বদেব বলল, "এক কাজ কর, চল সামনের ওই উঁচু ঢিবিটা পর্যন্ত আজ যাই। দুটো পর্যন্ত চলি। তারপর ফিরব।"

আঙ শেরিং রাজী হল। বলল, ঠিক আছে। তাই চল। পিঠের বোঝা আমরা ওখানেই ফেলে রেখে ফিরে যাব।

ঠিক দুটোর মধ্যেই ওরা চড়াইটার উপর উঠল। মাল নামিয়ে রাখল। তারপর বসে পড়ল। বিশ্রাম নিয়ে, লাঞ্চ খেয়ে ওরা যখন উঠব উঠব করছে, সেই সময় সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। রোদের তেজ কমে এল। হাওয়া বইতে লাগল। অমনি শীত করতে লাগল। ওরা তাড়াতাড়ি সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে দিল।

আঙ শেরিং বলে উঠল, "উইন্ড-প্রুফ পরো। উইন্ড-প্রুফ পরো।"

দেখতে দেখতে এত ঠাণ্ডা পড়ল যে, মদনের অনাবৃত হাতে টাস ধরে এল। নিজের রুকস্যাক খুলে উইন্ড-প্রুফ বের করতে পারল না। বিশ্বদেব সেটা বের করে দিল। আঙ শেরিং আর টাসী তাড়াতাড়ি করে মদনের দু হাতে দুটো দস্তানা পরিয়ে দিলে।

আঙ শেরিং বলল, "অনবরত হাত মুঠো করো আর খোলো। ঠিক হয়ে যাবে।"

মদনের হাত একটু পরে গরম হয়ে উঠল বটে, কিন্তু পা ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগল। কোমর পর্যন্ত বরফে ডুবে যাওয়ায় ওদের মোজা ভিজে গিয়েছে। জুতোর মধ্যে পর্যন্ত বরফ ঢুকেছে। 'সু-কভার' থাকলে এ অঘটন ঘটত না। 'গেটার' নেই, পট্টির কথাও মনে পড়ে নি। এখন তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

আঙ শেরিং বলল, "বরফে জোরে জোরে লাথি মারতে মারতে চলো। পা গরম হয়ে উঠবে।" মদনের পা ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ঠিক নিরিখে পা ফেলতে পারছে না। মালিশ করলে হত। কিন্তু সে তো তাঁবুতে না ফিরে আর হবে না। ওরা আর বিলম্ব না করে রওনা দিল অ্যাডভান্স বেসের দিকে।

আঙ শেরিং বলল, "জলদি চলো, জোরসে চলো। ঠিক হো যায়েগা।"

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেস ক্যাম্প, ১২ই অক্টোবর। নিমাই অ্যাডভান্স বেস থেকে যে খবর নিয়ে ফিরল তাতে আমরা সবাই আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। মদনরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ১নং শিবিরের জায়গা ঠিক করে আসতে পারে নি। ১৪০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছে ওরা। মদন আর বিশ্বর পোশাক মোজা সব ভিজে গেছে। বাড়তি কিছুই নেই। ওরা সেই পোশাক পরেই রাত কাটাচ্ছে। মদনের পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। ও শিবিরে ফিরেই তাড়াতাড়ি করে আগুনে পা সেঁকতে যাচ্ছিল। টাসীর নজরে পড়ায় বেঁচে গেছে। বরফে জমা পা আগুনে সেঁকতে নিষেধ করেছে সর্দার। অল্প গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে বলেছে।

আমরা সবাই চিন্তিত। ভিজে পোশাকে থাকতে হলে ওদের আজ বাঁচতে হবে না। পরামর্শ-সভায় ঠিক হল, আমার আর ধ্রুবর পোশাক উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের বরফে ওঠার বারোটা বেজে গেল! কম্বল ছিল কয়েকটা।

সেগুলো ছিঁড়ে দরকারমতো পট্টি বানাবার নির্দেশ দেওয়া হল। কাল খুব ভোরেই গোরা সিং আমাদের পোশাক আর নির্দেশ বয়ে নিয়ে অ্যাডভান্স বেসে পৌঁছবে। ওরা রওনা হবার আগেই যাতে এগুলো পায়, তার ব্যবস্থা এইভাবে করা হল। আমি ভাবছি, গোরা সিং যদি ওদের ধরতে না পারে, তা হলে?

॥ একচল্লিশ ॥

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে :

অ্যাডভান্স বেস, ১৩ই অক্টোবর। আজ সকাল সাড়ে-আটটাতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তার আগেই বেস থেকে লোক এসে গেল। ওরা বাড়তি পোশাক কিছু এনেছে। আমাদের কাছে এ এক রীতিমত বিস্ময়। ভাবিই নি, সত্যিই ভাবতে পারি নি, আমাদের কপালে আজ শুকনো পোশাক, শুকনো মোজা জুটবে। আমরা স্যাঁতসেতে পোশাক ছেড়ে শরীরটাকে শুকনো পোশাক দিয়ে মুড়তে মুড়তে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম তাদের, যারা নিজেদের বঞ্চিত করে আমাদের জন্য তাদের পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনেছি, পড়েওছি. পাহাড়ে এসে লোকে নাকি স্বার্থপর হয়ে যায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমাদের কিন্তু উল্টো অভিজ্ঞতাই হয়েছে। ধ্রুবর করা বার বার মনে পড়ছে। পাহাড় বলতে পাগল। এই অভিযানের জন্য সে কী না করেছে। ওর সাধ ছিল, অনেক উপরে ওঠার। আমি জানি, তার জীবনের প্রথম সুযোগ সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিল। এই যে মোজা জোড়া আমি আজ পরে রয়েছি. এ মোজা ধ্রুবর। এই উইন্ড-প্রুফও ধ্রুবর। গৌরদার পোশাক মোজা মদনের ব্যবহারে লাগল। শুধু তাই নয়, সুকুমারের নির্দেশে কম্বল ছিঁড়ে আমরা পট্টিও বানালাম। কাজেই কালকের চেয়ে আজ অনেক আটঘাট বাঁধা হল। মনে বেশ ফুর্তি এসে গেল।

আজ আমরা সাতজন। আমরা চারজন তো আছিই, আর আছে নরবু. গুণদিন আর দা তেম্বা। আজ তাড়াতাড়িতে ব্রেকফাস্ট তৈরী হয় নি। আমরা চায়ের মগে 'সাম্পা' (তিব্বতী ছাতু) ঢেলে হাপুস হুপুস তাই খেয়ে নিলাম। লাঞ্চের জন্য বিস্কুট আর চা নেওয়া হল।

আমরা চারজন নীচ থেকে কম মাল নিলাম, উপরে ফেলে আসা মালগুলো বইতে হবে। নরবু. গুণদিন আর দা তেম্বার ঘাড়ে পুরো বোঝা চাপানো হল। আঙ শেরিং আর টাসী প্রথমে রওনা দিল, তার পনের মিনিট পরে আমরা সবাই।

আমি আর মদন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দুজনের ঘাড়ে ছিল দড়ি আর পিটনের বোঝা। কাল যেখানে মাল ফেলে গিয়েছিলাম, সেখানে পৌঁছতে বারোটা বাজল। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে গিয়েছে। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক কিছুই আমাদের কাছে নেই। লাঞ্চও না। ওসব আজ টাসী আর দা তেম্বার কাছে।

আমরা পৌঁছে দেখি, ওরা কেউ নেই। এগিয়ে চলে গিয়েছে। বুকের তেষ্টা বুকে চেপে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুটা হাঁটতেই দেখলাম. দূরে ওরা সব তাঁবু খাটাতে লেগেছে। বেশ দূর। মিনিট পনের চলার পর দেখি পথটা সাংঘাতিক রকমের বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। দুটো

চড়াইয়ের মাঝখানে একটা যোজক (এরেট) খুব সরু। যোজকের দু ধারে পাহাড়ের ঢালু বহু দূর পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। ঐ যোজকের উপর দিয়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এই সূক্ষ্ম যোজকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর ধারাল তলোয়ারের উপর দিয়ে হাঁটা একই কথা। আমরা কেউই তারের উপর দিয়ে হাঁটা কেন অভ্যাস করি নি, এখন তার জন্য বড় আফসোস হতে লাগল।

বৃথা হা-হুতাশে লাভ নেই জেনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে সেই 'ক্ষুরস্য ধারা'র উপর পা চাপিয়ে দিলাম। আর সুদক্ষ সার্কাস খেলোয়াড়ের মত অত্যাশ্চর্য ব্যালান্সের খেলা দেখাতে দেখাতে পথটুকু নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম। সে পথের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুটের বেশী হবে না। কিন্তু মনে হল যেন পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ।

ধুঁকতে ধুঁকতে যখন ওদের কাছে পেঁছিলাম, তখন ওদের লাঞ্চ খাওয়া সারা। জল নিঃশেষ। চা এক ফোঁটাও নেই। ওরা ভেবেছে আমাদের চা জল বুঝি আমাদের সঙ্গেই আছে। এই নিদারুণ সংবাদ শোনার পর আমাদের চোখে 'সরিষা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং আমরা হা হতোস্মি উচ্চারণ করতঃ ভূতলে পতিত হইলাম।'

আঙ শেরিং আমাদের ব্যাপারটা বুঝল। সে খুব দুঃখ প্রকাশ করল। বারে বারে বলতে লাগল, সাব্, বরফ খাও। থোড়া বরফ খেয়ে নেও।

আমাদের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখের লালা ঘন জমাট বেঁধে গেছে। কথা বলতে পারছিনে। বলব, সে শক্তি নেই।

"সাব্, থোড়া থোড়া বরফ খা লেও।"

আঙ শেরিংয়ের পরামর্শে প্রচুর প্রলোভন। তবু আমরা ওর পরামর্শ গ্রহণ করছিনে। ট্রেনিংয়ের সময় জেনেছি বরফ খাওয়া নিষেধ। মৃত্যুতুল্য। না, বরফ খাব না।

"সাব্, খা লেও, থোড়া থোড়া বরফ খা লেও।"

অতি কষ্টে বললাম, "না সর্দার, বরফ খাব না।"

"কিঁউ বিশ্বাস সাব্?"

ঘড়ঘড় করে আমার গলা দিয়ে শুকনো আওয়াজ বেরুল, "মর যায়েগা।"

মরে যাবে? বরফ খেলে মরে যাবে! আঙ শেরিং হেসে উঠল। তবে আমি কি মরে গেছি? তবে আমি কি ভূত হয়ে গেছি?

"সাত রোজ, শুনো সাব্, সাত রোজ, সির্ফ্ বরফ খায়া থা। না খানা থা, না পিনা থা, খালি বরফ থা, এইসা বরফ।" আঙ শেরিং চারদিকের বরফ দেখিয়ে দিলে।

আঙ শেরিং সেইখানে বসে বসে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাল। ১৯৩৪ সালের নাঙ্গা পর্বত অভিযানের কাহিনী। মার্কেল সাহেবের নেতৃত্বে এক জার্মান দল এই অভিযানে এসেছিল। অ্যাসল্ট পার্টিতে যারা ছিল, সেই ১১ জন অভিযাত্রীর মধ্যে ৪ জন জার্মান আর ৬ জন শেরপা উপরেই মারা যায়। প্রাণ নিয়ে একজন মাত্র নীচে আসতে পেরেছিল। ফিরেছিল শুধু আঙ শেরিং। এই আঙ শেরিং।

আঙ শেরিং বলতে লাগল :

৬ই জুলাই সকালে সাহেবরা যখন অন্যান্য মালবাহকদের সঙ্গে পাহাড়ের

একটা খাঁজের (এখানেই আমরা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছি) নীচে থেকে যাত্রা করলেন তখন গেলে, দক্‌শী আর আমি ওদের পিছনে পড়ে রইলাম। আমরা খুবই পরিশ্রান্ত। বরফ থেকে ঠিকরে-আসা আলোর খোঁচায় আমাদের চোখে ধাঁধা লেগেছিল। দুটো মাত্র ঘুমনোর থলি আমাদের ছিল। খোলা জায়গায় থাকতে থাকতে ১১ তারিখে দক্‌শীর মৃত্যু হল। পরদিন সকালে গেলে আর আমি সপ্তম শিবিরের দিকে নেমে চললাম। যাবার পথে দেখতে পেলাম উইল্যান্ড সাহেব মরে পড়ে আছেন। তাঁর তাঁবু থেকে মাত্র ত্রিশ পা দূরে। সপ্তম শিবিরে মার্কেল সাহেব আর ওয়েল জেনবাক সাহেব ছিলেন। তাঁবুটা তুষারে ভর্তি হয়ে গেছে। বড় সাহেব আমাকে দেখে সেটা পরিষ্কার করতে বললেন। একটা ঘুমনোর থলি ছিল, গেলের আর আমার দুজনেরই ওই থলিতে ঘুমোবার কথা ছিল। কিন্তু থলিটা এমনভাবেই বরফ চাপা পড়েছিল যে, গেলে ছাড়া তার ভেতরে আর কারুরই জায়গা হল না। সাহেবরা রবারের ফেনা দিয়ে তৈরী ম্যাট্রেসের উপর ঘুমলেন। আমাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। পরদিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাই আমি নেমে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বড় সাহেব অপেক্ষা করতে বললেন। বললেন, চতুর্থ ও পঞ্চম শিবিরে যেসব লোক আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তারা হয়ত আমাদের জন্যে রসদ নিয়ে আসছে। ওয়েল জেনবাক সাহেব ১৩ই জুলাই রাত্রে মারা গেলেন। আমরা তাঁকে তাঁবুর মধ্যেই রেখে ষষ্ঠ শিবিরের দিকে ভোরবেলায় রওনা হলাম। মার্কেলকে দুখানা 'তুষার-গাঁইতি'র উপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে এগিয়ে চলতে হচ্ছিল। মুরস্‌ হেডের উপর আমরা উঠতে পারলাম না। নীচেতে বরফের একটা গুহা বানিয়ে নিলাম। বড়সাহেব আর গেলে একই রবার ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে একখানা কম্বলই দুজনে ভাগাভাগি করে গায়ে দিলেন। আমার শুধু একখানা কম্বলই সম্বল, শোবার আর কিছু ছিল না। ১৪ই আমি বেরিয়ে এসে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলাম। চতুর্থ শিবিরে কাউকেই আমরা দেখতে পেলাম না তাই আমি বড় সাহেবকে বললাম, আমাদের নীচে যাওয়াই ভাল। তিনি রাজী হলেন। কিন্তু তিনি আর গেলে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই তুষার-গুহা থেকে দু পাও যেতে পারলেন না।...

আঙ শেরিং চুপ করল। সে হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল। আমার মনটাও খারাপ হল। চেয়ে দেখি টাসী, দা তেম্বা আর গুণদিন আর নরবু তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেলেছে। মালগুলো যাতে না ভেজে তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

আঙ শেরিং বলল, "বড়া সাব আর গেলেকে সেখানে রেখে আমি নীচে যাত্রা করলাম। আমি বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে থাকি সাব, গেলে নীচে চলে যাক। বড়া সাব বললেন, তাই হোক। কিন্তু গেলে বলল, সে চলতে পারছে না। তখন বড়া সাব বললেন, তবে তুমিই নীচে যাও আঙ শেরিং। জলদি যাও, বহোৎ জলদি। কিন্তু আমিও চলতে পারছিলাম না। আমার পা অসাড় হয়ে গিয়েছে, আমি হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আমার হাত অসাড় হয়ে এল, হাঁটু ঠান্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেল। তবু আমি পরোয়া করলাম না। আমার শুধু এক চিন্তা, এক ধ্যান। আমাকে বাঁচতে হবে। নীচে যেতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে, বড়া সাবকে বাঁচাতে হবে। নীচে যেতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে, বড়া সাবকে বাঁচাতে হবে, গেলে, আমার বন্ধু গেলেকে

বাঁচাতে হবে। আমাকে নীচে যেতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে, নীচে যেতে হবে, খবর দিতে হবে উপরে বড়া সাব আছে, গেলে আছে, তারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের নামিয়ে আনতে হবে, আঙ শেরিং জলদি যাও, বহোৎ জলদি..."

আঙ শেরিং বলল, "আমি নামতে লাগলাম। আর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারলাম না। হাতে বল নেই, হাঁটুতে বল নেই। একটা উঁচু চড়াই-এ যখন উঠলাম, আমার হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা তখন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তখন তুষার-গাঁইতিটাকে দু হাতে শক্ত করে হালের মত চেপে ধরলাম। তারপর শরীরটাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ের ঢালুতে ছেড়ে দিলাম। বরফের ঘষা লেগে পাছার চামড়া ছিঁড়ে যেতে লাগল। পাথরের গুঁড়োয় শরীর থেঁতলে গেল। অবশেষে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চতুর্থ শিবিরে পেঁছে গেলাম। আমার এইটুকু মনে আছে, আমার চীৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসেছিল।

"ইয়ে ভি ইয়াদ থা, হাম বোলা থা জলদি উপর যাও, বড়া সাব জিন্দা হ্যায়, গেলে জিন্দা হ্যায়। আউর কুছ ইয়াদ হ্যায় নেহি। বাদ্‌সে হাম শুনা, কোই নেহি উপর গিয়া।"

আঙ শেরিং খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটে বিষণ্ণ এক হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বলল, "হাম বাচ গিয়া। তিন মাহিনা হাসপাতালমে থা। লেকিন উয়ো দোনোকো বাচানে নেহি সকা।"

হঠাৎ আঙ শেরিং আমার দিকে চাইল। মুহূর্তে ওর চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল। এই সেই আঙ শেরিং, যে আমাদের সঙ্গে এসেছে, এ যেন আর সেই একটু আগের আঙ শেরিং নয়।

"তো?" আঙ শেরিং-এর গলায় একটু ব্যঙ্গের সুর। বলল, "হাম তো আভি জিন্দা হ্যায়। সাত রোজ সির্‌ফ্‌ বরফ খাকে ভি জিন্দা হ্যায়। তুম ভি জিন্দা রহেগা সাব্‌, থোড়া বরফ খা লেও।"

অগত্যা আমরা বরফ খেয়েই তৃষ্ণা মিটালাম। তবু ক্ষিধে মিটল না। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। আঙ শেরিং উঠে দাঁড়াল। চারদিক চেয়ে একদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ, নন্দাঘুণ্টি। আমার রক্ত ছলাত করে উঠল। মুহূর্তে সেই প্রচণ্ড ক্ষিধেও ভুলে গেলাম। কী প্রবল উত্তেজনা! দেখলাম, মদনের মুখও চকচক করছে।

দেখলাম, পাহাড়টা ধীরে ধীরে উঠে গেছে। একেবারে সাদা ধপধপ করছে। চূড়াটাকে দেখে মনে হল, অনেকটা গম্বুজের আকৃতি। বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আজ আরো বিস্ময় বাকি ছিল। আঙ শেরিং চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হল সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মদনকে বললে, "মণ্ডল সাব্‌, এক হাজার রুপেয়া লাও। ইনাম। প্রাইজ দো। ঐ দেখ, ইটি কা ট্র্যাক।"

ইয়েতি! আবার ইয়েতির পায়ের ছাপ! ভাল দেখতে পারছিলাম না, তাই দিলীপের ভাঙ্গা দূরবীনে চোখ রাখলাম। দেখলাম বটে, বহু দূরে সাদা

বরফের উপর একটা সারি নেমে এসেছে। আর কিছু বোঝা গেল না। ইয়েতির পদচিহ্ন? ঐ কি সেই রহস্যময় তুষার-মানবের পায়ের ছাপ?

॥ বিয়াল্লিশ ॥

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে :

১৩ই অক্টোবর। আজ বেলা এগারটা নাগাদ রায়, দিলীপ, নিমাই, আমি, নরবু আর আঙ ফুতার অ্যাড্‌ভান্স বেস ক্যাম্প রওনা হলাম। বেস ক্যাম্পে থাকল ধ্রুব, ডাক্তার, গৌর আর আজীবা।

বেলা দুটো নাগাদ অ্যাড্‌ভান্স বেসে পেঁাছে গেলাম। অ্যাড্‌ভান্স বেস ১৩১০০ ফুট উঁচু। একটু জিরিয়ে, সকলে মিলে আরও তিনটে তাঁবু খাটাল। আমরা লাঞ্চ খেয়ে, তাঁবুর মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে, বের হলাম। বেলা চারটে নাগাদ বিশ্বাস, মদন, আঙ শেরিং প্রভৃতি—যারা ১নং শিবির স্থাপন করতে গিয়েছিল—ফিরে এল। নেতা রায়, নিমাই ওরা চা বিস্কুট নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করে আনল। বিশ্বাসরা এসে বলল, ১নং শিবির যেখানে হয়েছে তার ঠিক সামনেই নন্দাঘুণ্টি। ওরা প্রায় ১৫০০০ ফুট উপরে ১নং শিবির স্থাপন করেছে।

এখানে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী যা তৈরী হল তাতে জানা গেল, আগামীকাল (১৪ই) আঙ শেরিং, টাসী, বিশ্বাস ও মদনের বিশ্রাম। সত্যিই ওদের বিশ্রামের খুব প্রয়োজন ছিল। ওরা গত দু দিন অসাধারণ পরিশ্রম করে ১নং শিবির স্থাপন করেছে। রায়, দিলীপ আর দা তেম্বা ১নং শিবিরে যাবে। সেখানে থাকবে। পরদিন (১৫ই) ওরা যাবে ২নং শিবির স্থাপন করতে। নিমাই, বিশ্বদেব, আঙ শেরিং আর টাসী যাবে ১নং শিবিরে। আমি থাকব অ্যাড্‌ভান্স বেসে।

১৪ই অক্টোবর। ১নং শিবির থেকে রায় বিশ্বদেবকে চিঠি পাঠাল। ওদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেতে বলেছে। একথা শুনে আনন্দ হল। উপরে সাধারণ মালবাহকেরা উঠবে না। মাল বইবে শেরপারা। আমি জানি, আমি উপরে উঠতে চাইলে আমার আর আমার ক্যামেরা ইত্যাদি বইবার জন্য অন্তত দুজন শেরপা লাগবে। কিন্তু তার চাইতেও জরুরী অভিযানের মাল উপরে পাঠানো। তাই আমি জোর করে কিছু বলতেও পারছিলাম না। সুকুমারের চিঠি পেয়ে আমার চিন্তা দূর হল।

১৫ই অক্টোবর। সকাল দশটায় আমরা ১নং শিবিরের দিকে রওনা হলাম। মদন আর গুণদিন অ্যাড্‌ভান্স বেসে থাকল। আজ ডাক্তারেরও এখানে আসবার কথা। শেরপা টাসীকে আমার সঙ্গে দেওয়া হল। চারজন সাধারণ মালবাহককেও আমরা উপরে নিয়ে চলেছি। ওদেরকে আমাদের জঙ্গল-বুট, মোজা, চশমা ইত্যাদি দিয়েছি। টাসী আমার ক্যামেরার বোঝা নিয়েছে। দরকার মত আমাকেও সামলাবে। গোরা সিং আমাদের গাইড, আমার রুকস্যাক কিট্‌ব্যাগ প্রভৃতি বইছে। প্রায় একটার সময় আমরা ১নং শিবিরে পেঁাছলাম। রায়, দিলীপ, দা

তেম্বা তখনও ২নং শিবিরের জায়গা দেখে ফিরে আসে নি।

সামনেই একটা পাহাড়। বিশ্বাস নিমাইকে বলল, ঐ দ্যাখ নন্দাঘুণ্টি।

নন্দাঘুণ্টি? নিমাইয়ের মুখে সংশয়ের রেখা ফুটে উঠল। এটা নন্দাঘুণ্টি কে বলল? নিমাই তৎক্ষণাৎ মানচিত্র খুলে, কম্পাস বের করে হিসেব করতে বসল। কিছুক্ষণ বাদে বলল, এটা নন্দাঘুণ্টি নয়। ওটা বেথারতলি, হিমালয়েরই একটা অংশ। আরও দক্ষিণে যে ছোট্ট চূড়াটা দেখা যাচ্ছে, তারও দক্ষিণে হবে নন্দাঘুণ্টি। এখান থেকে সেটা নজর পড়বে না।

এমন সময় দূরে, বেশ খানিকটা দূরে, রায়, দিলীপ আর দা তেম্বাকে দেখা গেল। ওরা নন্দাঘুণ্টি মনে করে বেথারতলির দিকেই এগোচ্ছে। নিমাইয়ের নির্দেশে আঙ শেরিং চেঁচিয়ে, নানা রকম ইশারা করে, ওদের ফিরতে বলল। প্রায় তিনটের সময় ওরা ফিরে এল। নিমাই মানচিত্র দেখিয়ে ভুলটা ধরে দিল। ঠিক হল, কাল (১৬ই) নিমাই, রায়, আঙ শেরিং আর টাসী যাবে ২নং শিবিরের জায়গা দেখতে।

বেলা তিনটের সময় সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে তলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যেন চিতাবাঘের মত আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ল। কী নিদারুণ শীত! আমরা সব গুটিসুটি মেরে রান্নার জায়গায় বসে আছি। ঘন ঘন চা খাচ্ছি। তবু যেন ভিতরটা অবধি জমে বরফ হয়ে যাবে! নানা আলোচনা হচ্ছে। ২নং শিবির স্থাপনের প্ল্যান ছকা হচ্ছে। এমন সময় জানা গেল, রসদ আনা হয় নি। রাত্রে খাবার কি হবে?

আমার জন্য দুজন লোক আটকে পড়াতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। আমি খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম লোকের যখন এত অভাব, তখন আমার পক্ষে আরো উপরে যাবার চেষ্টা ঠিক সমীচীন হবে না। সাত পাঁচ ভেবে, বিষণ্ন মনে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম। পাশের তাঁবুতে রায়, বিশ্বাস, নিমাই আর দিলীপের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু অসুবিধার কথা আমার কানেও এসে ঢুকছে। আমি রায়কে ডেকে বললাম, আমি আর উপরে যাব না, কাল অ্যাড্‌ভান্স বেসে নেমে যাব। রায় বলল, বীরেনদা, তা হবে না। আপনাকে আমরা উপরে নিয়ে যাব। বললাম, রায়, এটা ছেলেখেলা নয়, একটা জরুরী কর্তব্য তোমরা কাঁধে নিয়েছ, সেটা সফল করাই প্রথম কাজ। আমি যদি দুজন শেরপা আটকে ফেলি তবে আসল কাজেই বাধা সৃষ্টি হবে। রায় বলল, আপনি ওসব ভাববেন না, আমাদের নন্দাঘুণ্টিতে ওঠা যেমন প্রয়োজন, আপনাকে সঙ্গে নেওয়ার তেমনি দরকার। তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

লেখকের দিনলিপি থেকে :

১৫ই অক্টোবর। অ্যাড্‌ভান্স বেসে আমি ডাক্তারকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। রানার কেদার সিং আমাদের সঙ্গে ছিল। ও গতকাল ফিরেছে। উপর থেকে খবর আসছে না। আমি রিপোর্ট পাঠাতে পারছিনে। তাই অ্যাড্‌ভান্স বেসে এসেছি, যদি কিছু খবর নিয়ে যেতে পারি। মদন অ্যাড্‌ভান্স বেসে আছে। অন্য নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ওকে অ্যাড্‌ভান্স বেস থেকে পুরি অথবা চাপাটি আর মাংস রেঁধে ১নং শিবিরে পাঠাতে হবে। মদনই জানাল,

আজকের পার্টি রসদ ফেলে গিয়েছে। উপরে ওরা কি খাবে কে জানে? মদনই জানাল, ওরা ১নং শিবির থেকে নন্দাঘুণ্টি দেখতে পেয়েছে। শুনে আনন্দ হল। ভাবলাম, এই খবরটাই পাঠিয়ে দেব।

ওসব শেরপার ফিরে আসার কথা তারা দেরি করছে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? এর পরে ফেরার পথে তুষারপাত হয় যদি? এখন প্রায়ই বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ জমছে। সকালে আকাশ পরিষ্কার।

না, আর দেরি করা যায় না। এবার উঠতেই হয়। কিচেনে বসে চা পান শেষ করলাম। তারপর সেখান থেকে যেই বেরিয়েছি অমনি "সাব্, মোটা সাব্, গুড্ মর্নিং"। চমকে চেয়ে দেখি আঙ ফুতার লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে। এক গাল হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। নরবুও এসে হ্যান্ড শেক করল। গোরা সিং, আক্কেল, পল্টু সিংও নেমে এল।

বললাম, চিঠিপত্র আছে কিছু? আঙ ফুতার খান কতক চিঠি বের করে দিল। আমি কালবিলম্ব না করে বেস ক্যাম্পে রওনা দিলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন বেস ক্যাম্পে এসে পোঁছলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

ধ্রুব ছটফট করছিল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, "কোন খবর?"

বললাম, "মদন বললে, ওরা নন্দাঘুণ্টির শিখর দেখতে পেয়েছে।"

ধ্রুব তো আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে।

"হুর্রে" বলে বিজাতীয় আওয়াজ ছাড়ল।

বললাম, "উপর থেকে গোটাকতক চিঠি এসেছে। পড়ার সময় পাই নি—"

ধ্রুব বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু তার আগে আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। চা খান। একটুখানি রম খাবেন?

একটু সুস্থ হয়ে, কফি খেতে খেতে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করলাম।

প্রথমেই বিশ্বদেবের চিঠি :

১নং শিবির (১৫০০০ ফুট), ১৫-১০-৬০।

গৌরদা,

বীরেনদা আর নিমাইদার সঙ্গে ১নং শিবিরে পোঁচেছি। পোঁছেই রায় ও দিলীপের চিঠি পেলাম। এই সঙ্গেই পাঠালাম। প্রথম দিন আমরা যে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, আজ সকালে দা তেম্বা, রায় আর দিলীপ তার কাছে যায়। কাছ থেকে দেখে ওরা নিঃসন্দেহ হয়, এগুলো ইয়েতিরই পদচিহ্ন। দিলীপ ছবি তোলে। সেই রোলও পাঠালাম।

নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখা যাচ্ছে বলে যদি কোন খবর পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তা ছাপতে নিষেধ করে দিন। নিমাইদা বললে, ওটা নন্দাঘুণ্টি নয়। সবাই ভাল।

বিশ্বদেব।

সুকুমারের চিঠি :

১নং শিবির, ১৫ই অক্টোবর, ৬০।

প্রিয় ধ্রুব,

নিচু থেকে মাংস, আটা, কাঠ, দেশলাই আর আলু প্রচুর পরিমাণে উপরে পাঠাও। বেস ক্যাম্পে মাংসের প্রয়োজন হলে আরো দু একটা ভেড়া কেনারও ব্যবস্থা করবে।

সুকুমার রায়।

দিলীপ তার চিঠিতে কোন ফিল্‌ম্‌ রোলে ইয়েতির পায়ের ছাপ আছে, তাই জানিয়ে দিয়েছে।

চিঠিগুলো পড়ে বেশ ঘাবড়েই গেলাম। সত্যি বলতে কি, প্রথমটায় আমার মাথার মধ্যে কিছুই ঢুকল না। ওরা যে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছে, নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখেছে, সে কথা আমরা জানতাম না। আজই মদনের মুখে প্রথম শুনলাম যে, ওরা নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখেছে। ভাগ্যিস খবরটা আজই পেলাম। না হলে সেই ভুল খবরটাই পাঠিয়ে দিতে হত। ইয়েতি সম্পর্কেও বিস্তারিত কেউ কিছুই লেখেনি। বড় বিরক্ত বোধ করলাম। ধ্রুবর মনটাও খানিকটা খারাপ হয়ে গেল।

১৬ই অক্টোবর। আজ তবু খানিকটা খবর পাওয়া গেল। ১নং শিবিরের কাছে রণ্টির গিরিশিরাটি নেমে এসেছে। শিবিরটা একটু উঁচু জায়গায়। রণ্টিরই গা ঘেঁষে। হিমবাহটা বাঁ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে বেশ খানিকটা প্রায়-সমতল সৃষ্টি করেছে। তারপর বেথারতলির গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইখানেই ইয়েতির পায়ের ছাপগুলো দেখা গেছে। বেথারতলির উঁচু সাদা তুষার-শরীর মাড়িয়ে এই রহস্যময় পায়ের ছাপ সেই সমতলে নেমে এসেছে। সেখান থেকে এগিয়ে এসেছে ১নং শিবিরের দিকে। ৫০০ গজ দূরে এসেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর হঠাৎ অন্য দিকে মোড় নিয়ে হিমবাহের উৎরাই অনুসরণ করে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চলে গেছে দক্ষিণে।

পায়ের ছাপগুলো একই সারিতে চলেছে। সন্দেহ নেই, এইসব পায়ের ছাপ যেসব ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার তাঁরা দুই পায়েই হাঁটেন। জুতো পায়ে দেন না। পায়ের ছাপ কিঞ্চিৎ গোলাকৃতি। লম্বায় ৮ ইঞ্চি। গভীরতা ১ ইঞ্চি। গোড়ালির কাছটা গভীরতর। একটা পায়ের থেকে অন্য পায়ের দূরত্ব প্রায় ৩০ ইঞ্চি। প্রায় একটা প্রমাণ সাইজ মানুষের মতই।

কালবিলম্ব না করে আমি খবর আর ছবি কলকাতায় পাঠালাম।

॥ তেতাল্লিশ ॥

একে ঠাণ্ডা তায় স্টোভটা যথেষ্ট বেগ দিচ্ছে। চা করতে বিলক্ষণ দেরি হল। টাসী সকালে উঠেই বরফ কুড়িয়ে এনে স্টোভে চাপিয়ে দিয়েছে। বরফ গলিয়ে জল তৈরী করে নিতে হবে। তারপর চা হবে সেই জলে। স্টোভে কিছু গোলমাল হয়েছে। ভাল আঁচ হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত অনেক কসরত করার পর চা তৈরী হল। ততক্ষণে ১নং শিবিরে রোদ এসে গিয়েছে। ওরা কেউ এক মুহূর্তও আর দেরি করল না। বেরিয়ে পড়ল ব্রেকফাস্ট সেরে। বেলা তখন নটা।

২নং শিবির কোথায় করা যাবে, সেইটে দেখতেই ওরা বের হল। আগের রাতে ঠিক হয়েছিল নিমাই, টাসী আর আঙ শেরিং যাবে ক্যাম্প-সাইট দেখতে। সুকুমার বীরেন সিংহকে নিয়ে যাবেন ইয়েতির পদচিহ্ন দেখাতে। কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল, প্ল্যানটা বদল হয়েছে। সুকুমারও ক্যাম্প-সাইট দেখতে চলল। বীরেন সিংহ নিজের রোলিকর্ড ক্যামেরাটা নিমাইয়ের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, কি করে ফটো তুলতে হয়, সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় শিবিরের পথে। বরফের চোরা ফাটলে পড়ে গিয়েছে মদন

ফটো : দিলীপ ব্যানার্জী

জল তৈরি কবার জন্য বরফ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

ফটো : বীরেন সিংহ

শনশন করে হাওয়া বইছে। কনকনে হিমেল হাওয়া। গালের চামড়া যেন খুবলে নিয়ে যাবে। নিমাই একবার ক্রীম মাখতে চেষ্টা করেছিল। ক্রীমের কৌটো খুলে দেখে, ক্রীমে সেটা শক্ত ইঁট হয়ে গিয়েছে।

নিমাইয়ের ধারণা, যতক্ষণ না তারা রণ্টি পাহাড়ের গিরিশিরাটি সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে পারছে, ততক্ষণ তারা নন্দাঘুণ্টি পর্বতের শিখরটি দেখতে পাবে না। মানচিত্রে নন্দাঘুণ্টি পর্বতের অবস্থান যেখানে উল্লেখ করা আছে, সেটা দেখে নিমাই এই সিদ্ধান্তে না এসে পারল না। রণ্টি গিরিশিরার গা এখানে খুব খাড়া। বরফ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকায় অনেক উঁচু উঁচু ঢিবির সৃষ্টি হয়েছে। এই ঢিবিগুলো ঘুরে ঘুরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, নিমাই সে কথা বুঝতে পারল। শুধু বুঝতে পারছিল না, কতটা পথ তাদের এইভাবে ঘুরতে হবে। দূর থেকে দেখে সে আন্দাজ করল ঐ গিরিশিরাটাই বোধ হয় শেষ। তারপর ওদের বোধহয় ডান দিকে মোড় নিতে হবে। নিমাই নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারল না। এটা তার আন্দাজ মাত্র। আর কে না জানে, পাহাড়ের পথে আন্দাজের কোন মানে নেই। এখান থেকে যে গিরিশিরাটাকে শেষ বলে মনে হচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখা যাবে, তার পিছনে আরো এক বা একাধিক গিরিশিরা ওদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাই বেশ খোশমেজাজে এগিয়ে চলেছে। সকাল বেলাকার খাওয়াটা মন্দ হয় নি। রোস্ট, রুটি আর জ্যাম। আর কফি। সঙ্গে আছে বিস্কুট আর চা। ওর হাসি পাচ্ছিল ক্যামেরাগুলো দেখে। বীরেনদার ক্যামেরা ছাড়াও দিলীপ আর বিশ্বর ক্যামেরাও ওর গলায় ঝুলছে। অথচ ও ফটো তুলতে জানে না। তবু ওরা যখন একের পর এক ক্যামেরা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিলে, তখন নিমাই আপত্তি করল না। মেক-আপটা যে ভাল হল, নিমাই এতেই খুশী। ক্যামেরা ছাড়া ওর কাছে আর ছিল দূরবীন। আর কম্পাস আর ম্যাপ।

১নং শিবিরের বাঁ দিকে, যে ছোট হিমবাহটি মূল রণ্টি হিমবাহের সঙ্গে এসে মিশেছে, ওরা সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে এগোতে থাকল। নিমাইয়ের দৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়ছিল বেথারতলির উপর। সেখানে একের পর এক তুষারধস নামছে। নিমাইয়ের দৃষ্টির সামনেই পাহাড়ের তুষারপ্রাচীর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কী ভয়াবহ দৃশ্য! কী প্রচণ্ড শব্দ। নিমাই সব কটা ক্যামেরার শাটার এলোপাথাড়ি টিপে গেল। আর এতক্ষণে নিজেকে তার ফটোগ্রাফার ফটো-গ্রাফার মনে হতে লাগল।

একটু এগিয়ে যাওয়ার পর ওদের নজরে সেই ইয়েতির পায়ের ছাপের সারি ভেসে উঠল। নিমাই আবার ফটাফট শাটার টিপল।

তারপর আরো কিছুটা এগিয়ে ওরা এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। এ জায়গাটা কিছুটা সমতল। ডান পাশে বেশ উঁচু একটা বরফের ঢিবি। বাঁ পাশে হিমবাহের ক্রমশ নীচু ঢালুটা। সেটা ক্রমাগত নেমে গিয়ে বেথারতলির গায়ে মিশে গেছে। সামনে বেথারতলি আব নন্দাঘুণ্টি পর্বতমালা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ফাঁক দিয়ে রণ্টি হিমবাহ এঁকেবেঁকে পথ করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে। বীরেনদা বলেছিল, নিমাইয়ের মনে পড়ল, বিশ্বনাথের গলি। বীরেনদার বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

নিমাই সেখানে বসে পড়ে ম্যাপটা বিছিয়ে নিল। কম্পাস বের করে রিডিং নিল। দেখল, ওদের আর দক্ষিণে যাবার দরকার নেই। এবাবে পশ্চিম দিকে মোড় নিতে হবে। এখানে এসেও নন্দাঘুণ্টির চূড়াটা দেখতে পাওয়া গেল না। আশ্চর্য!

নন্দাঘুণ্টির চূড়াটা যেন ওদের সঙ্গে সোনার হরিণের ছলনা শুরু করেছে। নন্দাঘুণ্টি পাহাড়টা এবার নিজেই আড়াল রচনা করে ঢেকে রেখেছে তার চূড়াটাকে।

রণ্টি গিরিশিরাও ক্রমশ শেষ হয়ে এল। ওটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে এবং বরফের ছোট-বড় ঢিবির অরণ্যে নিজেকে যেন নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছে। এবার নন্দাঘুণ্টির গিরিশিরা ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওটা এখনও বেশ দূর। তবু নিমাই বেশ স্পষ্টই দেখতে পেল, একেবারে খাড়া উঠে গেছে গিরিশিরাটা। ঘন ছাই রঙের শরীর। দেহে অজস্র ভাঁজ। প্রথম দিকটা এত খাড়া যে, গায়ে বরফ পর্যন্ত জমতে পায় নি। পাথর নগ্নভাবে বেরিয়ে আছে। সেইসব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বরফ জমে আছে। পিছনের অংশটা এমন ভয়ঙ্কর খাড়া নয় বলেই নিমাইয়ের ধারণা হল। ওদিকটা একেবারে সাদা। বরফে ঢাকা।

ওরা এবার ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে লাগল। একটার পর একটা বরফের ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওরা চলেছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা বাজল। ১নং শিবির থেকে মাইল দেড়েক আসতে পেরেছে। সূর্য খানিকটা হেলে গিয়েছে। তবু রোদ বড় কড়া। বাতাস আছে, তাই ঘাম হচ্ছে না। চড়াইয়ে উঠতে বেশ দম বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার একটানা চড়াই শুরু হল। শুধুই চড়াই। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ওরা অবিরাম উঠে গেল। ওরা এবার এমন একটা কোণে এসে পড়ল, যেখান থেকে নন্দাঘুণ্টির অনেকখানি অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এখন প্রতি মুহূর্তে ওরা ভাবছে, এই বুঝি নন্দাঘুণ্টির শিখরটা ভেসে উঠবে ওদের চোখে। কিন্তু হায়, কোথায় সেই চূড়া। এখনও তার টিকিরও দেখা নেই। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে ওদের। তৃষ্ণায় বুক ফাট-ফাট। পরিশ্রান্ত দেহ আর চলে না। শরীর বিশ্রাম চাইছে।

কিন্তু নিমাইয়ের কেমন রোখ চেপে গেল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া সে আজ দেখে তবে ফিরবে। নিমাই আবার কম্পাস দেখল। ওরা ঠিক দিকেই এগুচ্ছে। তবে এবারে আরো উঁচুতে উঠতে হবে, না হলে চূড়াটা নজরে আসবে না।

এদিকের বরফ বেশ শক্ত। পায়ের গোড়ালির বেশী ডুবছে না। শেষ চড়াইটাও ওরা উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, তবু চূড়াটা নজরে পড়ল না। ব্যাপার কি? নিমাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সুকুমার, আঙ শেরিং আর টাসী বসে পড়ল। আঙ শেরিং হাঁটুতে একটু চোট খেয়েছে। ওরা বিশ্রাম নিতে লাগল। নিমাই তখনও বসল না। ওর মনে দারুন উত্তেজনা। আজ এস্পার কি ওস্পার।

নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভেবে নিল। ও বুঝল, ওর সামনে এখন দুটো পথ। হয় পশ্চিম দিকে ওকে আরো খানিকটা উঠতে হবে, নয়তো দিক-পরিবর্তন করে উত্তর দিকে এগোতে হবে। নিমাই উত্তরেই মোড় নিল। কিছুটা যেতেই একটা বড় ঢিবি। নিমাইয়ের মন বলল, ঐ ঢিবি, ঐ ঢিবিতে উঠলেই কার্যসিদ্ধি। নিমাই শেষ শক্তি একত্র করে তারই জোরে চড়াইটাতে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে টলতে টলতে এক সময় চড়াইটার মাথায় সে উঠে পড়ল। সে পশ্চিম দিকে চাইল।

ঐ যে! নিমাইয়ের বুকের রক্ত লাফ দিয়ে উঠল। ঐ যে নন্দাঘুণ্টির শিখর! বিস্ময়ে আনন্দে নিমাই বুঝি ফেটে পড়বে। ঠিক পশ্চিমে নন্দাঘুণ্টির কল্ প্রসারিত। কলের বাঁ দিকে (দক্ষিণে) দুটো বড় বড় কুঁজ। সেই কুঁজের আড়াল থেকে চূড়াটা উঁকি মারছে। নিমাই স্তব্ধ বিস্ময়ে দু চোখ ভরে দেখতে লাগল। ওর মনে হল, নন্দাঘুণ্টির চূড়ার মাথায় একটা ছোট্ট চাতাল আছে বোধ হয়। সাদা সাদা বরফের ধোঁয়া তার পিছন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। সূর্যটা ঠিক যেন সেই চাতালটার উপরে গিয়ে বসেছে।

নিমাই উত্তেজনার ধাক্কায় অধীর হয়ে সেই মুহূর্তে ক্ষিধে-তেষ্টা ভুলে গেল। এতক্ষণ পরে তার দেহে যেন বল এসেছে। আগের মুহূর্তের ক্লান্তি নিঃশেষে দূর হয়ে গিয়েছে।

নিমাই আনন্দে চেঁচাতে লাগল, "পিক্, পিক্! সুকুমার, সুকুমার, নন্দাঘুণ্টি, নন্দাঘুণ্টির পিক্! ঐ যে নন্দাঘুণ্টির চূড়া! এসো, এসো, দেখো এসে।"

নিমাই আর দাঁড়াতে পারল না। উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরই অবসাদ এসে গ্রাস করল তাকে। সেই বরফের উপরই নিমাই ধপ করে বসে পড়ল।

সুকুমার, আঙ শেরিং আর টাসী, একটু দূরে, আরেকটা ঢিবির মাথায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল, বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় নিমাইয়ের চিৎকার ওদের কানে গেল।

"পিক্, পিক্...সুকুমার, সুকুমার...নন্দাঘুণ্টি...নন্দাঘুণ্টি পিক্..."

নন্দাঘুণ্টির চূড়া! ওরা চমকে উঠল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া? সত্যি? সত্যিই তার দর্শন মিলল তবে! ওরা লাফিয়ে উঠল। দ্রুত চড়াই বেয়ে আসতে লাগল নিমাইয়ের কাছে। প্রথমে পেঁছিাল টাসী, তারপর সুকুমার, তারপর আঙ শেরিং। দেখল ওরা। নিমাই ছবি তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু সূর্য বাদী, 'এগেনস্ট লাইট', তাই ছবি তুলতে পারল না।

নিমাই ম্যাপ বিছিয়ে বসে পড়ল। কম্পাসের রিডিং নিয়ে হিসেব কষল। না, কোন ভুল নেই। ঐ চূড়াই নন্দাঘুণ্টির চূড়া। সে সুকুমারকে বুঝিয়ে বলল।

বেলা পড়ে আসছে। আর নয়, এবার ফিরতে হয়। ওরা ১নং শিবিরের দিকে রওনা হল। যে পথে এসেছিল, ওরা ঠিক সে পথে ফিরল না। আসবার সময় যেসব বরফের ঢিবি ওরা এড়িয়ে এসেছিল, ফেরার পথে সেইসব ঢিবি মাড়িয়েই ওরা যেতে লাগল। ওরা যেতে লাগল উত্তর-পূর্বে। একটা করে ঢিবি ওরা পার হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সামনে আরেকটা ঢিবি হাজির হচ্ছে। এর যেন আর শেষ নেই। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, উত্তাল এক তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র এখানে হঠাৎ যেন ঠান্ডায় জমে গিয়েছে। ঢেউগুলো জমে বরফের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে ক্রমাগত উঠতে-নামতে, উঠতে-নামতে প্রায় চারটে নাগাদ ওরা একটা বড় চড়াইয়ের মাথায় গিয়ে উঠল। খানিক দূরে, অনেক নীচে ১নং শিবিরটা দেখা গেল। শিবিরে এরই মধ্যে ছায়া পড়ে গিয়েছে। তাঁবুগুলো কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। মানুষগুলো বিন্দুবৎ। সাদা বরফের পটভূমিতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা তাঁবু— যেন একটি সবুজ পান্না। ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে। এ পথের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বরফের আস্তরণ ছিঁড়ে গেছে। সেই জায়গাটুকুতে কে যেন শ্যাওলার গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ক'দিন ধরে চোখ শুধুই সাদা দেখছিল। একঘেয়ে দৃশ্যে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এখন এই হলদে-সবুজ মেশানো রঙের বাহারী শ্যাওলার গালিচাটায় নজর পড়ামাত্র চোখের ক্লান্তি দূর হল। নিমাইয়ের মনে হল, মানুষ কত অল্পে তুষ্ট হতে পারে!

বরফের প্রকৃতিও বদলাতে শুরু করেছে। যাবার সময় ওরা যে পথে গিয়েছিল, সে পথের বেশির ভাগ জায়গাতেই নীচে শক্ত বরফ ছিল। উপরে সামান্য পরিমাণ বরফের গুঁড়ো ছিটানো ছিল। পায়ের পাতার বেশী ডোবেনি। বড় জোর গোড়ালিটা ডুবেছে। এখন ওরা আবার নরম ভসভসে বরফের মধ্যে এসে পড়ল। কখনও কখনও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। ওরা অতি সাবধানে চলতে লাগল। একদম ছায়া পড়ে এসেছে। শীত করছে বেজায়। ওরা উইন্ড-প্রুফ গায়ে চাপাল। গগল্স্ চোখে রাখলে পথ দেখা যায় না। নিমাই গগল্স্টা কপালে তুলে দিল।

এবারে খাড়া উৎরাই। টাসী আর হে'টে হে'টে নামল না। তুষার-গাঁইতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে স্লিপ খেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল। দেখাদেখি নিমাইও। সামনে ছোট্ট চড়াই। সেটা পার হয়েই ১নং শিবির। ওরা যখন পেণছাল, তখন বেলা পাঁচটা।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

১৭ই অক্টোবর সকালে ১নং শিবির থেকে ওরা আবার যাত্রা করল। কাল ওরা ২নং শিবির যেখানে করবে, সেখানে পেণছাতে পারে নি। তারই কাছাকাছি এক জায়গায় মাল রেখে চলে এসেছিল। আজ ওরা আরো মাল নিয়ে চলেছে। ২নং শিবিরও স্থাপন করে আসবে।

আজ সুকুমার আর নিমাই ১নং শিবিরে বিশ্রাম নিল। ওদের বদলে চলল বিশ্ব আর দিলীপ। দিলীপ আর বিশ্ব রসদের বোঝা পিঠে তুলে নিল। এই রসদ ৩নং আর ৪নং শিবিরের জন্য মার্কা করা ছিল। শেরপারা—আঙ শেরিং, টাসী, গুণদিন আর দা তেম্বা—নিল তাঁবু, পিটন, দড়ি ইত্যাদি।

কাল সুকুমাররা যে পথে ১নং শিবিরে ফিরে এসেছিল, আজ বিশ্বরা সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল। এ পথ কষ্টসাধ্য, কিন্তু দূরত্ব কিছু কম। শিবির থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই ছোট একটা হিমানী-যোজক আর তার পরেই উঠে গেছে প্রায় ৮০০ ফুট একটা কঠিন চড়াই। আজ মালের ওজন বেশ ভালই আছে। প্রায় ৫০ পাউণ্ডের বোঝা এক-একজনের পিঠে চেপেছে। শেরপারা যে পরিমাণ বোঝা বইছে, দিলীপ আর বিশ্বর কাঁধেও তাই। দিলীপ, বিশ্ব আর মদন বোঝা বইতে পারে খুব।

তবে আজ বোঝার ভার ওদের বেশ কাহিল করে তুলেছে। ১৫০ ফুট উঠতেই ওরা এত হাঁফিয়ে উঠল যে, বিশ্রাম নিতে বাধ্য হল। গরম লাগছে। ঘাম হচ্ছে। ওরা সোয়েটার খুলে ফেলল। লেমন-পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটালো। এতদিন লেমন-বার্লি খেয়েছে। সে-জিনিস ফুরিয়ে গেছে। এখন ওরা জলের সঙ্গে লেমন পাউডার গুলে তাই পান করল।

ওরা কিছুটা পথ উঠছে, হাঁফিয়ে পড়ছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, লেমন-পানি খেয়ে ক্লান্তি দূর করছে, আবার উঠছে। এমনিভাবে ওরা এগুতে থাকল। উপরে উঠতে আর ফুট পঞ্চাশেক বাকী। এমন সময় ওরা দেখতে পেল প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে বেথারতলি পাহাড় থেকে তুষারের ধস ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। আবার একটা। ওরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। গতকাল ঐদিকের রাস্তা ধরেই সুকুমাররা এগিয়ে গিয়েছিল। কী সাংঘাতিক দৃশ্য! দিলীপ ক্যামেরার শাটার টিপতে টিপতে মনে মনে বলল : কী মারাত্মক পাহাড় রে বাবা! ওর বুক তখনও ধক ধক করছে।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে ওরা। রণ্টি পাহাড় থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসে এখানে রণ্টি হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে। রণ্টি পাহাড় থেকে যে হিমবাহটা নেমেছে, তার কোন নাম ম্যাপে নেই। ত্রিশূল পাহাড় থেকে যে সুদীর্ঘ হিমবাহটা এদিকে নেমেছে, মানচিত্রে তারই নাম রণ্টি হিমবাহ। রণ্টি হিমবাহ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। এরই সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত নন্দাঘুণ্টি হিমবাহ এসে যুক্ত হয়েছে। আর

দিলীপদের সামনে এখন যে হিমবাহটা দেখা যাচ্ছে, রণ্টি পাহাড়ের কাছ থেকে সেটাও পূর্ব-পশ্চিমে নেমে এসেছে। এই অনামী হিমবাহটা নন্দাঘুণ্টি হিমবাহেরই সমান্তরাল। এই দুটো হিমবাহের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাঘুণ্টি পাহাড়। দিলীপ ছবি তুলল। আঙ শেরিংকে জিজ্ঞাসা করল চূড়াটা কখন দেখা যাবে। আঙ শেরিং জানাল, আরো একটুখানি উঠতে হবে। ওরা এবার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করল।

একটা চড়াই ওদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তার মাথায় উঠতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনেই নন্দাঘুণ্টির সুতীক্ষ্ম গিরিশিরা। তার গা এত খাড়া যে, বরফ পর্যন্ত জমতে পারে নি। কালো পাথুরে পাহাড়। নিমাই যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এই গিরিশিরাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে নন্দাঘুণ্টির চূড়া। এখান থেকে মনে হচ্ছে বরফের উপর কে বুঝি একটা ছোট্ট ঢিবি বসিয়ে রেখেছে। দিলীপ ছবি তুলল।

সে দেখতে পেল ঢিবিটার পিছন থেকে সাদা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লেগেছে।

আঙ শেরিং বলল, "সাব্, দেখো দেখো, ধূপ জ্বালা দিয়া।"

গিরিশিরাটার আড়ালে থাকায় নন্দাঘুণ্টির চূড়ার দক্ষিণে কি আছে, দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিকটা পরিষ্কার। ঢালু গায়ের উপর দু-দুটো কুঁজ বেরিয়ে আছে। দুটোর ব্যবধান এখান থেকে দিলীপের আন্দাজে, প্রায় ১০০০ ফুট হবে। এখান থেকে নন্দাঘুণ্টির উত্তর 'কল'টাও দেখা যাচ্ছে। দিলীপের মনে হল, চূড়ায় ওঠার পথ পাওয়া অসম্ভব হবে না। মনে হল, প্রথম কুঁজটাই যা কিছু কষ্টের কারণ হবে। দিলীপ আর বিশ্ব এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করল।

তারপর ওরা রণ্টি গিরিশিরার গা ঘেঁষে, সেই অনামী হিমবাহ ধরে, নন্দাঘুণ্টি 'কল'-এর দিকে এগুতে লাগল। ফটো তোলার জন্য ওরা দেরি করছিল। তাই আঙ শেরিংরা এগিয়ে গেল। দিলীপ আর বিশ্ব ওদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। দিলীপের শরীরটা ভাল নেই। তেমন জুত পাচ্ছে না। দুর্বল-দুর্বল লাগছে। হাঁফ ধরছে ঘন ঘন। শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এদিকের বরফ খুব নরম। হাঁটতে গেলে ভস্ ভস্ করে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে' পা টেনে তুলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে দিলীপের। একবার পা ভস্ করে বসে গেলে সে হুমড়ি খেয়েই পড়ে থাকছে কিছুক্ষণ। একবার তার পা ভস্ করে অনেকখানি বসে গেল। চোরা পাথরে চোট খেয়ে তার পায়ের পাতা মচকে গেল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল দিলীপ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এগিয়ে চলল। একবার ডাক্তারের উপদেশ মনে পড়ল তার : পায়ের ব্যথা পায়ে সেরে যাওয়াই সব থেকে ভাল। চমৎকার দাওয়াই ডাক্তারের! দিলীপ নিরুপায়ভাবে মুখ বুজে সেই উপদেশই পালন করতে লাগল।

এবার কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর দিলীপ দেখল, আরো একসার পায়ের ছাপ ওদের পথে এসে মিশেছে। পথ-নিশানী পতাকা দেখে বুঝল, ওগুলো নিমাইদের পায়ের দাগ। কাল ওরা এই পথেই এসেছিল। এ পথটা এগিয়ে গেছে নন্দাঘুণ্টি গিরিশিরার দিকে। দিলীপরা যাবে 'কল'-এর দিকে। ওরা সে পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরল।

প্রায় ২০।২৫ মিনিট এগিয়ে যাবার পর দিলীপ দেখল, আঙ শেরিংরা বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওরাও বসে পড়ল। আঙ শেরিং বলল, আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, বেয়াড়া ফাটল যদি না থাকে, তাহলে চূড়ায় ওঠা সম্ভব হবে। শেরপারা গাঁইগুঁই

করতে লাগল, আজ মাল বড় বেশী চাপানো হয়েছে। ২নং শিবির স্থাপন করবার একটা পছন্দমত জায়গাও বের করা হল। ওরা এবার সেদিকেই এগ্রতে লাগল। এতক্ষণ ওরা রণ্টির একেবারে গা ঘেঁষে চলছিল। এবার চলতে লাগল রণ্টি আর নন্দাঘ্রণ্টির মাঝামাঝি পথ ধরে। এই দ্রটো পাহাড়ের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। হিমবাহটা ক্রমশই সর্র হয়ে আসছে। বরফের উপর প্রচুর বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে। এই মালের বোঝা নিয়ে চলতে মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। দিলীপের বিরক্তি ধরে এল। রাগ হতে লাগল—নিজের উপর, স্রকুমারের উপর, সকলের উপর। খ্রব ধীর গতিতে চলতে লাগল ওরা। পথটা কখন শেষ হবে? পথ শেষ হলে দিলীপ যেন বাঁচে।

বেলা আড়াইটা নাগাদ ওরা প্রায় ১৬৩০০ ফ্রট উপরে উঠল। তারপর সবাই বিশ্রাম নিতে বসল। আঙ শেরিং বলল, ৩নং শিবির যখন করতেই হবে, তখন ২নং শিবিরটা অনর্থক আর এগিয়ে নিয়ে লাভ কি? এই জায়গাটাই ২নং-এর পক্ষে বেশ ভাল হবে। আঙ শেরিং-এর কথায় ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা নামিয়ে হালকা হল। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। লাঞ্চ সারতে মন দিল। চা আর কোলে বিস্কুট—এই ছিল লাঞ্চ। তাই যেন অমৃত।

তিনটের সময় ওরা ১নং শিবিরের দিকে ফিরে চলল। এতক্ষণে হাওয়া ছেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাড়কাঁপ্রনে শীত। সোয়েটার, উইন্ড-প্রফ সব পরে ফেলা হল। দ্রত পায়ে সেই উঁচু চড়াইয়ের মাথায় ওরা যখন পেঁছাল, তখন স্র্যটা নন্দাঘ্রণ্টির চ্ড়ার সেই ছোট্ট ঢিবির উপর এসে পড়েছে। ওদের মনে হল, ওটা ব্রঝি স্র্যের বসবার জায়গা। ওদের গায়ে রোদ, নীচে—বেশ খানিকটা নীচে, ১নং শিবির, সেখানে তখন ছায়া। ওরা রোদ পোয়াতে বসে গেল।

১৮ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে নটার মধ্যেই ওরা ২নং শিবির স্থাপন করতে ১নং শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল। গত দ্র দিনের চেষ্টায় ওরা কিছ্র মাল উপরে তুলতে পেরেছে বটে, কিন্তু শিবির স্থাপন করতে পারে নি। আজ দিলীপ আর বিশ্বকে বিশ্রাম দেওয়া হল। স্রকুমার আর নিমাই শেরপাদের—আঙ শেরিং, টাসী, গ্রণদিন আর দা তেম্বা—সঙ্গে গেল।

ওরা মাল কিছ্র কম নিল। ৩০।৩৫ পাউন্ড। তাই অপেক্ষাকৃত দ্রততর বেগে এগোতে পারছিল। দিলীপরা কাল যে পথে এগিয়েছিল, এরাও সে পথ ধরল। কাল দিলীপরা যে পর্যন্ত এসেছিল, ওরা আজ সেখানে প্রায় সওয়া দ্রটোর মধ্যেই পেঁছে গেল। পথিমধ্যেই ওরা লাঞ্চ সেরে নিয়েছিল।

শেরপারা এখানে কিছ্র মাল নামিয়ে রেখে বাকী মাল নিয়ে আঙ শেরিং-এর নির্দেশমত এগিয়ে গেল আরো। নিমাই আর স্রকুমার বসে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। শেরপারা কিছ্র দ্রর গিয়ে রণ্টির দিকে একটা বরফের পাঁচিলের আড়ালে নেমে পড়ল। ওদের আর দেখা গেল না। ওরা একট্র আশ্চর্য হল। শেরপারা ওদিকে গেল কোথায়?

নিমাই হাঁক ছাড়ল। কিছ্রক্ষণ পরে ওদের সাড়া পাওয়া গেল। স্রকুমাররা সেদিকে এগিয়ে গেল। পাঁচিলটায় উঠে ওরা দেখে, নীচেয়, প্রায় ২০ ফ্রট নীচেয় একটা খোঁড়ল আছে। শেরপারা সেখানেই ২নং শিবির স্থাপন করছে। ওরা যেতেই আঙ শেরিং বলল, এই হচ্ছে ভাল জায়গা। পাথর পড়বে না, ধস নামবে না, হাওয়াও লাগবে না।

ছোট্ট অপরিসর জায়গা। কোনক্রমে গোটা তিনেক তাঁবু খাটানো গেল। একটাতে শেরপারা ক'জন, একটাতে আঙ শেরিং আর অন্যটাতে নিমাই আর সুকুমার। জায়গাটা একটা বড় গামলার মত। ভিতর থেকেই নন্দাঘুণ্টির চূড়া দেখা যায়। কানায় উঠলে দেখা যায় 'কল'টি।

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে :

অ্যাডভান্স বেস, ১৮ই অক্টোবর। আমি দুপুরে এখানে নেমে এসেছি। মন খুবই খারাপ। নিজের ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছি। কোথায় উপরে উঠব, এই আশায় বুক বেঁধেছিলাম, আর কোথায় এখন বসে আছি। এই জায়গাটা আমার কাছে বিষের মত লাগছে। হয়তো উপরে যেতে পারতাম। কিন্তু যেতে হত সকলের পরে। ফটোগ্রাফার হিসেবে সে যাওয়ার মূল্য কি? বিয়ে ফুরোলে বাজনা!

কাল যখন আলোচনা হল, তখনই বুঝলাম, আমার নেমে যাওয়াই ভাল। কাল লীডার জানাল, দিলীপ, বিশ্বাস ও আমাকে ১নং শিবিরেই থাকতে হবে। তা না হলে উপরে খাওয়ার জিনিস, তাঁবু, অন্যান্য সরঞ্জাম, কিছুই পাঠানো যাবে না। আমার জন্য দুটো শেরপা দরকার। আর আমি দুটো শেরপা নিলে এদের মাল যায় না। কাজেই নেমে আসা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর কি?

আমি এখানে বরফ-ঢাকা পাহাড় দেখতে আসি নি। ১৮০০০ ফুট আরোহণের কৃতিত্ব নিতেও আসি নি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী ছেলেদের পর্বত আরোহণের একখানি চমকপ্রদ ও সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তোলা। এই জন্যই আমার প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আমি অনেক টাকার জিনিস কিনে এনেছি। আমার কর্তব্যকর্মের অসাফল্যের দুঃখ ও লজ্জা আমাকে যে কী পরিমাণ পীড়া দিচ্ছে তা প্রকাশ করা অসম্ভব।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেস ক্যাম্প, ১৯শে অক্টোবর। আজ আজীবা নেই। গতকাল তাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। মালবাহকেরা রসদ নিতে উপর থেকে নেমে আসবে। আজীবা যতদিন ছিল, ভাবনা ছিল না, মালবাহকদের হ্যাপা সেই সামলেছে। কাল যাবার আগে ভাঁড়ারের ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, ক'মগ আটা মালবাহকদের দিতে হবে। কতখানি নুন, ক'টা করে সিগারেট?

বেচারী আজীবা! এতদিন বেস ক্যাম্পে পড়ে ছিল, যেন জেলখানায় ছিল। সব শেরপা উপরে চলে গিয়েছে। একমাত্র আজীবা পড়ে আছে বেস ক্যাম্পে। প্রথম দিকে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাই ওকে এতদিন উপরে পাঠানো হয় নি। ডাক্তার ওকে বিশ্রাম দিয়েছিল। আজীবা কোন কথা বলে নি। কিন্তু অস্বাভাবিক রকম চুপ মেরে গিয়েছে। আমাকে একদিন বললে, মোটা সাব্, তোমাদের অনেক টাকা লোকসান করিয়ে দিলাম। কেনই বা এলাম! আজীবার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল। বললে, মোটা সাব্,

মেরা নসিব বহোৎ খারাপ হ্যায়। এই একটি শান্ত বিবৃতির মধ্য দিয়ে আমার কানে ব্যর্থতার এক বুকফাটা হাহাকার বেজে উঠল। কতবার সান্ত্বনা দিয়েছি আজীবাকে। বলেছি, আজীবা, কোন চিন্তা নেই, তুমি ভাল হয়ে গেছ। শরীরে বল এলেই তোমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে আজীবা হেসেছে। ম্লান হাসিতেই সে জানিয়ে দিয়েছে, আমার স্তোকবাক্যে সে বিশেষ আশান্বিত হতে পারে নি।

ডাক্তার উপরে যাবার আগে আজীবাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আজীবা, তুমি ফিট। এবার উপরে যেতে পারো। আজীবার চোখ খুশীতে চকচক করে উঠেছিল, দেখেছিলাম। বলেছিলাম, কী আজীবা, হল তো! আমার কথা ফলল কিনা? আজীবা সে কথার জবাব দিল না। শুধু হাসল। খুশীর হাসি ওর পোড়-খাওয়া মুখখানাকে রাঙিয়ে দিল।

এই আজীবা অন্নপূর্ণা অভিযানে ছিল। ১৯৫০ সালে এক ফরাসী দল অন্নপূর্ণা শিখরে (১নং) অভিযান চালান। মরিস হারজগ ছিলেন নেতা। হারজগ আর তাঁর সঙ্গী বিসকাস্টে শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। এভারেস্ট জয়ের আগে এরাই সব থেকে উঁচু শিখরে আরোহণের গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ওঠাটা যত নির্বিঘ্নে সমাধা করেছিলেন এঁরা, নামাটা তত সহজে হয় নি। সঙ্গে শেরপা ছিল না। শেরপাদের রেখে গিয়েছিলেন নীচের দিকের শিবিরে। আর এই ভুলের মাসুল তাঁদের ভাল রকমই দিতে হয়েছিল। নামবার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে একটা রাত উন্মুক্ত এক বরফের খোঁড়লে কাটাতে হয়। যে চারজন উপরে উঠেছিলেন, দুজন শিখরে আর দুজন পঞ্চম শিবির পর্যন্ত, তাঁদের কেউই অক্ষত দেহে ফিরতে পারেন নি। তিনজনের হাতে পায়ে তুষারক্ষত হয়েছিল, (নেতা হারজগের হাত আর পায়ের আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়) আর একজন সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন কোনক্রমে তাঁরা চতুর্থ শিবিরে এসে পৌঁছান। তখন আর কারও চলবার শক্তি নেই, বিশেষ করে নেতা হারজগের। সেই সময় আজীবা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে হারজগকে পিঠে নিয়ে অতি দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে আনে।

এই সেই আজীবা। দুর্ধর্ষ পর্বতারোহীদের অন্যতম। এখন উপরে যাবার জন্য ছটফট করছে। পরশুদিন পর্যন্ত তার সে কী ছটফটানি! খালি বলেছে, হাম তো ফিট হ্যায়, হামকো উপর ভেজো সাব্। আমি আর ধ্রুব আজীবার ব্যথা বুঝতে পারছি। হামকো উপর ভেজো সাব্, হামারা কাম উপরমে হ্যায়। তাও আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু নেতার আদেশ ছাড়া ওকে উপরে আমরা পাঠাতে পারিনে। রোজই আশা করছি উপর থেকে সুকুমার ওকে ডেকে পাঠাবে। কিন্তু সে নির্দেশ আসতে যত দেরি হচ্ছে, এই শান্ত গম্ভীর মানুষটির অস্থিরতা ততই বেড়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত আমরাও ওর অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলাম। তাই পরামর্শ করে ঠিক করা হল, সুকুমারের কাছে আমরা এক চিঠি পাঠাব। সে চিঠি নিয়ে যাবে আজীবা। সুকুমার যদি তাকে থাকতে বলে, সে থাকবে। না হলে খবর নিয়ে পরদিন সে নেমে আসবে বেস ক্যাম্পে।

সুকুমারকে আমরা এই সময় বিরক্ত করতে চাই নি। কিন্তু ওকে না জানিয়েও পারলাম না যে, আমাদের রসদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এসেছে। আর পাঁচ ছয়

দিন কোন মতে টেনেটুনে চলতে পারে। টাকা যা আছে তাতে যদি আমরা আমাদের আগেকার কর্মসূচী মেনে চলতে পারি, অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর বেস ক্যাম্প তুলে নিচে রওনা হতে পারি, তবেই মালবাহকদের পাওনা পরিশোধ করতে পারব। কিন্তু আর টাকা না পেলে শেরপাদের টাকা মেটাতে পারব না বা ফিরতেও পারব না।

ধ্রুব এ কথা লিখে দিল। আজীবা সেই চিঠি নিয়ে কাল ভোরে চলে গিয়েছে। রসদের অবস্থা আমাদের বড় ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। আটা, সামান্য ডাল, আরো সামান্য চিনি, গোটা কয় আলু আর পেঁয়াজ, এইমাত্র এখন সম্বল। নুনও পর্যাপ্ত নেই। আধ বস্তা ছাতু আছে মাত্র। মালবাহকদের রসদ দিচ্ছি শুধু আটা, সেরেফ আটা। ওরা ডাল চাইছে, আলু পেঁয়াজ চাইছে, নুন চাইছে, লঙ্কা চাইছে। আমরা দিতে পারছিনে। ওরা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে।

আমাদের যা কিছু ভাল খাবার ছিল, সব উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বেস ক্যাম্পে আমরা খেয়ে চলেছি চাপাটি আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর না হয় ভাত আর ডাল অথবা খিচুড়ি। একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। খেতে আর ইচ্ছে করে না। আমি ঠিক দেড় চামচ ভাত অথবা একখানা চাপাটি গিলতে পারছি। তাও যথেষ্ট জোর করে।

অথচ একটি ভেড়া তার দিব্যি নধর দেহটি নিয়ে চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নজর দেবার উপায় নেই। ওটি নন্দাদেবীর মানতের ভেড়া। ওর গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। মূর্খামি আর কাকে বলে!

মালবাহকরা আজ শুধু আটা নিতে চাইল না। অন্তত একটা করে আলু চাইল। আমি আলুর বদলে এক প্যাকেট করে সিগারেট দিয়ে ওদের আজকের মত 'ম্যানেজ' করলাম। কিন্তু কাল কি দিয়ে ঠেকাব? যদি ওরা বেঁকে বসে, যদি ওরা খেপে যায়, তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। আমি লালুকে তাড়াতাড়ি করে খাবার তৈরী করতে বললাম। তারপর রান্নার আগুনের পাশে মালবাহকদের ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসলাম। একটুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি আড্ডা জমে গেল। লালু তাড়াতাড়ি খাবার বানিয়ে দিল। চাপাটি আর আলুর তরকারি। আমরা খেতে খেতেই গল্প করছি। একজন বলে উঠল, সাব্, তুমলোগ ভি এইসা খাতা হ্যায়? সির্ফ্ চাপাটি আর আলু? আমি বললাম, সাব্লোগ আংরেজীমে ইসকো ডিনার কহতা হ্যায় বেওকুফ। সাব্লোগ ডিনার খাতা হ্যায়, চাপাটি আর আলু নেহি। ওরা হো হো করে হেসে উঠল। একেবারে পরিষ্কার আবহাওয়া। লালু বলল, সাব্লোগ এইসা ডিনার বরাবর খাতা হ্যায়। ওরা আবার হেসে উঠল। আমি বললাম, তুমলোগোকো ভি ডিনার খানা হোগা। লালু, আলু কা বস্তা লে আও। দেখো কিত্না আলু হ্যায়।

লালু আলুর বস্তা বের করে নিয়ে এল। সের দশ পনেরো আলু আছে আর।

বললাম, এক-এক আলু সব কোই কো দে দো!

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, নেহি, নেহি, সাব্। উয়ো তুমহারা ওয়াস্তে রাখ দো। হামকো ডিনার নেহি চাহিয়ে। চাপাটি মে কাম চল যায়েগা।

এতটা আমি আশা করি নি। ভেবেছিলাম, আমাদের খাওয়া দেখলে ওরা

বুঝবে, আমরা ওদের থেকে খুব ভাল কিছু খেতে পাচ্ছিনে। তখন এক-একটা আলু দিলে ওরা খুশী হয়েই নিয়ে নেবে। কিন্তু এ কী! এতটা আমি আশা করি নি।

ওরা একটু পরে "রাম রাম সাব্, গুড মর্নিং সাব্" বলে চলে গেল। আমি আর ধ্রুব স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। আলুর বস্তা লালুর পাশে পড়ে আছে। আগুনের শিখা লকলক করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আলোয় দেখলাম, বিস্ময়ে আনন্দে ধ্রুবর মুখ চকচক করে উঠেছে। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

ধরা গলায় ধ্রুব বলল, "এরা কী-মানুষ, গৌরদা?"

মনে হল বলি, "আমার দেশের মানুষ, সোনার মানুষ।" বলতে গেলাম। মনের আবেগ ঢেলা পাকিয়ে কথা আটকে দিল।

ধ্রুব আপন মনেই বলতে লাগল, "এই ধোটিয়াল মালবাহকদের বিরুদ্ধে কত কথাই না লিখেছে সাহেবরা। সেই সব বই পড়ে আমার এদের সম্পর্কে কী খারাপ ধারণাই না হয়েছিল! কী ভুল! কী ভুল!"

॥ ছেচল্লিশ ॥

১৯শে অক্টোবর। ২নং শিবির। সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই নিমাই দেখল তার অস্বস্তি লাগছে। পেট পরিষ্কার না থাকলে যে ধরনের অস্বস্তি হয়, মাথা টিপ-টিপ করে, গা ম্যাজম্যাজ করে, অসুস্থতা বোধ হয়, নিমাই দেখল, ওর সেই রকমই লাগছে। আজ আর গোঁয়ার্তুমি করল না নিমাই, কোন রকম ঝুঁকি নিল না। সুকুমারকে জানাল, তার শরীর খারাপ হয়েছে। সুকুমার তাকে বিশ্রাম দিল। টাসীর পায়ে চোট লেগেছে। তাকে শিবিরে বিশ্রাম নিতে বলা হল।

৩নং শিবিরের জায়গা দেখতে ওরা আজ ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। ২নং শিবিরটা এমন জায়গাতেই করা হয়েছে যে ছ'টা বাজতে না বাজতেই রোদ এসে যায়। আজ ওরা চারজন। সুকুমার, আঙ শেরিং, দা তেম্বা আর গুর্ণদিন।

২নং শিবির থেকে বের হয়ে ওরা প্রথমে নন্দাঘুণ্টি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বরফ খুবই নরম। তার উপর ফাটলের বাধা। অজস্র ফাটল সর্বত্র হাঁ করে রয়েছে। অনবরত ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। সুকুমার বার বার একটা মইয়ের অভাব বোধ করছে। আহা, একটা অ্যালুমিনিয়মের মই যদি যোগাড় করতে পারত ওরা! তা হলে ওদের আর এত ঘুরতে হত না। ফাটলের উপর মইখানা ফেলে দিয়ে সোজাসুজি পার হয়ে যেতে পারত। আগে আগে যে যাচ্ছে, দু এক পা চলার পর তুষার-গাঁইতি দিয়ে সে বরফ ঠুকে ঠুকে দেখছে, তলায় ফাটল আছে কিনা। নিঃসন্দেহ হলে তবে সে-পথে ওরা পা বাড়াচ্ছে। ফলে ওরা খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে তুষার-গাঁইতি সম্পূর্ণটা বরফের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ওদের পা বসে যাচ্ছে। ওরা এখনও দড়ি ব্যবহার করে নি। বরফ নরম, অতএব ক্র্যাম্পনও না।

কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ওদের পক্ষে আর নন্দাঘুণ্টির ধার ঘেঁষে যাওয়া সম্ভব হল না। এত ভয়ঙ্কর ফাটল সেদিকে। এবার ওরা আরো ডান দিকে সরে এল। এখন ওরা হিমবাহের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলতে লাগল। কিছু দূর গেল। আবার সেই ফাটলের বাধা। বিরাট এক ফাটল মুখব্যাদান করে পথ আটকে দাঁড়িয়ে

আছে। সুকুমারের মনে হল, এ যেন পুরাণের সেই অঘাসুরের হাঁ। একটু অসতর্ক হলেই টপ করে ওদের গিলে ফেলবে।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে নাজেহাল হয়ে পড়ল। সোজাসুজি যেতে পারলে যেখানে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে পারত, ঘুরে ঘুরে সেখানে দেড় ঘণ্টাতেও পৌঁছুতে পারছে না। আবার ওদের পথ বদল করতে হল। আরো ডান দিকে সরে এল। এখন ওরা রণ্টি পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলেছে। ওরা ধীরে ধীরে চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ছোটখাট যেসব ফাটল পড়ছিল, সেগুলো ওরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল। রণ্টির উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। ওরা এইজন্যেই এ পথে প্রথমে যেতে চায় নি। এখন আর উপায় কিছু নেই, কাজেই বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও ওদেরকে এই পথেই এগিয়ে চলতে হল। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর সুকুমার দেখল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে অজস্র বরফের খোঁচা খোঁচা শীষ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অবিকল যেন বরফ দিয়ে তৈরী একটা শরগাছের বন। সুকুমার মুগ্ধ হয়ে গেল। শীষগুলো বেশ শক্ত। লাথি মারলে পট্‌পট্‌ করে ভেঙে যায়। ওরা লাথি মেরে মেরে ওগুলো ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলল। এপাশে ফাটল, ওপাশে ফাটল। সে-সব পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে একবার নামল খানিক। বেশী দূর নামতে পারল না। সামনে ফাটল। ওরা একটু ঘুরে গিয়ে আর-একটা চড়াই পেল। চড়াই বেয়ে খানিকটা উঠল। আর এগুতে পারল না। ফাটল। বেশ বড় ফাটল। আবার ওরা ঘুরে গিয়ে এক উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। ২০।৩০ ফুট নেমেছে কি আবার ফাটল। ফাটলের এই গোলকধাঁধা ওদের যেন কিছুতেই আর এগোতে দেবে না। পরিশ্রান্ত হয়ে, হয়রান হয়ে ওরা সেখানেই বসে পড়ল বিশ্রাম নিতে।

প্রায় দু মাইল এসেছে ওরা। বেলা দুটো বেজে গেছে। দু মাইল পথ আসতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগল। পাঁচ ঘণ্টা! সুকুমার বিরক্ত হল। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে, নন্দাঘুণ্টি 'কল্‌'। দূরে হলেও বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে সুকুমার। 'কল্‌'টার আকার অনেকটা ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের মত। রণ্টির দিকে যে বাহুটা, সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নন্দাঘুণ্টির দিকের বাহুটা বড়। খুব হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ার তোড়ে তুষারকণিকা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। হিমবাহটা এখান থেকে বেশ কিছু দূর ক্রমাগত নেমে গিয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে শুরু করেছে। উঠতে উঠতে ক্রমে 'কলে'র সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সুকুমাররা আর এগোল না। চারদিক চেয়ে দেখল, কাছাকাছি শিবির করবার মত জায়গা নেই। বুঝতে পারল 'কলে'র কাছেই কোথাও শিবিরটা করতে হবে। তবু আর এগোল না। ফাটলের এই জটিল ধাঁধার ভিতর দিয়ে পথ করেই ফিরতে হবে। ওরা আর দেরি করা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। ওখানেই মাল নামিয়ে রেখে ফিরে চলল ২নং শিবিরে।

প্রায় সাড়ে-পাঁচটায় ফিরে এল ওরা। সুকুমার দেখল ১নং থেকে দিলীপ, বিশ্ব, নরবু আর ফুতার এসেছে। অ্যাডভান্স থেকে এসেছে মদন। আর কী তাজ্জব, আজীবা আজ সকালে সেই বেস ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে, এরই মধ্যে একেবারে ২নং শিবির পর্যন্ত চলে এসেছে! নরবু আর ফুতার মাল রেখে ১ নম্বরে নেমে গেল।

২নং শিবির আজ লোকে লোকারণ্য। সব সমেত ওরা দশজন। একটা তাঁবুতে সুকুমার আর নিমাই, একটা তাঁবুর মধ্যে দিলীপ, বিশ্ব আর মদন, বড় তাঁবুটাতে আঙ শেরিং, গুণদিন, টাসী আর দা তেম্বা। আজীবার কোন তাঁবুতেই জায়গা হল না। সে বাইরেই শুয়ে থাকল।

সুকুমার ফিরে এসে দেখল, নিমাইয়ের শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়েছে। কয়েকবার বমিও করেছে। কিছুই খায় নি।

রাতে ঠিক হল, কাল আজীবা শেরপাদের সঙ্গে রাস্তা দেখতে যাবে। 'দুটো অ্যাসল্ট পার্টি' করা হবে, এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রথম পার্টি যদি সফল না হয় তবে দ্বিতীয় পার্টি পরের দিনই চূড়ার দিকে অভিযান চালাবে। এও ঠিক হল, নিমাইয়ের যদি শরীর ভাল হয়ে যায়, তা হলে দিলীপ আর নিমাই প্রথম পার্টিতে থাকবে। দ্বিতীয় পার্টি সুকুমার, বিশ্ব আর মদনের মধ্যে থেকে ঠিক করা হবে।

২০শে অক্টোবর। ২নং শিবির। আবহাওয়া এখনও ভাল। আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার রোদ। সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই শেরপারা মাল নিয়ে বেরিয়ে গেল ৩নং শিবির স্থাপন করার জন্য। ২নং শিবিরে বিশ্রাম নিল সুকুমার, বিশ্ব, দিলীপ, মদন আর নিমাই। নিমাই ভেঙে পড়েছে। আরো কয়েকবার বমি করেছে। ওর মাথায় যন্ত্রণা।

আঙ শেরিং, আজীবা, গুর্ণদিন, টাসী আর দা তেম্বা সন্ধ্যের সময় ফিরে এল। ওরা এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, এসে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। চুপচাপ বিশ্রাম নিতে লাগল। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, চা খেয়ে, তারপর সুস্থ হল।

আজীবা বলল, আগের দিকে রাস্তা আরো খারাপ। ফাটলের সংখ্যা, যতই এগোনো যায়, ততই বাড়তে থাকে। একটা চড়াইয়ের মুখে এমন ভয়ঙ্কর ফাটল যে পড়ে যাবার ভয়ে ওদের পাহাড়ের গায়ে পিটন পুঁতে দড়ি টাঙিয়ে রাস্তা করতে হয়েছে।

আঙ শেরিং বলল, আমরা ৩নং বানাতে পারি নি। জায়গা খুঁজতেই দম বেরিয়ে গেছে। সবাই ৩নং শিবিরে একসঙ্গে যেতে পারবে না। অত তাঁবু ফেলার জায়গা পাওয়া যাবে না। আর ওদিকে যে-রকম হাওয়া তাতে আর্কটিক তাঁবুগুলো কাজে লাগবে না। হাই অল্‌টিচ্যুড ডবল-তাঁবু যেটা আছে, সেইটে নিয়ে যেতে হবে। ৪নং শিবির বানাতে পারা যাবে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় সম্ভব হবে না।

৩নং আর ৪নং শিবিরের জন্য যে খাবার আছে, যদি দুই-এক দিন বিলম্ব হয়, তাতে কুলোবে কিনা সন্দেহ। এই খবর পাওয়ার পর সুকুমার বলল, যত শীঘ্র সম্ভব, চূড়ায় অভিযান করতে হবে। নিমাই অসুস্থ, অতএব 'অ্যাসল্ট পার্টি' আবার নতুন করে ঠিক করতে হবে।

আবার পরামর্শ হল। আঙ শেরিং বলল, যে-রকম রাস্তা দেখছি, আমার মনে হয়, প্রথম দলে চারজন শেরপা আর দুজন সাব্ থাকুক। দ্বিতীয় দলে থাকবে দুজন সাব্ আর তিনজন শেরপা। প্রথম দলে আমি যাব আর যাবে আজীবা, নরবু আর টাসী। এখন তোমরা ঠিক কর, প্রথম দলে কাকে কাকে পাঠাবে।

সুকুমার দেখল ওরা চারজনই 'ফিট' আছে। নিমাই শুধু অসুস্থ। ও ভাবতে লাগল। দিলীপ বলল, এ ব্যাপারে লটারি করাই ভাল। যার নাম উঠবে, সে-ই ভাগ্যবান। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মদন আর বিশ্ব বলে উঠল, লটারি-ফটারিতে আমরা নেই। সুকুমার দলের নেতা, বিজয়ের গৌরব করায়ত্ত করার সুযোগ ওকেই প্রথমে দেওয়া হোক, আর দিলীপের নাম তো আগেই ঠিক হয়েছে। দ্বিতীয় দলে আমরা থাকছি।

সুকুমার দ্বিরুক্তি না করে এই পরামর্শ গ্রহণ করল। ঠিক হল, কাল সকালেই প্রথম দল তৃতীয় শিবিরের দিকে যাত্রা করবে। শিবির স্থাপন করবে। ২২শে

অক্টোবর চূড়ায় অভিযান চালাবে। দ্বিতীয় দল ২৩শে অক্টোবর সকালে ৩নং শিবিরে যাবে।

রাত্রে ওদের মনে পড়ল, আজ কালীপুজো। ওরা খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করল, তারপর শুতে গেল।

২১শে অক্টোবর সকাল সাড়ে-নটায় সুকুমার, দিলীপ আর সাতজন শেরপা ২নং শিবির থেকে ৩নং শিবিরের দিকে যাত্রা করল। মদন আর বিশ্বদেব ওদের এগিয়ে দেবার জন্য পাঁচিলের উপর উঠে এল। সুকুমার আকাশের দিকে চাইল। পরিষ্কার, গাঢ় নীল, ঝকঝকে আকাশ। সুকুমারের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। হে ঈশ্বর, সে মনে মনে প্রার্থনা জানাল, হে বিশ্বনাথ, নন্দাদেবি! আর বড় জোর তিনটে দিন এমন আবহাওয়া রাখ, তিনটে দিন, তা হলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

সুকুমার সোজা দক্ষিণে চাইল। ঐ যে দূরে নন্দাঘুণ্টির চূড়া। তার মনে হল, প্রসন্নবদনে যেন তাদের দিকে চেয়ে আছে। পিছনে চাইল সুকুমার। বিশ্বদেব আর মদন দাঁড়িয়ে আছে ২নং শিবিরের বরফের পাঁচিলের উপর। আরে, আরে! থমকে দাঁড়াল সুকুমার। দিলীপ কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই বিশ্ব আর মদন ধরে ফেলেছে নিমাইকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে টলতে টলতে পাঁচিলের উপর উঠে এসেছে নিমাই। এসেছে প্রথম শিখর-অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানাতে। সব কষ্ট হজম করে প্রবল চেষ্টায় নিমাই মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

বলল, "জয়যাত্রায় যাও গো, ফিরে এসো জয়রথে, নিরাপদে।"

বিশ্বদেব আর মদনও তার সঙ্গে গলা মিলাল।

সুকুমার, দিলীপ আর সাতজন শেরপা সাবধানে নেমে গেল প্রথম উৎরাইটা। তারপর একটা চড়াইয়ের উপর ওদের দেহ ক'টা একবার ভেসে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একে একে হারিয়ে গেল আর-একটা উৎরাইয়ের অন্তরালে। আর তাদের দেখা গেল না।

বিশ্বাস, মদন আর নিমাই ফিরে গেল তাঁবুতে।

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে :

২১শে অক্টোবর। অ্যাডভান্স বেস্। আজ আর কিছুই ভাল লাগছে না। বাইরে যে বসার জায়গা করা হয়েছে, সেখানে বসে তাস খেলছি। দুপুর প্রায় বারটা নাগাদ ধ্রুব নীচ থেকে এল। তাস রেখে গল্পগুজব শুরু হল। ধ্রুবকে আমার নেমে আসার ঘটনা বললাম। বেলা দেড়টায় খেতে বসলাম। আজও কিছু মাংস ছিল। সেটা রান্না হল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ধ্রুবর ফিরে যাবার কথা। কিন্তু সে অপেক্ষা করতে লাগল। আক্কেল বাহাদুর উপরে গিয়েছে। যদি কিছু খবর আনে। আক্কেল বাহাদুরও উপরে যাচ্ছে! এরা বরফকে যমের মত ভয় করত! এরাই আনন্দধুরা অতিক্রম করতে আপত্তি জানিয়েছিল! আমাদের পাল্লায় পড়ে এখন হাই-অল্টিচ্যুড পোর্টার বনে গেল এরা।

বারে বারে উপরের দিকে চাইছি। কারো দেখা নেই। ধ্রুব অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কফি তৈরী হল। কফি খেয়ে ধ্রুব আর বিলম্ব করতে চাইল না। বেলা সাড়ে চারটা বেজে গেল। ও উঠবে উঠবে করছে, এমন সময় উপরে দুজন লোককে দেখা গেল। এখনও চেনা যাচ্ছে না, আরেকজন কে? তবে একজনের পিঠে বেশ বোঝা আছে মনে হল। নিশ্চয়ই কেউ নেমে আসছে। সন্দেহ হল, কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে

পড়েছে। ধ্রুব নিদারুণ ঝুঁকি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় পাঁচটা। এই ওরা নেমে এল। নিমাই নেমে এসেছে আঙ্কেলের সঙ্গে। অসুস্থ। পথশ্রমে কাতর। ডাক্তার তক্ষুনি তাকে পরীক্ষা করল। জানাল, ভয়ের কিছু নেই। কোষ্ঠকাঠিন্যের দরুনই ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে। ধ্রুব নীচে নেমে গেল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

নিমাই জানালে, রায়, দিলীপ আর সাতজন শেরপা ৩নং শিবিরে আজ সকালেই যাত্রা করেছে। ওরা কাল 'কলে'র উপর ৪নং শিবির স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। কিংবা চূড়াতেও অভিযান চালাতে পারে।

॥ সাতচল্লিশ ॥

এদিকের বরফ তত নরম, ততটা ভসভসে নয়। তবুও ওরা তেমন দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছিল না। এদিকের বাধা ফাটল। এই ফাটল এড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তাই ওরা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে, কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে যেতে হচ্ছে বলে পথ হাঁটতে হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে তেমন এগুতে পারছে না। সুকুমারের মনে হল, এ যেন ছেলেবেলার সেই 'সাপ-সিঁড়ি' লুডো খেলা।

ওরা কখনও নন্দাঘুণ্টি কখনও বা রণ্টি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। দিলীপ আর সুকুমার ক্রমাগত নন্দাঘুণ্টির দিকে চাইছে। ওদের মনে উদ্বেগ। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ওদের নজর পড়ল রণ্টি গিরিশিরার দিকে। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। অবিকল যেন পুরনো আমলের একটা বাদশাহী কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে। কালো স্লেটের মত রঙ। সারা গা ফাটা-ফাটা। ওরা কিছুক্ষণ পাহাড়টার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার চলতে শুরু করল।

কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় দেখল বরফের উপর দড়ি, পিটন ইত্যাদির বোঝা পড়ে আছে। আগের দিন যারা এসেছিল, তারাই এসব রেখে গিয়েছে। এখানে এমন ভয়ঙ্কর ফাটল যে, ওরা পরস্পর দড়ি বেঁধে নিল। শরীরটাকে হালকা করে, একে একে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের লোকটি তুষার-গাঁইতির ব্রেক তৈরী করে সদা-প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পা ফস্কে আগের লোকটি পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পরের লোকটি দড়ি ধরে তাকে সামাল দিতে পারে। নন্দাঘুণ্টি যে কী সাংঘাতিক পাহাড়, কেন যে বাঘা-বাঘা পর্বতারোহীরা একে 'টেকনিক্যালি' সুকঠিন, দুঃসাধ্য পর্বত বলেছেন, এখন তার মর্ম ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে লাগল।

অতিশয় সতর্ক হয়ে ওরা খুবই মন্থর গতিতে সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটি অতিক্রম করল। এবারে সামনেই এক উঁচু চড়াই। এতক্ষণ ওরা নন্দাঘুণ্টির 'কল'টা বেশ দেখতে পাচ্ছিল। সামনে চড়াইটা পড়ে যাওয়ায় 'কল'টা তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। চড়াইটাও ফাটলে ভরতি। কেউ যেন ফাটল দিয়ে দিয়ে নানা রকম নক্শা কেটে রেখেছে।

গুণদিন, টাসী আর আঙ ফুতার চড়াইয়ের মাথায় উঠে গেল। খানিক পরে দিলীপ আর সুকুমার দেখল, ওরা তিনজনে উপরে তাঁবু খাটাতে লেগেছে। আঙ শেরিং সুকুমারদের একটু আগে আগে যাচ্ছিল। সে নীচ থেকেই চেঁচিয়ে ওদের তাঁবু খাটাতে বারণ করল। আরো পিছিয়ে যেতে বলল। জবাবে ওরা কি বলল,

সুকুমার বুঝতে পারল না।

সুকুমার আর দিলীপ এবার চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিছু দূরে ওঠার পর ওরা দেখল, ওদের সামনে বিরাট এক ফাটল। ফাটলের কিনার ধরে বরফে দড়ি খাটিয়ে রাস্তা বানানো আছে। ওরা বুঝতে পারল, শেরপারা কাল এই পর্যন্তই আসতে পেরেছিল। দড়ি খাটিয়ে এখানে রাস্তা করেই ওরা ফিরে গিয়েছিল। বরফের উপরকার ছাপ দেখে বুঝল, এখানে মালও ফেলে রেখে গিয়েছিল। চড়াইটা বেশ খাড়া। প্রায় ১০০ ফুট উঁচু হবে। ওরা যখন উপরে উঠল, বেলা তখন আড়াইটা। প্রায় ২০০ গজ দূরে 'কল'। ওরা সেখানেই বিশ্রাম নিতে লাগল।

আজীবা, দা তেম্বা আর নরবুকে ওরা দেখতে পেল না। শুনল, ওরা আরো এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম কুঁজটা পর্যন্ত ওরা যাবে। রাস্তা তৈরী করে রেখে আসবে।

দিলীপ ছবি তুলতে লাগল। স্থির-ছবি তুলল। চলচ্ছবি তুলল ওর আট মিলিমিটারের সিনে ক্যামেরায়। এমন সময় সে দেখতে পেল, দূরে আজীবা সেই কুঁজটার উপর উঠছে।

'কল'টার পূবে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে ওদের ৩নং শিবির স্থাপন করা হল। প্রায় দশ ফুট বরফ সরিয়ে কয়েকটা বড় বড় খোঁড়ল তৈরী করা হল। সেইসব খোঁড়লের মধ্যে দুটো মাত্র তাঁবু খাটানো হল। একটা পুরনো আর্কটিক টেন্ট—দুজনের মত। আর-একটা হাই অলটিচ্যুড ডবল টেন্ট—চারজনের মত।

'কল'-এর দক্ষিণে নন্দাঘুন্টি, উত্তরে রণ্টি। পূবে-পশ্চিমে লম্বা এই 'কল'টার পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। রণ্টি আর নন্দাঘুন্টির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। কত নীচুতে আকাশ। দিলীপের মনে হল হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়! ১৮০০০ ফুট উপরে ওরা ৩নং শিবির স্থাপন করতে পেরেছে। আর মাত্র ২৭০০ ফুট বাকী।

আবহাওয়া এতক্ষণ সুন্দর ছিল। আকাশ নির্মেঘ। বেশ রোদ। হঠাৎ বেলা তিনটে থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাওয়ার বেগ বেড়ে উঠল। আজীবা, দা তেম্বা আর নরবু হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। দা তেম্বা, গুণদিন আর আঙ ফুতার আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করল না। অতি দ্রুত ২নং শিবিরের দিকে যাত্রা করল।

আকাশে মেঘ ছড়িয়ে পড়ল। আকাশ ক্রমশ ক্রুদ্ধ, কুটিল, ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল। হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পেল। সাংঘাতিক শীত পড়ল। অভিযাত্রীদের হাড়ে হাড়ে যেন করাত চলছে। ওরা তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ল। সুকুমারের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আর দেরি করা নয়। যদি সুযোগ পায়, কাল, হ্যাঁ, কালকেই অভিযান চালাবে চূড়ায়।

'কল'-এর উপরে কোন আশ্রয় নেই। সতত বেগে হাওয়া বইছে। ওদের সঙ্গে যে তাঁবু আছে, তা এত জীর্ণ যে, উপরে খাটাতে পারা যাবে না। হাওয়া, এই প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ সহ্য করার ক্ষমতা এই তাঁবুগুলোর নেই। অতএব ৪নং শিবির স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ছাড়া গতি নেই। দিলীপ সুকুমারকে সমর্থন করল। আঙ শেরিংও।

এতক্ষণ শুধু হাওয়াই দিচ্ছিল। এবারে শুরু হল ব্লিজার্ড। হা হা করে খ্যাপা হাওয়া ছুটে এসে তাঁবু দুটোর গায়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তুষারের ঝাপটা। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে আসতে লাগল।

সুকুমার আর দিলীপ আর্কটিক তাঁবুতে আর শেরপারা ডবল তাঁবুতে আশ্রয়

নিয়েছে। ডবল তাঁবুটা তবু নতুন। ওর সহ্যক্ষমতাও বেশী। সুকুমারদের পুরনো তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুষার-কণা ঢুকে পড়ছে। ওরা প্রাণপণে গুঁজি মেরে মেরে ফাঁক বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এমন সময় ঝড়ের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় তাঁবুটা থরথর করে কেঁপে উঠল। এই বুঝি উড়ে যায়। দিলীপ আর সুকুমার রুকস্যাক, কিটব্যাগ তাঁবুর দেওয়ালে চাপা দিয়ে সে যাত্রা সামাল দিল। পরমুহূর্তেই তুষারঝড়ের আর-একটি প্রচণ্ড থাবায় তাঁবুর গোটাকতক দড়ি পটপট ছিঁড়ে গেল। তাঁবু হেলে পড়ল। এই বুঝি উড়ে যায়। বিদ্যুৎগতিতে বিপদটা বুঝতে পেরে ওরা দুজনে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাওয়ার প্রচণ্ড গতির জন্য ওরা দাঁড়াতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাঁবুর খুঁটোয় ছেঁড়া দড়িগুলো আবার শক্ত করে বেঁধে দিল। তুষারের গুঁড়োয় ওদের গা মাথা ঢেকে গেল। ঠাণ্ডায় বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। পাঁচটার সময় টাসী খাবার তৈরী করে দিল। টিনের মাছ আর পোলাও। ওরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু কারো চোখে ঘুম এল না। ও-তাঁবুতে আঙ শেরিং সারা রাত ধরে গুন গুন করে প্রার্থনা করল। এ-তাঁবুতে সুকুমার আর দিলীপ মোমবাতি জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ গান গাইল। বীরেনদার গান—"জয় শিব শঙ্কর, জয় ত্রিপুরারি—"। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল কালকের জন্য। একটা তালিকা তৈরী করল নামের। যারা এই অভিযানে এসেছে, যাঁরা সাহায্য করেছেন, সমর্থন করেছেন, তাঁদের নাম একখানা কাগজে লিখে ফেলল। যদি চূড়ায় উঠতে পারে, সেখানে রেখে আসবে এই নামের তালিকা।

সুরানার কথা মনে পড়ল। শেষকিরণ সুরানা। এই উৎসাহী ছেলেটিকে ওরা দলে জায়গা দিতে পারে নি শেষ পর্যন্ত। মনে মনে সে ওদের সঙ্গেই আছে। লেখ ওর নাম। অমিতাভ আসতে পারে নি। ওর তুষার-গাঁইতি, স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাস এসেছে। লেখ ওর নাম। ওরা লিখে চলল, অশোককুমার সরকার, উমাপ্রসাদ মুখার্জি, প্রবোধকুমার সান্যাল। সুবলদা, গোষ্ঠিপতি। মণি সেন। হিলারি। লেখ লেখ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং, তেনজিং। না, কারোর সঙ্গেই কোন বিরোধ নেই আমাদের। লেখ, যার নাম মনে আসে লেখ। সেই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই প্রকম্পিত মোমের আলোয় নামের তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। এক একটি মুখ ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সবাই স্মিতহাস্যে যেন ওদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন...হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, হে নির্ভয়...

ওদের মন থেকে সব ভয়, সব আশঙ্কা তিরোহিত হল। আর কিচ্ছু ভাবছে না ওরা। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

"সাব্, চা।"

ওরা চমকে উঠল। আরে, এ যে সকাল হয়ে এসেছে।

॥ আটচল্লিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেস ক্যাম্প, ২২শে অক্টোবর। সুন্দর আবহাওয়া। কালকের দুর্যোগের পর আজ এত সহজেই রোদ উঠবে ভাবি নি। সেই হিমালয়ের ঈগলটি আজ নানা কায়দার খেলা দেখাচ্ছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলুম। হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার দিয়ে সে পালিয়ে গেল। ওর এমন তালভঙ্গ হল কেন? ও বাবা, আকাশের চেহারা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তাই কী ঈগলটা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল! দেখতে দেখতে দিনের আলো মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীত পড়ল। আকাশে সর্বনাশের ইঙ্গিত। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেলাম। তাঁবু মানে ত্রিপলের ছাউনি। বেলা সাড়ে-বারোটাও না। কিন্তু কী সাংঘাতিক শীত! স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি। তাও কাঁপছি। উপরে ওরা কি করছে, এখন? কিছু খবর আসছে না উপর থেকে।...

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে :

অ্যাডভান্স বেস, ২২শে অক্টোবর। আক্কেল, পল্টন, গোরা সিং সকালেই ২নং শিবিরে বেরিয়ে গিয়েছে কাঠ, কেরোসিন তেল, চিনি, পিঁয়াজ নিয়ে। আমি, ডাক্তার আর নিমাই তাস পিটছি। এগারটা থেকে একটু একটু করে মেঘ জমতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়া সারার পর বরফ পড়তে শুরু করল। ভীষণ ঠাণ্ডা। তিনটে নাগাত মুষলধারে তুষারপাত আরম্ভ হল। আমরা রান্না-ঘরে আগুনের পাশে আশ্রয় নিলাম।...

গোরা সিং-এর বিবরণ :

১নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। ১নং শিবির পরিত্যক্ত। কেউ নেই। আমরা ভূতের বাড়ির মত এই জনশূন্য শিবিরের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। ২নং শিবিরে। ১নংএ শুধু বরফ, বরফ আর বরফ।...

২নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। বেলা সাড়ে-এগারটা। মদন আর বিশ্ব সকাল থেকে পাঁচিলের উপর বসে আছে নন্দাঘুণ্টির দিকে চোখ রেখে। ওরা বলেছিল, আজ উঠবে চূড়ায়। দেখা যাক ওদের দেখা যায় কিনা? আবহাওয়া এতক্ষণ বেশ পরিষ্কার ছিল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া ভালই দেখা যাচ্ছে। কোন পথ ধরে উঠবে ওরা?

বেলা বারোটা। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এখনও নন্দাঘুণ্টির শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অভিযাত্রীরই দেখা নেই। বরফ পড়তে শুরু করল। প্রবল হাওয়া। বিশ্ব আর মদন ক্ষুণ্ণ মনে শিবিরে ফিরে এল। তুষার-ঝড় চলল কিছুক্ষণ। তারপর আবার আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না। জমাট মেঘে অন্ধ হয়ে থাকল আকাশ। তুষার-ঝড় থামতেই বিশ্ব আর মদন আবার ২নং শিবিরের সেই পাঁচিলটায় উঠে বসল।

বেলা দেড়টা। নন্দাঘুণ্টি পাহাড় মেঘে ঢেকে আছে। এখান থেকে কিছু দেখা যায় না। আর কতক্ষণ বসে থাকবে মদন আর বিশ্ব? শীতে ওরা জমে যাচ্ছে। উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে। ওরা কি আজ চূড়ায় অভিযান চালিয়েছে, না কি এই দুর্যোগে বের হয় নি? আর যদি বেরিয়ে থাকে?...

এতক্ষণ মেঘ নন্দাঘুণ্টির গায়ে যেন জমাট বেঁধে ছিল। এখন, ওরা দেখল,

মেঘ সচল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় মেঘ উঠছে, নামছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। হঠাৎ মেঘের আবরণ এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে নন্দাঘুণ্টির চূড়ার নীচেকার অনেকখানি জায়গা বিশ্ব আর মদনের চোখে ভেসে উঠল। সাদা বরফ আর তার গায়ে—

আরে ও কি? ওগুলো কি? ঐ কালো কালো বিন্দুগুলো? বিশ্বদেব দেখল। মদন দেখল। বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠল। মদন চেঁচাল। দেখ দেখ, ঐ যে ওরা উঠছে। ওরা চূড়ার খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছয়টা বিন্দু। নড়ছে। উঠছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভারী এক মেঘের যবনিকা ঝপ করে কে যেন ফেলে দিল। সে পর্দা আর উঠল না। নন্দাঘুণ্টি দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। কাউকে না।

বেলা আড়াইটে। কিচ্ছু দেখা গেল না। শুধু মেঘ।

বেলা সাড়ে-তিনটে। শুধু মেঘের কুণ্ডলী। আলো বিবর্ণ হয়ে আসছে।

বেলা চারটে। নন্দাঘুণ্টি পূর্ববৎ অদৃশ্য। মেঘেরা ক্রুদ্ধ মল্লের মত পাঁয়তারা কষছে।

বেলা সাড়ে-চারটে। দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

বেলা সাড়ে-পাঁচটা। অন্ধকার নেমে এল। আর কিচ্ছু দেখার আশা করা বাতুলতা।

একরাশ উদ্বেগ নিয়ে মদন আর বিশ্বদেব তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল।

৩নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। সুকুমার চা খেয়ে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল। আজ সু-কভারও পরল সে। তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। আঙ শেরিং, আজীবা, টাসী আর নরবু, প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ তখনও তাঁবুর ভিতরে। দুটো মোজা পরে বাঁ পায়ে জুতো গলাতে পারছে না। পা কষে ধরছে। নানাভাবে চেষ্টা করল দিলীপ। জুতোকে জুত করতে পারল না।

"দিলীপ, আয়।" সুকুমার ডাকল। "দেরি করছিস কেন?"

দিলীপ এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। তারপর ধুত্তোর বলে নিতান্ত গোঁয়ারের মত এক কাজ করে বসল। একটানে একটা মোজা বাঁ পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর একটা মোজা পরেই জুতোর মধ্যে বাঁ পা গলিয়ে দিল। সু-কভার বাঁধল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওরা আজ ক্র্যাম্পনও পরেছে।

বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। রোদ ফুটেছে। সুকুমারের মনটা খুশীতে নেচে উঠল। টাসী, আজীবা আর নরবু আগে বেরিয়ে গেল। আজ কারো কাছেই বিশেষ বোঝা নেই। প্রথম দলটা 'কল'-এর উপর উঠল, তারপর এদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এবার সুকুমাররা যাত্রা করল। প্রথমে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, পিছনে দিলীপ। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা 'কল'-এর উপরে পেঁছে গেল। হাওয়া নেই। চলতে ফুর্তিই লাগছে। 'কল'-এর পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। ওদিকে যে-সব পাহাড় আছে, তাদের কারোরই চূড়া 'কল'-এর উপরে ওঠে নি। পাহাড়গুলোকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। 'কল'-টা এত উঁচু যে, নীচু দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনেক দূরে পাহাড়-পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। ওদের মনে হল, কেউ যেন এক কাপ জল রেখে দিয়েছে।

দক্ষিণে নন্দাঘুণ্টির গিরিশিরা। টাসী, আজীবা আর নরবুকে দেখা গেল। ওরা পাহাড়ের গায়ে গজাল পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে খাটিয়ে পথ বানিয়ে চলেছে। আজ শুরু থেকেই ওরা দড়ি বেঁধে চলেছে। এক দড়িতে টাসী, আজীবা আর নরবু, অন্য দড়িতে আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। দিলীপকে ছবি তুলতে হচ্ছে, তাই সে আছে সবার পিছে।

ওরা নন্দাঘুণ্টির উত্তর গিরিশিরার পুব দিকের পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে প্রথম কুঁজটার নীচে এসে পৌঁছাল। পথটা এত খাড়া, এক দিকে আবার অতলস্পর্শ খাদ যে, টাসীরা এ-পথে দড়ি খাটিয়ে অর্থাৎ 'ফিক্সড রোপ' করে গিয়েছে।

সুকুমাররা নিজের নিজের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁসের সঙ্গে ক্যারাবিনা দিয়ে ফিক্সড রোপ যুক্ত করে দিলে। তারপর বাঁ হাতে ক্যারাবিনা ধরে ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ খাড়া কুঁজের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ওদের আন্দাজ সেই কুঁজটার উচ্চতা ৭০০ ফুট হবে। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একেবারে সরাসরি উঠতে দম বেশী লাগে। তাই ওরা একটু এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। চলার গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। হাঁফ ধরছে বেজায়। তৃষ্ণা পাচ্ছে। গলা বুক শুকিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা এই কুঁজটার উপরে উঠল। দেখল আজীবা, টাসী আর নরবুও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে। ওরাও বসে পড়ল। এই ৭০০ ফুট চড়াইটা উঠতে ওদের সময় লাগল পুরো আড়াই ঘণ্টা। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা যখন আবার উঠতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ হয়েছে। ওরা সেদিকে চাইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও ৪০০ ফুট উঠল। বেলা তখন বারোটা।

সামনে, দূরে, বেথারতোলির পিছন দিয়ে নন্দাদেবীর সূচীতীক্ষ্ণ শিখর একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। নন্দাদেবীর মাথায় মেঘ জমছে। দিলীপ ফটো নিল। উত্তর দিকে রণ্টি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রণ্টি হিমবাহটাকে মনে হচ্ছে বরফের নদী। দুধের নদীও বলা যায়। পুব দিকে এর আগে বিশেষ কিছু দেখা যায় নি। এবারে বিরাট এক ফাটল দেখা গেল। নিমাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন জায়গাতে বিরাট বড় এক ফাটলের দেখা মিলবে। কী আশ্চর্য, তার কথা হুবহু মিলে গেল। দিলীপ থেমে থেমে ফটো তুলছে। আঙ শেরিং বার বার ওকে তাড়া লাগাচ্ছে। এত দেরি করলে পৌঁছতে পারা যাবে না।

আবার ওরা ভসভসে নরম বরফে এসে পড়ল। এতক্ষণ দুটো দড়ি আলাদা আলাদা যাচ্ছিল, এখান থেকে ওরা দুটো দড়ি একসঙ্গে জুড়ে নিল। এবার ওরা ছয়জন একসঙ্গেই চলতে লাগল। প্রথমে যাচ্ছে টাসী, তারপর আজীবা, তারপর যথাক্রমে নরবু, আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। আজীবা টাসীর পিছনে থাকলেও সে-ই প্রকৃতপক্ষে আজ পথ দেখাচ্ছে। আজীবার মত এত ভাল আর বুঝি কেউ বরফ চেনে না। আজীবার নির্দেশেই টাসী পথ বানিয়ে চলেছে।

ওরা আবার বিশ্রাম নিতে বসল। দিলীপ একাগ্র মনে ফটো তুলতে লাগল। সে নীচের দিকে চেয়ে ২নং শিবির দেখতে পেল না বটে, তবে আশেপাশের জায়গা-গুলো চিনতে পারল।

আপন মনে ছবি তুলে যাচ্ছিল দিলীপ। অন্য সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় কানফাটানো প্রচণ্ড এক শব্দ শূন্য আকাশ থেকে ওদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দিলীপের পিলে চমকে গেল। হাত থেকে ক্যামেরা ছিটকে গেল। ভাগ্যিস,

ক্যামেরাটা গলায় ঝোলানো ছিল, না হলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত।

ধক-ধক বুকে হাত চেপে দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তারপর আকাশের দিকে চাইল। ততক্ষণে অন্য সকলেও আকাশে চোখ তুলেছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে দেখল, ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা জঙ্গী জেট বিমান ছোঁ মেরে ওদের দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলবারও অবকাশ পেল না। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া, জেট বিমানের ধোঁয়া, তার পিছনে কুটিল কালো মেঘের দল, তার পিছনে তীব্রগতি তুষার-ঝটিকা সবেগে ওদের আঘাত করল। এই তীব্র, হিংস্র, অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অভিযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার কথাও যেন ভুলে গেল সব।

অবশেষে সংবিৎ ফিরে আসতেই সুকুমার নির্দেশ দিল, "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, বরফে মুখ গুঁজে শুয়ে পড় সব, জলদি।"

মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে সকলে নেতার নির্দেশ পালন করল। তারপর পনেরো মিনিট ধরে চলল তুষার-ঝড়ের অবর্ণনীয় তাণ্ডব। সুকুমারের মনে হল, নরক বুঝি জেগে উঠেছে। নিস্তার পাওয়া শক্ত। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে যাচ্ছে। শরীরের অস্থিমজ্জায় শীত যেন ঢুকে পড়ছে। চোখে-মুখে তুষারঝড়ের হিংস্রতম ঝাপটা এসে লাগছে। মুখের গালের অনাবৃত অংশের চামড়া বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!

পনেরো মিনিটের মধ্যেই হাওয়ার বেগ কমে এল। শুরু হল তুষারপাত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ২০।২৫ ফুটের বেশী আর দৃষ্টি চলে না। ওরা এবার উঠে বসল। সুকুমার বোধ করল, তার পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে গ্রাহ্য করল না।

আজীবা আর আঙ শেরিং দুজনেই পোড়-খাওয়া শেরপা। ওদের চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। আবহাওয়ার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। বাহাৎ খতরনাক হ্যায়। হিসেব করে দেখল এখনও ১৬০০ ফুট উঠতে হবে, তারপর ২৭০০ ফুট নামতে হবে। এই দুর্যোগে। সাব্‌রা নতুন লোক। যদি ফিরতে না পারে? তা হলে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু যদি নাও হয়, বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। অতএব—

আঙ শেরিং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়াই ভাল।

আজীবা পরামর্শ দিল, ফিরে চল সাব্। নরবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। সে বরাবরই চুপ করে থাকে। এতদিনের মধ্যে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনে নি। হঠাৎ সে মুখ খুলল।

বলল, "শুনো সাব্, বাঙালকা ইজ্জৎ তুম্‌হারা হাত মে হ্যায়। উঠো, চলো উপর, আগু বাঢ়। বাঙালকা ইজ্জৎ বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়!"

সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। সে দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "উপরে চল।"

দিলীপের বুক ফেটে যাচ্ছে, সুকুমারের বুক ফেটে যাচ্ছে। আজীবা, আঙ শেরিং, টাসী, এমন কি নরবুও কাহিল হয়ে পড়েছে। জল চাই এখন, এক ফোঁটা জল। না হলে দিলীপ বুঝি মরেই যাবে। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। প্রায় আড়াইটা বাজে। দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। না, এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড়

করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী, এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতলে জল ভর্তি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

॥ ঊনপঞ্চাশ ॥

আঙ শেরিং দেখল, দিলীপ ওর জলের বোতলটা উপুড় করে ধরে বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল ওর বোতলে বোধ হয় জল নেই। তাড়াতাড়ি নিজের বোতলটা এগিয়ে দিল। দিলীপ কালবিলম্ব না করে, ছিপি খুলে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এক ফোঁটা জলও গলায় পড়ল না। আগের মতই ভিতরের জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। বার বার একই বিড়ম্বনা। তবু দিলীপ বিরক্ত হল না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।

আঙ শেরিংকে বোতলটা ফেরত দিয়ে সে উঠতে শুরু করল। বেলা আড়াইটা। আকাশে এখনও মেঘ, তবে আগের মত হিংস্র কুটিল নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ছিঁড়ে আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। ওদের দৃষ্টির দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ১০।১৫ ফুট দূরে কি আছে, তাও তারা দেখতে পাচ্ছিল না। এখন অবস্থা একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। ২০।২৫ ফুট পর্যন্ত ভালই দেখতে পাচ্ছে। তার বেশী না।

দুটো কুঁজ পার হয়ে আসার পর থেকে দিলীপের মনে হচ্ছে, চড়াইটা যেন আর তেমন খামখেয়ালিপনা করছে না। একইভাবে উঠে যাচ্ছে। এ তবুও ভাল। এ যেন চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। খামখেয়ালি শুরু করেছে বরফ। বরফ কখনও বেশ শক্ত। এমন শক্ত যে, ক্র্যাম্পনের কাঁটা বেঁধে না। ওরা যেই সেইমত, অর্থাৎ পায়ে চাপ দিয়ে দু-চার কদম এগিয়েছে, অমনি ভস্‌ভস্—অতর্কিতে নরম বরফের মধ্যে জানু পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওদের। মহা ঝামেলা।

ধীরে, অতিশয় মন্থরগতিতে ওরা উঠে চলেছে। সকাল সাড়ে-আটটায় ৩নং শিবির থেকে বেরিয়েছিল। ছয় ঘণ্টা অবিরাম উঠেছে। উঠছে। তবু চূড়ার দেখা নেই। 'ফিক্সড্ রোপ' করতে করতে ওদের দড়ি ফুরিয়ে গেল, তবু রাস্তা ফুরোল না। কখনও কি ফুরোবে? ওরা কি পেঁছিতে পারবে নন্দাঘুণ্টির শিখরে? সুকুমার যেন প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাঝে মাঝে এখনও হাওয়া বইছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া। সুকুমার বুঝতে পারছে ওর সহ্যশক্তি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সুকুমারের। কিন্তু কোথায়? দেহে, না মনে? পায়ের ফোস্‌কায়, না ব্যর্থতার আশঙ্কায়, সুকুমারের শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন্য সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না। মনে-মনে শুধু একটা কথাই আওড়ে চলেছে, ভেঙে পড়ো না সুকুমার, পথ এখনও বাকী আছে'

সুকুমার স্বেচ্ছায় আর চলছে না। এক অন্ধ শক্তি, একটা প্রবল ইচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় এক তাড়না তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেঙে পড়ো না সুকুমার, ভেঙে পড়ো না, পথ এখনও বাকী। থেমো না সুকুমার। আগে চল।

কে আমি? আমি সুকুমার, সুকুমার রায়, খিদিরপুরের সুকুমার। এখানে কেন? পর্বত অভিযানে। কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগছে? আমার শরীরে কি? আমার গায়ে? আমার পায়ে? নাকি হাতে? নাকি বুকে? ফুসফুসে? হৃদ্‌পিণ্ডে? প্লীহায়, যকৃতে, অন্ত্রে? নাকি মনে? আত্মায়? নাকি জগৎচরাচরে অথবা কোথাও না?

এ কী, থামলাম কেন? আমি থেমে গেলাম নাকি? ওরাও যে থেমেছে। ওরা?

হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল সুকুমারের, ওর সঙ্গীরাও আছে। সে একা নয়। মনে পড়ল, সঙ্গে দিলীপ আছে। কোথায় দিলীপ? ঐ যে দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা। দড়ির অগ্রভাগে কে? এতক্ষণ আজীবা ছিল। ঐ যে আজীবা, গুরুতর পরিশ্রমে কাতর আজীবা, দড়ি খুলে ফেলছে। এবারে এগিয়ে গেল কে? টাসী। ঐ যে, আজীবার জায়গায় নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

থেমো না, সুকুমার, আগে চল। আবার চলা শুরু হল। আবার উঠতে লাগল ওরা। উঠছে, উঠছে, একজন পিছনে পড়ল, পিছনের লোক তাকে সামাল দিল। উঠছে, উঠছে, একজনের পা ফসকাল, পিছনের লোক ধরে ফেলল। উঠছে, একটু একটু করে উঠছে। থেমো না থেমো না, ওঠো।

টাসী উঠছিল সবার আগে। বহু অভিযানের পোড়-খাওয়া টাসী। দৈত্যের মত ক্ষমতাধর টাসী। সাতাশ বছরের জোয়ান টাসী। সকলের আগে আগে উঠছিল। চড়াইটা একটা সুষম ঢালুতে অবস্থান করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা বেপরোয়া লাফ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল। টাসী থমকে দাঁড়াল সেখানে। খাড়াই-এর উচ্চতা বেশী নয়। ফুট ছয়েক হবে। উপরে একটু কার্নিসের মত। গোদের উপর বিষ-ফোড়া। টাসী আজীবার মুখের দিকে চাইল। আজীবা পলকে তার ইঙ্গিত বুঝে নিল। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কঠিন ভিত্তি তৈরী করে দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর শক্ত মুঠোয় দড়ি ধরে 'বিলে' করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আজীবা চোখ ইশারায় টাসীকে ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ়।

টাসী সেই বিপজ্জনক উচ্চতার অস্তিত্ব কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে অসাধারণ তৎপরতায় লাফ মেরে বরফের কার্নিস ধরে ঝুলতে লাগল। একটা মুহূর্ত মাত্র। টাসী তার আঙুলের জোর ফিরে পাবার আগেই তাকে কেউ যেন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল। আজীবা এই মুহূর্তটির জন্যই যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের পলকে সে দড়ির কেরামতিতে টাসীর টলমলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল। টাসী শিশুর মত হেসে উঠল। আজীবাও।

আজীবা আবার ইঙ্গিত করল, আগু বাঢ় টাসী। টাসী আবার এক লাফ মেরে সেই বরফের কার্নিসে ঝুলে পড়ল। কিন্তু সে বরফ এত নরম, এতই পলকা যে, এবার কার্নিসের খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে টাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজীবা এবারও তাকে সামাল দিল। বার বার কয়েকবার টাসী লাফ দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বার বার সে ব্যর্থ হল। মাঝে মাঝে মেঘ ফাঁক করে আকাশ ওদের ব্যর্থতা এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার চকিতে মেঘের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিল।

ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুন্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং সে সহজে পথ দেবে না। আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। তুষারবর্ষণও আরম্ভ হয়ে গেল। আবার ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যেটুকু আলোও এতক্ষণ ছিল, তাও কমে যেতে থাকল।

আজীবা দক্ষ সেনাপতির মত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, কোথায় নন্দাঘুন্টির দুর্বলতা। সে এবারে টাসীকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে, সেখান থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। টাসী আজীবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক প্রবল লাফে কার্নিস ধরে ফেলল। তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে শরীরটাকে একটা দোল খাইয়েই উপরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভীষণ বেগে কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অজস্র তুষার-কণিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাসী তার আগেই বিদ্যুৎগতিতে একটা গড়া মেরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে।

এবার টাসী উপর থেকে দাঁড় নামিয়ে দিল। আজীবা উঠল। তারপরে নরবু, তারপরে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, দিলীপ। দিলীপের মুভি ক্যামেরা আঙ শেরিং-এর হাতে। দিলীপ হাত কামড়াতে লাগল।

চড়াইটার উপর একটা চাতাল। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল। গোটা দুই তাঁবু অনায়াসে টাঙানো যায়। পশ্চিম প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই ওদের খেয়াল হল, আরে, আর তো ওঠার জায়গা নেই! এই তো চূড়া!

এই তবে চূড়া! চূড়া, চূড়া, নন্দাঘুণ্টির চূড়া!!! হা ঈশ্বর। যাক বাবা, বাঁচা গেল, আর উঠতে হবে না। সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিলীপের বুকের ভিতরে প্রবল এক বিপ্লব। ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব-কিছু তালগোল পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা আওয়াজ, প্রচণ্ডভাবে একটা চিৎকার করতে চাইছে দিলীপ। তাহলে সে স্বস্তি পাবে। কিন্তু দিলীপের মুখ দিয়ে একটু সামান্য শব্দও বের হল না।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই শেরপারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর বুকে। কোলাকুলির পর কোলাকুলি। কে যে কার সঙ্গে কতবার কোলাকুলি করল, তার হিসেব রাখল না কেউ। এমনি করে আবেগের উত্তাল ঢেউগুলো ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এরই ফাঁকে দিলীপ ঘড়ি দেখে নিয়েছে—৩-৫ মিঃ। এরই মধ্যে দিলীপ অল্টিমিটার দেখে নিয়েছে—২০৮০০ ফুট। ২০৮০০? ওদের অল্টিমিটারে তাই বলল। তবে যে সে পড়েছিল নন্দাঘুণ্টির উচ্চতা ২০৭০০ ফুট। যাক গে। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছবি তুলতে শুরু করল। শেরপারা ততক্ষণে নিয়ম-রীতি পালন করতে লেগেছে। অশোককুমার সরকার যে জাতীয় পতাকাটি হাওড়া স্টেশনে সুকুমারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সুকুমার সেই পতাকাটি নিজের তুষার-গাঁইতিতে বেঁধে পুঁতে দিল চূড়ায়। শেরপারা রমের বোতল খুলে খানিকটা রম ঢেলে দিলে। কলকাতা থেকে কারা যেন নারকেল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ভেঙে তার জল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, সেই জলও বরফ হয়ে গিয়েছে। দিলীপ আশা করেছিল, নারকেলের জল খেয়ে তেষ্টা মিটাবে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও জমিয়া যায়।

সে ক্ষুণ্ণ মনে রোলিকর্ড ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডার খুলে ছবি নিরিখ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিউ-ফাইণ্ডারটি বরফের গুঁড়োয় ভরতি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে আন্দাজে সেরেফ চোখের নিরিখেই ছবি তুলে গেল।

ওরা এক বাণ্ডিল দড়ি ওখানে গোল করে পুঁতে দিল, তার মধ্যে একখানা জাতীয় পতাকা পেতে, তার উপর সকলের নাম লেখা কাগজখানা রেখে তার উপর পিটন চাপা দিয়ে রেখে দিল।

আঙ শেরিং দিলীপকে ডাক দিল। একটা মগ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "লেও, পিও।"

দিলীপ দেখল তরল পদার্থ। ওর তেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এক চুমুকে সেটা খেয়ে নিল। হায় ভগবান! এ যে রম! নির্জলা রম। ওর গলা বুক জ্বলে গেল। মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। শেরপাদের সে কী হাসি! দিলীপের মনে হল, সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি সে খানিকটা বমি করল। তারপরে মাথার টুপি খুলে ফেলল। মাথায় খানিকক্ষণ বরফ পড়তেই সে খানিকটা চাঙ্গা হল।

তারপর, ওরা নামতে শুরু করল।

দিলীপ ঘড়ি দেখল। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ। আরোহণ যতটা কষ্টসাধ্য, অবতরণও প্রায় তাই। ওরা উঠবার সময় যে রাস্তা বানিয়ে রেখে গিয়েছিল, নতুন বরফ তা ঢেকে দিয়েছে। আবার নতুন করে পথ বানাতে হল। ফলে গতি খুব শ্লথ হয়ে এল। ওরা যে সময় বড় কুঁজটার উপর এসে পৌঁছাল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। কিছু দেখবার উপায় নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিপজ্জনক ৭০০ ফুটের খাড়া উৎরাই। বিপদের উপর বিপদ, ওরা যে 'ফিক্সড্ রোপ' করে গিয়েছিল, বরফ পড়ায় তার চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আঙ শেরিং এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে বললে, এই অন্ধকারে, এই নিদারুণ বিপজ্জনক পথে নামা ঠিক হবে না। এসো আমরা এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই। কাল সকালে নামব। নরবু বলল, আমাদের সঙ্গে তাঁবু নেই, সাবুদের যা পোশাক, তাতে রাত্রে এখানে থাকলে পাষাণ হয়ে যাব। মৃত্যু অবধারিত। নামবার সময়ও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয়, এখানে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চাইতে নামবার চেষ্টা করাই উচিত। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাও ভাল।

নরবুর কথাতে সকলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে 'ফিক্সড্ রোপ' পাওয়া গেল। তারপরে শুরু হল এক দুঃসাহসিক অবতরণ। টাসী আগে আগে নামছে। তার হাতে দড়ি, মুখে টর্চবাতি। সে কয়েক ধাপ নেমে একে একে পিছনের লোকেদের নামতে সাহায্য করছে। সুকুমার দেখল, একটা টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।· আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হাওয়া নেই। দুর্যোগের চিহ্নমাত্রও নেই। আছে শুধু শীত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর আকাশে অজস্র তারা।

দিলীপের অদ্ভুত লাগছিল। কী নিস্তব্ধতা! এই জমাট অন্ধকার রাত্রির মতই ঘন সেই নৈঃশব্দ্য। ওর কানে কেউ ভারি সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর এই উজ্জ্বল তারাগুলো কত নীচে ঝুলে আছে। ও যেন ইচ্ছে করলেই একটা তারা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলতে পারে।

আরে, ও কী! দিলীপ চমকে উঠল। ওর দড়িতে ঝাঁকুনি লাগল। একটা টর্চের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা অতি দ্রুত খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বনাশ! সেই শীতেও দিলীপের গায়ে ঘাম দেখা দিল। টাসী পড়ে গিয়েছে।

'ফিক্সড্ রোপ' ধরে নেমে যাচ্ছিল টাসী। হঠাৎ গোটা কয়েক পিটন উপড়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সে ২৫।৩০ ফুট নীচে সোঁ করে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সে দড়ি ছাড়ে নি। তাই বেঁচে গেল। ওকে তুলে আনা হল। পিটনগুলো আবার পোঁতা হল ভাল করে। তারপর অতি সাবধানে নামতে নামতে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময় ৩নং শিবিরে পৌঁছে গেল। তের ঘণ্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সবাই তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা সুরুয়া গরম করে নিয়ে কোনমতে গিলে ফেলল। তারপরে তলহীন নিদ্রার সুগভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল সবাই।

॥ পঞ্চাশ ॥

বিশ্বদেব না, মদন না—২নং শিবিরে ঘুমুতে ওরা কেউ-ই পারে নি। ২৩শে অক্টোবর, ভোরে, আলোর রেখা ফুটে উঠতেই, চা খাওয়ার তরও কারো সইল না, বিশ্ব আর মদন বেরিয়ে পড়ল ৩নং শিবিরের উদ্দেশ্যে। শেরপাদের বলে গেল, পরে আসতে।

কিছুদূর এগিয়েছে, এমন সময় দূরে দেখল, ওরাও আসছে। সকলের আগে সুকুমার। তার হাতের তুষার-গাঁইতিতে বাঁধা উড্ডীন জাতীয় পতাকা। বিশ্ব আর মদনকে দেখতে পেয়ে সুকুমার তুষার-গাঁইতিটা তুলে ধরল। পতাকা সকালের বাতাসে সতেজে উড়ে সংকেতে জানাল, ওরা সফল হয়েছে। ওদের সব কষ্ট, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বিশ্বদেব আর মদন আনন্দে লাফাতে থাকল। সুকুমার কাছে আসতেই বিশ্ব তাকে জড়িয়ে ধরল। ফূর্তির চোটে চোখে জল বেরিয়ে এল দুজনের। দিলীপ তার ক্যামেরা বাগিয়ে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিল। সে এই 'মহামিলনের' সাক্ষী রেখে দিল তার ফিল্মে। এই সময় সুকুমারের আবার মনে হল, কোথায় যেন তার যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু সে তখন আবেগে অন্ধ। ভ্রূক্ষেপ করল না বিশেষ। মদন, দিলীপ আর শেরপাদের সঙ্গে আলিঙ্গনের পালা শেষ করল। তারপরে দ্রুত নেমে চলতে লাগল নীচে। ২নং-এর শেরপাদের বলে এল, তারা যেন ৩নং-এর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আজই নেমে আসে।

সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ওরা প্রায় ডবল-মার্চ করে, সেইদিনই যখন অ্যাডভান্স বেস-এ এসে পেঁছাল, তখন বেলা সাড়ে-চারটে বেজে গিয়েছে। সন্ধ্যে হতে বাকী নেই। বীরেন সিংহ চুটিয়ে ছবি তুললেন। হৈ-হুল্লোড় হল। ঘুমুতে যাবার সময় সুকুমার টের পেল যন্ত্রণা হচ্ছে তার পায়ে। আঙ শেরিং, এমনকি, দিলীপও বোধ করল, পা যেন টাটাচ্ছে।

২৭শে অক্টোবর বেলা দশটার মধ্যেই বীরেন সিংহ আর ডাঃ অরুণ কর বেস-ক্যাম্পে পেঁছে সুখবরটি দিলেন। আনন্দে সবাই অধীর হয়ে উঠল। ডাঃ কর পায়েস রাঁধতে বসে গেলেন। বাকী সবাই প্রায় সাড়ে-এগারটার সময় এসে পেঁছাল। সমস্ত মাল-বাহককে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল মাল নামিয়ে আনতে। সুকুমার আর চলতে পারছে না। আঙ শেরিংও না। ওরা পা পাততেই পারছে না, এমন টাটানি। ডাক্তার সুকুমারের পা খুলে ফেলল। দু পায়ের আঙুল ক'টা ফুলে গিয়েছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নীলবর্ণ। ডাক্তার মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে সুকুমারকে বললে, কিছুই না, ফোসকা পড়েছে মাত্র। ধ্রুবকে এসে চুপি চুপি বলল, দুজন লোক ঠিক কর। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আঙ শেরিং-এর পা খুলে দেখা গেল, ওর পায়ের আঙুলগুলো কাটা। পায়ের পাতাই আছে শুধু। ডাক্তার অবাক হয়ে ভাবল, এই লোকটা এই পা নিয়ে এতখানি উঠল কি করে? আঙ শেরিং-এর পা-ও জখম হয়েছে। দিলীপের ফাঁড়া একটা আঙুলের চোটের উপর দিয়েই কেটেছে। ডাক্তার ওদের চিকিৎসায় মন দিল।

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেসক্যাম্প, ২৪শে অক্টোবর। আজ আমরা ফিরে যাবার গোছগাছে ব্যস্ত। সুকুমার বিষণ্ন। ওর পা নিয়ে খুব ভাবছে। আমি টেলিগ্রাম লিখে ফেললুম।

পুরো রিপোর্টটা উনুনের পাশে বসে শেষ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ ডাকে পাঠাব। জয়ের সংকেত পাঠাব তারে। কেদার সিংকে আজ ছাড়লাম না। কাল সে আমাদের রুন্টি নদীর প্রবাহ ধরে, নতুন পথে মোরনা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। তারপর তার ডাক্ নিয়ে ছুটবে যোশীমঠ। পরশুই তাকে টেলিগ্রাম লাগাতে হবে।

নোটবুক খুলে সংকেতটা বার বার করে পড়লাম। তারপর লিখলাম :

Editor tell mother returning twenty second repeat editor tell mother returning twenty second repeat editor tell mother returning twenty second stop Gour.

২৬শে অক্টোবর। বেস ক্যাম্প তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। আসবার আগে সকলে মিলে পাহাড়ের গা পরিষ্কার করে দিয়ে এলাম। কোন জিনিস, এক ফোঁটা ময়লাও আমরা রাখতে দিলাম না। পর্বতারোহীদের এই দস্তুর। যে পাহাড় পরম সহিষ্ণুতায় আমাদের সব উৎপাত সহ্য করেছে, আজকের প্রার্থনায় তাকে অন্তরের সমস্ত সততা দিয়ে ধন্যবাদ জানানো হল।

২৭শে অক্টোবর। মোরনার ঠিক নীচে আমরা রাতের শিবির স্থাপন করলাম। গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়ল। ডগদর সাহেবের জন্য। এরা ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে পাত্তাই দিল না।

২৮শে অক্টোবর। সকাল সাড়ে-সাতটায় উঠেই সুকুমার, ধ্রুব, মদন, বিশ্ব, দিলীপ, আঙ ফুতার আর নরবু লতা গ্রামের দিকে রওনা দিল নন্দাদেবীর মানত শোধ করতে। তাদের সঙ্গে মানতের ভেড়াটাও লাফাতে লাফাতে চলল। একটা ভেড়া নিয়ে পথ চলা কঠিন। গড্ডলিকা ছাড়া ওরা চলতে চায় না। কিন্তু মালবাহকেরা বলেছিল, এই ভেড়া নিয়ে কোন মুশকিলে পড়তে হবে না। মানতের ভেড়া নিজের তাগিদে পথ চলে। সত্যিই, এই ভেড়াটা আমাদের পথ দেখাতে দেখাতে চলে এসেছে। একবারও ঝামেলায় ফেলে নি। আমি, বীরেনদা আর ডাক্তার দশটার সময় অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে তপোবন যাত্রা করলাম।

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে :

চটির দোতলায় রাতের সংবাদ শোনার জন্য রেডিও খুলে বসে আছি। কাল কেদার সিং দু দিনের পথ এক দিনে দৌড়ে টেলিগ্রাম লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। যদি আজ কাগজে খবরটা বেরিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই রেডিওতে বলবে। সাড়ে-সাতটায় খবর বলা শুরু হল। একেবারে শেষের দিকে সংবাদঘোষক নন্দাঘুণ্টি বিজয়ের খবর দিল। তারপর হিন্দী বুলেটিনেও খবরটা প্রচারিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের আবহাওয়া বদলে গেল। দলে দলে লোক ছুটে এল সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে। প্রথমে এলেন একজন গাড়োয়াল কবি। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে আমাদের অভিনন্দন জানালেন।

"হে বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার সন্তানগণ, তোমরা মাতার গলায় গৌরবের এক চন্দ্রহার ঝুলিয়ে দিয়েছ, তোমরা ধন্য।"

"মাতার ললাটে গৌরবের উজ্জ্বল সিতারা (তারকা) লটকে দিলে, তোমরা ধন্য।"

তারপর বাঁধভাঙা বন্যার মত লোক ছুটে এল। আমাদের টেনে নীচে নামাল। শুরু হল সমবেত নৃত্য। রাত দুটো পর্যন্ত নৃত্য চলল। তারপর নেহাত করুণাবশেই—কারণ আমাদের প্রাণ ততক্ষণে ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে—যেন আমাদের রেহাই দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরকম সংবর্ধনা আর গোটাকতক কপালে জুটলেই পৈতৃক প্রাণটি যে কলকাতায় ফিরবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম।

২৯শে অক্টোবর। যোশীমঠ। পথে বড়গাঁওতে শোভাযাত্রা করে স্কুলের ছাত্ররা বিদায় সংবর্ধনা জানাল। পোস্ট অফিসে এসে তিনখানা তার পেলাম। অভিনন্দন। ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি, সুকুমারের ভগিনীপতি আর প্রবোধ সান্যাল অভিনন্দন জানিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট শ্রীযোগেন সেন টাকাও পাঠিয়েছেন। দুর্ভাবনা গেল। কেদার সিং বিদায় নিল। গোরা সিং আগামীকাল যাবে। এখন একে একে সকলেরই যাবার পালা।

খকের দিনলিপি থেকে :

২রা নভেম্বর। যোশীমঠ। আজ বদ্রীনাথ থেকে ফিরেই তিনখানা টেলিগ্রাম পেলাম। দুখানা বার্তা সম্পাদকের, একখানা দিল্লী থেকে আমাদের কাগজের প্রতিনিধি শ্রীঅশ্বিনী গুপ্তের। দিল্লী যাবার আমন্ত্রণ। রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের আমন্ত্রণ। সুকুমারের হাতেও টেলিগ্রামের বোঝা। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। প্রথমে দিল্লী, তারপর দিল্লী থেকে কলকাতা। অভিনন্দন। অভিনন্দন। অভিনন্দন।

৪ঠা নভেম্বর। পিপলকোটি। এক মাস ছয় দিন পরে আবার এখানে ফিরে এলাম। মালবাহকদের দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দেওয়া হল। ওরা ছলছল চোখে বিদায় নিল। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সারা দিন ধরে আমাদের জামা-কাপড় কেচে দিল। বাস ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। রাত থাকতেই বাসে উঠতে হবে। প্রথম গেটেই বাস ছাড়বে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, কফি খাইয়ে, বাসনপত্র মেজে হরি সিং আর লালুও বিদায় নিল। লালুর চোখে জল।

"সাব্।" চমকে উঠলাম। হরি সিং।

"সাব্, মোটা সাব্, আগর কুছ কসুর হুয়া তো মাফ কর দেনা।"

বেস ক্যাম্পে সারা রাত জুয়া খেলে বহুৎ টাকা হেরেছিল হরি সিং। ওকে খুব বকেছিলাম। ওর কি সেই কথা মনে পড়ল?

"হরি সিং!" ডাক্তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করতে গেল। পারল না। অ্যাডভান্স বেসে এইটেই ছিল ডাক্তারের প্রচলিত রসিকতা। ডাক্তার নাটুকে সুরে হাঁক পাড়ত, "হরি সিং, উজীর!" হরি সিং হাত জোড় করে জবাব দিত, "হু-জু-র।" ডাক্তার বলত, "তুমকো বরখাস্ত কিয়া গিয়া হ্যায়।" "জী হুজুর।" হরি সিং হাত জোড় করে থাকত। ডাক্তার হাঁকত, "তুম্‌হারা তনখা বাজেয়াপ্ত হো গিয়া হ্যায়।" "জী সরকার।" "লেকিন তুমকো কাম করনে পড়েগা।" "জী সরকার।" "যাও, চা বানাও।" "জী সরকার, আভি লাতা হুঁ।"

ডাক্তার তেমনি করেই হাঁক ছাড়তে গেল। পারল না। ওর গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

"হরি সিং!. মন্ত্রী!"

"জী সরকার।"

ডাক্তারের চোখে জল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, "ভগবান তেরা ভালা করে, হরি সিং।"

হরি সিং-এর দ্ চোখে জলের ধারা নেমেছে। জনে জনে হাতজোড় করে বলে চলেছে, "ইয়াদ রাখ্‌না সরকার, তুম্‌হারা হরি সিংকো ইয়াদ রাখ্‌না।"